ড. আবদুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান

মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

أزمة الإرادة والوجدان المسلم

মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট

প্রথম খণ্ড

মূল

ড. আবদুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান

অনুবাদ

ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন আল-আযহারী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট (প্রথম খণ্ড)

মূল : ড. আব্দুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান
অনুবাদ : ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন আল-আযহারী

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ISBN
984-70103-0014-6

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৬
রজব ১৪৩০
জুলাই ২০০৯

প্রকাশক :
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাসা # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর#০৯, উত্তরা মডেল টাউন,ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ৯১১৪৭১৬,০১৫৫৪৩৫৭০৬৬
ই-মেইল : biit_org@yahoo.com

মূল্য : দুইশত পঁচিশ টাকা মাত্র।

মুদ্রণ :
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

Muslim Ichcha 0 Onuvuti Sangkat *by Dr.AbdulHamid Ahmad A Sulaiman, Translated into Bangla by Dr. Muhammad Anwarul Kabir & Muaz Husain Al-Azhair* and published by Bangladesh Institute of Islamic thou (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector#09, Uttara, Dhaka, Bangladesh,
Phone: 8950227, 8924256, 06662684755, Fax : 8924256
E-mail:biit_org@yahoo.com. Price : Taka 225, $ 22.5.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

ড. আব্দুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান'র মত একজন আন্তর্জাতিক মানের লেখক ও গবেষকের রচিত ازمة الارادة والوجدان المسلم (মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট) গ্রন্থটি অনুবাদ করতে পারায় আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। শিশুদের মানসিক অবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করা যায় এবং মুসলমানদের ইচ্ছা ও অনুভূতিকে কিভাবে জাগ্রত করা যায়-এ বিষয়ে বইটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। বইটি কঠিন শব্দ সম্বলিত আধুনিক আরবি ভাষায় রচিত হওয়ায় বাংলাভাষী পাঠকগণের এ থেকে উপকৃত হওয়া অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার ছিল। তাই বইটি বিআইআইটির উদ্যোগে অনূদিত ও প্রকাশিত হওয়ায় বাংলাভাষী মুসলিম সমাজে এটি দারুণভাবে গৃহীত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বইটির দ্বারা বাংলাভাষাভাষী জনগণ সামান্যতম উপকৃত হলে আমাদের এ শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

হে আল্লাহ আমাদের এ শ্রম কবুল করুন। আমীন।

মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর *পিএইচডি*
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন আল-আযহারী

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিম জাতি বিশ্বসভ্যতার চালকের আসনে আসীন ছিল। সে যুগে মুসলিম নেতৃত্ব ছিলেন ঈমান, জ্ঞান এবং আমলের শক্তিতে চালিত কিন্তু বর্তমান কালের মুসলমানদের মধ্যে সেই ঈমান, জ্ঞান এবং আমলের বড় অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে দুঃখজনকভাবে হলেও সত্য যে, বর্তমানে মুসলমানেরা দুর্বল এবং পশ্চাৎপদ জাতিতে পরিণত হয়েছে। এই অধঃপতনের মূলে রয়েছে তাদের ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা, চিন্তার সংকীর্ণতা এবং শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি। সুতরাং মুসলমানদের সেই স্বর্ণযুগ ফিরে পেতে হলে এ সকল দিকের সংস্কার সাধন অত্যাবশ্যক। এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থটিতে মুসলমানদের দুর্বল দিকগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোর পরিশুদ্ধির জন্য অত্যন্ত কার্যকরী কিছু দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে- যা বর্তমান কালের মুসলমানদের সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা এই বইটি অনুবাদ এবং প্রকাশনার কাজে অগ্রসর হই। বইটি ড. আব্দুলহামীদ আহমদ আবু সুলায়মান এর গভীরচিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফসল যা তিনি ছয়টি অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন।

বইটির ১ম এবং ২য় অধ্যায়ে তিনি মুসলিম জাতির চিন্তা চেতনাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম অধ্যায়ে একজন মুসলিমের শৈশব থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন পর্যন্ত কী কী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তা তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলিম শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদদের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সব মিলিয়ে বইটি সাধারণভাবে যে কোন মুসলিম বিশেষভাবে মুসলিম চিন্তাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী একটি বই হিসেবে বিবেচিত হইবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বইটির অনুবাদক ড. মোঃ আনোয়ারুল কবির অত্যন্ত সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বইটি অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এজন্য তাকে ধন্যবাদ বইটির মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে মহান আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রর্দশন করুন- এই প্রত্যাশা করছি।

এম আবদুল আজিজ
উপ-নির্বাহী পরিচালক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

মুখবন্ধ ১১

প্রথম অধ্যায়

ইচ্ছা ১৪
গবেষণার আবশ্যকীয়তা ১৬
পদ্ধতি : গাইড ও পথপ্রদর্শক ২০
পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ২০
পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ২৩
বিশ্বাস ও চিন্তাগত নিয়মের বৈশিষ্ট্যসমূহ জানার গুরুত্ব ২৭
বর্তমান ও অতীতের মাঝে সংক্রমিত চিন্তাগত ভুল-ভ্রান্তি ২৮
জ্ঞান ও অনুভূতির মধ্যে সম্পর্ক ২৯
শিক্ষামূলক চিন্তাধারা ও সামাজিক পরিবর্তন ৩০
মূল সংকট ৩১
ঈমান সভ্যতার প্রেরণার উৎস ও সভ্যতা কেন্দ্রিক বস্তুবাদের যোগসূত্র ৩৩
চারিত্রিক ঈমানী শক্তির দুর্বলতা কীভাবে শুরু হয়েছে ৩৫
রাজনীতি, চরিত্র, ধর্ম : নেতৃত্বের প্রকারভেদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মতবাদের উৎপত্তি ৩৭
উম্মাহর বিভক্তির প্রভাব, প্রাতিষ্ঠানিক ধ্বংস এবং সামাজিক চিন্তার অনুপস্থিতি ৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

উম্মাহর মানসিক রোগ নির্ণয় ৪১
উম্মাহর চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিতে বিভ্রান্তি ৪১
প্রথম বিভ্রান্তি : পূর্ণাঙ্গ দর্শন বিভ্রান্তি ৪১
দ্বিতীয় বিভ্রান্তি : পদ্ধতিগত বিভ্রান্তি ৪৭
তৃতীয় বিভ্রান্তি : বুঝ ও উপলব্ধির বিভ্রান্তি ৫০
ইবাদত 'অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ৫১
"তাওহিদ" (একত্ববাদ)-এর মূল অর্থ এবং অর্থবহ জীবন ৫৩
তাওহিদ, ইবাদত ও আত্মশুদ্ধি ৫৪
প্রতিনিধিত্ব, সংস্কার ও আবাদ প্রসঙ্গ ৫৬
চতুর্থ বিভ্রান্তি : বর্ণণামূলক বিভ্রান্তি ৬০
পঞ্চম বিভ্রান্তি : বুদ্ধিবৃত্তিক কুসংস্কার ৬৩
মহাজাগতিক বিধান অন্বেষণ করা আবশ্যিক শর্ত, যথেষ্ট নয় ৬৬
তাওয়াক্কুল (ভরসা) ও তাওয়াক্কুলের ভান

www.pathagar.com

সন্ত্রাস, স্বৈরাচার ও পশ্চাদপদতা কুসংস্কারের উর্বর ভূমি ৬৮
কুসংস্কারকে পবিত্র বস্তু ও দীন মনে করার বিপদ ৬৯
আল-কুরআনে বর্ণিত দুটো সূরা 'আন-নাস' ও আল-ফালাক' (المعوذتان) ৭২
কুসংস্কারমূলক চিন্তার প্রতিবন্ধক
আল্লাহর উপর নির্ভর করে নয়, দোয়া ও ঝাড়ফুঁক এক ধরনের অনুভূতিমূলক সম্পর্ক ৭৩
আল-কুরআনের আয়াত ও এর ব্যাখ্যাকে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহতকরণ ৭৪
কুসংস্কারমূলক চিন্তা ও এ ধরনের গ্রন্থাদি চালু করা দীনি সভ্যতার পরিপন্থী ৭৫
জ্ঞানের মাধ্যমে জাতি উন্নতি লাভ করে, কুসংস্কারে নয় ৭৫
শিশু গঠনের মূলে অভিভাবকদের সচেতনতা ৭৬
মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ৭৭
৬ষ্ঠ বিভ্রান্তি : গোত্রিক গোঁড়ামি ৭৮
সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের জঘন্যতম খারাপ দূষণ ৮১
হক ও আলোর জগত এবং অন্ধকার ও অদৃশ্য জগত ৮৩
উম্মাহর সুস্থ মানসিকতা গঠনে চিন্তাগত কুসংস্কারের প্রভাব ৮৫

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুই : যাত্রা পথের ভিত্তি ৮৯
ইসলামী সংস্কার আন্দোলন ও তার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ৯০
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে ৯৩
সাধারণ সংস্কৃতি ও বিশেষ সংস্কৃতি : পুনর্গঠনের জন্য মারাত্মক ব্যাধি ৯৩
পরিচর্যামূলক সচেতনতা ও শিক্ষার পরিশোধনই সংস্কারের মূল ভিত্তি ৯৬
মুসা (আ.) এর শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন ৯৭
চিন্তা জগৎই জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা ১০২
ইসলামই জাতির অবশিষ্ট কল্যাণের মূল উৎস ১০৪
উপনিবেশই জটিলতা ও অভিশাপ ১০৭
ইসলামী ঐক্য বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা : চীন, ভারত, ইউরোপ ১০৭
ধর্ম বিবেক ও স্বার্থ সবই ঐক্যের আহবায়ক ১১০
মুসলিম উম্মাহর সংস্কৃতিতে যৌথ প্রয়াসের সংকট, হারানো বস্তু কিছুই দিতে পারে না ১১২
ইসলামী গবেষণায় যৌথ প্রয়াস ১১৩
সংস্কৃতি ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াসের দুর্বলতার ভয়াবহ প্রভাব ১১৬
সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণে যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা ১১৮
সামাজিক পরিবর্তন ও প্রশিক্ষণমূলক বক্তব্য ১১৯
ইসলামী তারবিয়াতী বক্তব্য অনুধাবনের উপায় ১২১
মানবিক শিক্ষার দুর্বলতা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কারণ ১২১

www.pathagar.com

শ্রোতার ভিন্নতা অনুযায়ী বক্তব্যের ভিন্নতা ১২২
বক্তব্যের স্বচ্ছতা বিনষ্টকারী নিদর্শন : পরাধীনতামূলক মনোভাব ১২৩
বিধি-বিধান ও প্রশিক্ষণমূলক বক্তব্য : উপমাস্বরূপ শান্তির বিধান ১২৪
উপমা স্বরূপ প্রশিক্ষণমূলক রাসূলের বক্তব্য ১২৮

চতুর্থ অধ্যায়

মৌলিক সমাধান : বাল্যকাল গঠন ১৩২
চ্যালেঞ্জ সমূহের প্রতিরোধ এবং সংস্কার ও পরিশোদনের পদ্ধতি ১৩৩
চ্যালেঞ্জসমূহ ১৩৩
সাংস্কৃতিক অভিযোগ : সংশয়ের ক্ষেত্রসমূহ ছিন্নকরণ এবং চিন্তা-চেতনার সঠিককরণ ১৩৪
ইসলাম : বুদ্ধি, বিবেক, তুষ্টি ও জ্ঞানের ধর্ম
মুরতাদদের শান্তি ঈমান বা আত্মতৃপ্তির সাথে সম্পৃক্ত নয় ১৩৬
রীতি-নীতিতে নতুন পুরাতন : ধার্মিকতা ও নাগরিকত্ব ১৩৮
নাগরিকদের মনোযোগ ও তাদের নীতিগত মন্তব্য ১৪১
সনদ (বর্ণনাধারা) মতন (মূলপাঠ) এর পর্যালোচনা বিষয়ে আধুনিক ব্যাপক নীতিমালার সম্ভাবনা : ১৪৪
মতন (মূল বর্ণনা) এর পর্যালোচনার নমুনা : অদৃশ্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতির দূষণ ১৪৯
মুহাম্মদী রেসালতের পূর্ববর্তী বিশ্ব এবং পরবর্তী বিশ্ব ১৫৮
সাংস্কৃতিক পরিশোধন এবং কারিকুলামের সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা ১৬২
তারবিয়াতগত অভিযোগ : পদ্ধতি ও সূচনা ১৬৩
তালিম তারবিয়াত এবং শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রতি যত্নবান হবার প্রয়োজনীয়তা ১৬৪
নীতিমূলক গবেষণার অবক্ষয়ের কারণে তালিম তারবিয়াতমূলক গবেষণার অবনতি ১৬৫
তালিম-তারবিয়াতের মূলনীতি ও ব্যবস্থাপদ্ধতির অতীত ও বর্তমান ১৬৬
তালিম তারবিয়াতে নববী পদ্ধতিই আদর্শ
তালিম-তারবিয়াতমূলক নাবী বক্তব্যের সূচনা ছিল ভালবাসা, তুষ্টি ও বীরত্ব ১৭০
ভালবাসাই শক্তি ও অনুপ্রেরণা দানকারী : প্রভাবশালী ফলপ্রসু সুসম্পর্ক ১৭৩
স্বাধীনতা একটি শক্তি : তার পরিধি ও নিয়ম-নীতি : ১৭৪
রীতি-নীতি ও পদ্ধতির মৌলিক উপাদান : দায়িত্ববোধ, আত্মমর্যাদাবোধ ও অনুশীলন ১৮০
শিশুদের মৌলিক পরিবর্ধনের স্তরসমূহ এবং তার সাথে ব্যবহারের প্রকৃতি : ১৮২
একজন সফল অভিভাবকের গুণাবলী : ১৮৫

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলিম পরিবার আশার উৎস/আলো ১৮৯
পরিবার গঠনে শরিয়তের রহস্য : ভিত্তি ও পদ্ধতি ১৯৬

www.pathagar.com

সমাজ ও পরিবারের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি ভূমিকা ২০১
বর্তমান মুসলিম সামাজিক বিধানে মাতৃত্ব ও তার কার্যাবলী ২০৪
(সীনা) যুগের দিক নির্দেশনা ২০৮
প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ : গৌন বিষয় ২০৯
পিতৃসুলভ অনুপ্রেরণা সামাজিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি ২১১
কাঙ্ক্ষিত তালিম-তারবিয়াতে বাবা-মায়ের ভূমিকা ২১২
মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মধ্যে তালিম-তারবিয়াতের অভাব ২১৩
তারবিয়াতী পরিবারের শিষ্টাচারের গুরুত্ব ২১৫
তারবিয়াতি জ্ঞানের কার্যক্ষমতা : নিজস্ব অভিজ্ঞতা ২২০
শিক্ষক পরিবারের সহযোগী ২২৫
ধর্মীয় বক্তব্য : জ্ঞান ও অনুভূতির সম্পর্ক ২২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাজের পরিকল্পনা ২৩২
চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিবিদদের সচেতনতা ২৩২
সামাজিক ইসলামিক চিন্তাধারার অগ্রগতি ২৩৪
সাংস্কৃতিক পরিশোধন ২৩৬
শিক্ষা-বিষয়ক সংস্কার ২৩৭
তারবিয়াত পরিবারের শিষ্টাচার ২৩৮
প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠানের শিষ্টাচার ২৪০
উচ্চ শিক্ষার সংস্কার ও পরিশোধন ২৪০
ইসলামিক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিতকরণ এবং জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র ২৪১
প্রতিষ্ঠা ও অগ্রযাত্রা ২৪২
শিশু-শিক্ষা ও শিশু-পরিচর্যা বিষয়ক বিশেষ প্রতিষ্ঠান ২৪৫
শিশু উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ২৪৬
বিকল্প ব্যবস্থায় জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা ২৪৮
আন্তর্জাতিক ইসলামিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৫২
ব্যাখ্যামূলক সারণীসমূহ ২৫৪
মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রকৃত অবস্থা ২৫৭
চিন্তাগত এবং কারিকুলামগত মূলনীতির ঘোষণা সময়ের দাবি ২৬১
শেষ কথা ২৬২

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

এটি একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। আকস্মিকভাবে রচিত এমন গ্রন্থ এটি নয়; বরং গ্রন্থটি অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও গবেষণার ফল ও নির্যাস।

গ্রন্থটি أزمة العقل المسلم (মুসলিম মানসে সংকট) বইয়ের অনুরূপ একটি গ্রন্থ।

মুসলিম উম্মাহর মাঝে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত না হওয়া এবং ইসলামী সভ্যতা সংস্কার কাজের সফলতা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত না হওয়ার পিছনে কী কী কারণ রয়েছে সে সব কারণ চিহ্নিত করার প্রয়াস হিসেবে এ গ্রন্থটি লেখা হয়।

নয় শতাব্দীর অধিক সময়কাল পূর্বে ইমাম আবু হামেদ আল-গাযালী (রহ) 'তাহাফুতুল ফালাসিফাহ' (تهافت الفلاسفة) ও ইহয়াউ উলুমিদ-দীন' (إحياء علوم الدين) নামক গ্রন্থদ্বয় লিখেছিলেন। আর এক শতাব্দীকাল আগে দার্শনিক আল-কাওয়াকিবী ইসলামী আক্বিদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ বিষয়ক 'উম্মুল কুরা' (أم القرى) নামক বিখ্যাত দর্শনতত্ত্বের গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি উম্মাহর মূল্যবোধ ও বিপদের কারণ চিহ্নিত করে তাবায়িউল ইসতিবদাদ (طبائع الاستبداد) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন দার্শনিকের এসব গ্রন্থাবলীর পরও আজ পর্যন্ত উম্মাহর মনযিলে মাকছুদে পৌছার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

ইসলামী সংস্কার-প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়া ব্যতীত উম্মাহর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব নয়। উম্মাহর সুপ্ত অনুভূতি কীভাবে জাগ্রত করা যায় এবং উম্মাহর শিশুদের পরিচর্যা করে কীভাবে ভাল ফল লাভ করা যায় সে বিষয়ে এখানে স্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে আত্মগঠনের অনুভূতি কীভাবে তৈরি করা যায়, এ বিষয়ে এখানে বর্ণনা রয়েছে। এতে শিশুর

www.pathagar.com

অনুভূতি, মনোবৃত্তি গঠনে সৃজনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা তৈরির কথা স্পষ্ট অনুধাবন করা যাবে।

উম্মাহর সাংস্কৃতিক ও চিন্তাগত বিভ্রান্তি অবগত হওয়াসহ সামাজিক পরিবর্তন সাধিত করে উম্মাহর মাঝে কীভাবে ঐক্য ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে এখানে বর্ণনা রয়েছে। শিশুর মনোবৃত্তি-গঠনে অনুভূতি ও জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। শিশুর ইচ্ছাশক্তি, সৃজনশীলতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান কীভাবে অর্জিত হবে, এ বিষয়ে এখানে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

হজরত মূসা (عليه السلام) এর উম্মতগণের মাঝে তুরে সিনা (سيناء) পর্বতে আল্লাহ-প্রদত্ত আলোক রশ্মি যেভাবে তাদের মাঝে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, ঠিক আমাদের চিন্তাশীলদেরকে সমাজ পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের জন্য সেভাবে সজ্জিত হতে হবে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পদ্ধতিগত সংস্কারের প্রচেষ্টার প্রতি গ্রন্থটি আহ্বান করছে। মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার-কার্যক্রমের বাস্তবায়নের চেষ্টাকে কম গুরুত্ব দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়েও গ্রন্থটি আহ্বান করছে।

গ্রন্থটিতে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয়েছে। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে, ইসলামী উন্নত সভ্যতা যুগ যুগ ধরে বিশ্ব সভ্যতাকে পরিচালনা করেছে। পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ইসলামী সভ্যতার আলো মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ উম্মাহর অধঃপতন, পশ্চাদপদতা, অক্ষমতা ও দুর্বলতার কারণে ইসলামী সভ্যতার প্রাণশক্তি নির্জীব হয়ে গেছে। যখন আমরা উম্মাহর চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির বিভ্রান্তির কথা ভাবি, তখন দেখি এ বিভ্রান্তি মূলত 'মুসলিম মানসে সংকট', অপরদিকে শিশুদের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দেয়াই হলো 'মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট'।

এজন্য উম্মাহকে তিনটি সংকটের সাথে সর্বাত্মক মোকাবেলা করতে হবে। যথা :

১. মানস ও পদ্ধতি সংকট

২. চিন্তা ও সংস্কৃতি সংকট ও

৩. অনুভূতি ও শিক্ষা সংকট।

এ তিনটি সংকট সর্বাত্মক মোকাবেলা করতে না পারলে উম্মাহ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ইচ্ছাশক্তির প্রেরণাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে না। মূলত, তারা যা করবে তাই বলবে, (يقولون ما يفعلون) এ অনুভূতি উম্মাহর মাঝে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক, চিন্তাগত ও শিক্ষামূলক বিষয়ের ভারসাম্য রক্ষা করবে।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে উম্মাহর দায়িত্বশীলের ভূমিকায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা হলেন উম্মাহর চিন্তাশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকবৃন্দ। অভিভাবক-মণ্ডলী পিতা-মাতাদের অন্তরে স্বভাবগত প্রেরণা সৃষ্টি করা গেলে অনুভূতি পরিবর্তনের আন্দোলন সফল হবে। কারণ, এতে ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়। যখন সমাজের একক হিসাবে ব্যক্তি ভাল হয়, তখন গোটা সমাজও ভাল হতে বাধ্য।

আমি আশা করছি, গ্রন্থটি কার্যকর সংলাপের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। এতে এখলাস-নিষ্ঠা ও সাহসিকতার প্রাণশক্তি উজ্জীবিত হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা-বিষয়ক দিক থেকে উম্মাহর অস্তিত্বের গভীরে নজর দেয়া সম্ভব হবে। ফলে উম্মাহর চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীরা উম্মাহর সুপ্ত সমস্যা নির্ণয় করে পশ্চাতপদতা ও অধঃপতন থেকে উম্মাহকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে উম্মাহর সন্তানদের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া-সহ উম্মাহর নেতৃত্ব যথাযথ পরিচালনা করে সংস্কৃতি ও চিন্তার কুসংস্কার এবং বিভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে।

চিন্তা-গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হয়ে উম্মাহর সন্তান, জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাশীলদের মাঝে শক্তি, সাহসিকতা ও সৃজনশীলতা তৈরি করাসহ তাদের অন্তরের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, দান করার মানসিকতা তৈরি করা আজ সময়ের দাবি। আর এটিই হলো এ গ্রন্থের মূল আহ্বান ও বার্তা।

বস্তুবাদী বিশ্বায়নের যুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য উম্মাহ দীর্ঘকাল থেকে অধীর প্রতীক্ষায় ছিল। তাই তো উম্মাহর পুনর্জাগরণ ও ইসলামী সভ্যতা সংস্কার-প্রকল্পের সফলতার উপকরণগুলো কম করে হলেও জানা প্রয়োজন। এ উন্নত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উম্মাহর অভিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের আশায় কতিপয় সমস্যা ও চিন্তা-ভাবনার দিক এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! উম্মাহর সকল চিন্তাশীল, সংস্কারবাদী ও কর্মীসহ গোটা উম্মাহকে তাওফীক দান করুন। তাদেরকে দীনের উপর অটল-অবিচল ও মজবুত রাখুন। আমাদের সবাইকে 'সিরাতে মুস্তাকীমের' পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

আবদুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*
ভার্জিনিয়া, ইউএসএ

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইচ্ছা

এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় হলো : উম্মাহর দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা ও তাদের অধঃপতনের কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং পাশাপাশি উম্মাহর শক্তি সামর্থ ও সাহসিকতাকে জাগিয়ে দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

এ গ্রন্থটিতে শিশুদের স্তরভেদে বিভিন্ন অবস্থার সংস্কার ও উন্নয়নে কীভাবে সফল ভূমিকা রাখা যায়, সে জন্য শিশুদের ইচ্ছা ও অনুভূতি তৈরির লক্ষ্যে তাদের কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়।

শিশুদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা এবং তাদের অবস্থা যথাযথভাবে না বুঝে সম্পূর্ণরূপে তাদের প্রসঙ্গ বাদ দেয়াই হলো উম্মাহর সংকটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এবং তাদের প্রতি চরম অবহেলাও গাফিলতির অন্যতম দিক। এছাড়া উম্মাহর মধ্যেই শিশুদের বিবেক-বুদ্ধি ও সুপ্ত ইচ্ছা এবং দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দেয়ার অনেক অভাব লক্ষ্য করা যায়।

তাই সংস্কার কার্যক্রম থেকে শিশু-বিষয়ক আলোচনা বাদ দেয়ার দু'টো বিষয় এখানে স্পষ্ট।

এক : ইসলামী দর্শন ও চিন্তাধারায় পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সার্বজনীন সুদূর প্রসারী সমাধানের অনুপস্থিতি। এ সমাধানের পথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে আল্লাহর নিয়ম। বিষয়টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও মহাসৃষ্টিজগত সম্পর্কিতও বটে।

আল্লাহর নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহর নবী ﷺ ঘোষণা করেন-

فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا

অর্থাৎ "তোমাদের মাঝে জাহেলী যুগে যে সর্বোত্তম ইসলামী যুগেও সেই সর্বোত্তম, তবে যদি তাঁরা বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে থাকে বা জ্ঞান রাখে।"

অর্থাৎ সব শিক্ষা ও প্রতিপালনের একটি মৌলিক ভিত্তি রয়েছে। আর সেই ভিত্তিই হলো আল্লাহর সুন্নাত। একজন ব্যক্তির চাল-চলন বা রীতি-নীতির পদ্ধতিগুলো সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং মৌলিকভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল করে। এভাবেই ব্যক্তির জীবন, তার বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিশক্তিকে বিভিন্নভাবে ধারণ

www.pathagar.com

করে থাকে। যেমন- ব্যক্তির বীরত্ব ও সাহসিকতা, কাপুরুষতা, আমানতদারী, দারিদ্র্য বা বিশ্বস্ততা, খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা, ইচ্ছাশক্তি ও দুর্বলতা ইত্যাদি।

এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও আত্মগঠনে সার্বিকভাবে কাজে লাগানো যায় তেমনি এগুলো প্রত্যেক জাতি ও সমাজের জন্য সামাজিক ও মহাজাগতিক দর্শন হিসেবেও গণ্য হতে পারে।

একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায় যেমন একজন সৈনিক ও একজন খুনি ব্যক্তি উভয়ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে থাকে। তাই উভয়ের কাজের মধ্যে আন্তরিকতা ও বীরত্ব থাকা অপরিহার্য। কিন্তু উম্মাহর প্রতিরক্ষায় সৈনিক তার বীরত্ব ও শক্তিকে কাজে লাগায়। আর অন্যদিকে খুনি ব্যক্তি মানুষকে ধ্বংস, চরম ক্ষতি ও কষ্ট দেয়ার জন্য তার সর্বশক্তিকে কাজে লাগায়।

মানুষের মনোবৃত্তি গঠনের জন্য অভিজ্ঞতা ও গবেষণামূলক বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের গুরুত্ব না দেয়াই হলো উম্মাহর চিন্তা-চেতনার পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি। আর স্তরভেদে শিশুদের বিভিন্ন অবস্থা ও কার্যক্রমের গুরুত্ব না দেয়া উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি। শিশুদের মনোবৃত্তি তৈরির লক্ষ্যে তাদের একটি স্তরপর্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। মুসলিমের আত্মগঠনে এটা বিরাট প্রভাব ফেলে। আত্মগঠনের প্রেরণার প্রয়োজনীয়তা আধিক্যের কারণে তরুণ সমাজের ইতিবাচক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সুনিপুণভাবে দায়িত্ব পালনে ইচ্ছা ও শক্তির পূর্ণব্যবহার, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ এবং সামাজিক মহাজাগতিক পূর্ণাঙ্গ দর্শন, বিশুদ্ধকরণ, পরিবর্তন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

দুই : সঠিক ও উপযুক্ত শিক্ষামূলক বিজ্ঞানসম্মত মনোবৃত্তি বা মানসিকতা তৈরির অভাব, যা মুসলিম শিশুর মনোবৃত্তি তৈরিতে আবশ্যিক প্রয়োজন। প্রতিটি শিশুর জন্য সঠিক দীনি অনুভূতি ও আত্মগঠনের সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা প্রয়োজন। অন্যথায় পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেই যায়।

এ দীনি অনুভূতি ও আত্মগঠনে সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষে উন্নীত করে। সর্বাত্মক চেষ্টা করে শক্তি সামর্থকে জাগ্রত করে প্রয়োজনীয় অনুভূতির প্রেরণাকে রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হয় প্রতিটি শিশুর।

দায়িত্ব পালনে অধিক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা, কার্যকর ও সফলভাবে সমাজ ও জাতির জন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি অর্জন গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে গণ্য। এক্ষেত্রে সঠিক শিক্ষামূলক বিজ্ঞানসম্মত মনোবৃত্তি তৈরি বিশেষ প্রয়োজন। সামাজিক কুসংস্কারকে দূর করে সে স্থানে সংস্কারসহ কল্যাণমূলক কিছু

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। সঠিক শিক্ষামূলক বিজ্ঞানসম্মত মনোবৃত্তি তৈরির ব্যবস্থা না থাকায় মুসলিম উম্মাহর চিন্তা-চেতনা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়টা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এখন গোটা মুসলিম উম্মাহ সঠিক শিক্ষার অভাব অনুভব করছে। তাই দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন, সামাজিক কুসংস্কার দূর করা, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন আজ সময়ের দাবি। এ দাবি উম্মাহর সকল প্রজন্মের। এজন্য মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ হিসেবে আমরা যে কারণটা চিহ্নিত করতে চাই সেটা হলো, উম্মাহর হারানো শক্তিকে পুর্নজীবিত করা এবং উম্মাহর চিন্তার সুস্থতাকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার অভাব। একে 'শিক্ষা বিষয়ক ত্রুটি-বিচ্যুতি' বলা যায়। তা ইসলামী চিন্তাধারার পদ্ধতিগত বিভ্রান্তি।

এ বিভ্রান্তির সূচনা হয় ক্ষমতাশীল ও চিন্তাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ থেকে। তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ইসলামের চর্চাকে বাদ দেন। এসব রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা, ইসলামের অর্ন্তনিহিত অবস্থা না জানা, ইসলাম সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন এবং ইসলামের বিভিন্ন সমস্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা না করাই হলো ইসলামী দর্শনের বিভ্রান্তির কারণ।

ইসলামী জ্ঞান না থাকলে মানুষ ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে যেমন অবগত হওয়া যায় না, তেমনি উম্মাহকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এজন্যই মানুষের জন্য আল্লাহ-প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ হেদায়েতের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। অথচ এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে উম্মাহর উপলব্ধি ও জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এছাড়া উম্মাহর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী মানবতার আত্মশুদ্ধি-উন্নয়ন এবং শিশুদের বিভিন্ন স্তরে এ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানেরও অভাব, যা শিক্ষা বিষয়ক ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি করছে।

গবেষণার আবশ্যকীয়তা

মুসলিম উম্মাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি কার্যক্রমকে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সৃজনশীল, সংস্কৃতিমনা চারিত্রিক মূল্যবোধ ও শক্তি পুনরায় চালুসহ মুসলমানদের সুন্দর মানসিকতা ও মনোবৃত্তি গঠন করার চরম প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার কারণে এ গবেষণার প্রয়াস। এ বিষয়টি কয়েকটি মৌলিক চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত, যা নিম্ন লিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়।

www.pathagar.com

ক. ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ, ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে সুমহান মিশন।

খ. বিপথগামী, অসহায়, নির্যাতিত-নিপীড়িত সকল মানুষের সাথে সম্পৃক্ত।

গ. মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত, যারা সকলেই অসহায়, দুর্বলচিত্তের অধিকারী, লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত এবং যারা মানুষের দাসে পরিণত এমন।

দায়িত্ব পালনে মুসলিম উম্মাহর অবহেলা, অক্ষমতা, দুর্বলতা, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও পশ্চাতপদতার ক্ষতি দিন দিন বাড়ছে। এমনিভাবে উম্মাহ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও যুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ জন্য আন্তর্জাতিক মতাদর্শ দীন ইসলামের মিশনের আলোকে নির্বাপিত করে দিচ্ছে। অথচ ইসলাম এমন একটি মতাদর্শের নাম, যার হেদায়েত চিরন্তন, এর চারিত্রিক মূল্যবোধ ও আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া সার্বজনীন। আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, আল্লাহর জমিনে দীন কায়েমের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা দেখানো এ মহান দীনের শিক্ষা। বর্তমানকালে পৃথিবীর মানুষের সম্ভাব্য সবকিছু বিশ্বজনীন পার্থিব উপাদানে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও সুসভ্য ও মার্জিত দীনে মুহাম্মাদীর মিশনের পর্দা যেন উন্মুক্ত হচ্ছে না। অথচ এ সময়ের দাবি ও অতীব প্রয়োজন হলো 'বিশ্ব মিশন' (رسالة العالمين) এর হেদায়েত। রেসালতে আলামীন এমন এক মহান মিশনের নাম, যা আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, দীন কায়েমের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগসহ ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়-ইনসাফ, দয়া ও ইহসান ও পারস্পরিক সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা এমন মিশন যা পারস্পরিক মতপার্থক্য, অহংকার ও যুলুম-নির্যাতন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আল্লাহ বলেন :

(الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ)(النساء: من الآية١)

'যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ বা আত্মা থেকে' (সূরা নিসা : ৪/১)

বিশ্ব নবী ﷺ বলেন :

أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ

"জেনে রেখো! নিশ্চয়ই তোমাদের রব একজনই এবং তোমাদের পিতা ও একজন-ই।" (মুসনাদে আহমদ)

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়-ইনসাফ এবং দয়া ও ইহসানের প্রতি নির্দেশ দিচ্ছেন"। (সূরা নাহল : ১৬/৯০)

আল্লাহর বাণী :

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾

"এবং যারা পরস্পর পরস্পরকে হকের নসীহত প্রদান করে"।

(সূরা আল-আছর : ১০৩/৩)

আল্লাহর বাণী :

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾

"এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে দয়া ও ইহসানের নসীহত প্রদান করে"। (সূরা আল-বালাদ : ৯০/১৭)

আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে অধিক আল্লাহভীরু বা তাকাওয়াবান"।

(সূরা হুজরাত : ৪৯/১৩)

এ হেদায়েতের বাণী আর এ রেসালাত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বড় ধরনের অপরাধ হিসেবে বিবেচিত, যা বিশ্বের যে কোনো ব্যক্তির পূর্বে গোটা মুসলিম উম্মাহ, বিশেষতঃ জ্ঞানী-গুণী শিক্ষাবিদ, চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীদের উপর এ অপরাধের বোঝা অর্পিত হবে।

জাহেলী বস্তুবাদী বিশ্বাস ও মহাজাগতিক দর্শনকে শ্রেষ্ঠ মনে করার কারণে বিশ্বযুদ্ধ, সংঘাত, পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন ও উপনিবেশবাদের ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে মানবতা কঠোর থেকে কঠোরতম যুলুম-নির্যাতনে আক্রান্ত হয়েছে। শক্তিশালী উপকরণাদি আরো বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এ যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা অতিসত্বর বাড়বে। সবলদের ঔদ্ধত্যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের চরম কঠোরতায়, বস্তুবাদের তীব্র লোভ-লালসায় এবং মনস্তঃতাত্ত্বিক প্রতিযোগিতার বিশ্বে এ যুলুম-নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। এতে সরলমনা মানুষ ও সুসভ্যদের হৃদয়ে চরম আঘাত আসে। লড়াই-সংঘাত ও যুলুম-নির্যাতনের ট্রাজেডি দিবা-রাত্রি যেন তাদের কান জ্বালা-পালা করে দিচ্ছে এবং এসব দেখে চক্ষু যেন আপন

www.pathagar.com

স্থান থেকে উপড়ে আসার উপক্রম হচ্ছে। এসব লড়াই ও সংঘাতে সবল ও প্রভাবশালীদের লোভাতুর দাঁতের তীব্রতা যেন জ্বালিয়ে দিচ্ছে অসহায় ও দুর্বল চিত্তের মানুষের হৃদয়। রুগ্ন, নগ্ন, ক্ষুধার্ত ও সন্তানহারা অসংখ্য অসহায় নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক, কিশোর এমনকি শিশুরাও তাদের যুলুম-নির্যাতন ও হামলা থেকে নিরাপদ নয়।

এমন পরিস্থিতি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সবলরা ইচ্ছা করেই যেন স্বৈরাচারীদের কঠোরতা, বিদ্রোহীদের যুলুম-নির্যাতন থেকে তাদের দমন নীতি বন্ধ রাখছে। এটা এমন বিষয়ে পরিণত হয়েছে যা ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছে। যা রদ করার কোন উপায় নেই। এ অজ্ঞতা, যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখে রুখে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই।

উম্মাহ ও মানবতা এ যুলুম-নির্যাতন প্রতিহত ও দমন করা ব্যতীত কখনো ক্ষান্ত হতে পারে না। অবশ্য তা তখনই সম্ভব হবে যখন উম্মাহ সার্বক্ষণিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির মত কাজ করবে। সুন্দর চরিত্র গঠন, যথাযথ দায়িত্ব পালন, উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষা ও আত্মগঠনের মাধ্যমে স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মনে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

মুসলিম উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংস হওয়া, উম্মাহর সভ্যতা বিলীন হয়ে যাওয়া গোটা মানবতার এক পঞ্চমাংশ ধ্বংসের সমতুল্য। এটা মানবতার ইতিহাসে বড় ধরনের ক্ষতি। কারণ, মুসলিম উম্মাহই তো মহান সভ্যতার উত্তরসূরী। তাঁরা সকল কল্যাণের রেহেম স্বরূপ। যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি অগ্রগতির চালিকাশক্তি। যেহেতু তাঁরা আসমানী রেসালত বহন করছে। মানুষ ও বিশ্বের ইতিহাসে তারা 'খায়রাহ মুয়াছ্ছাকাহ' সুদৃঢ় কল্যাণকর মিশন বহন করছে। এ মহান মিশন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, বিবেকবুদ্ধি, শক্তি-সামর্থের প্রেরণাকে পাল্টে দিয়েছে। চারিত্রিক মূল্যবোধ, আত্মগঠন, আল্লাহর সুন্নাত বা নিয়ম ও দর্শন তাদের নিকট উপস্থাপন করেছে। তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছে অভিনব বিজ্ঞান ও প্রাণবন্ত সভ্যতা। সুতরাং এটা কখনো কল্যাণকর, ইনসাফভিত্তিক ও যুক্তিসংগত হতে পারে না যে, সত্য সাক্ষ্যদাতা এ উম্মাহর অধিকাংশ সন্তানেরা সকল মানব সন্তানের চেয়ে সবচেয়ে বেশি অভাবে, কষ্টে ও অসহায়ত্বে জীবন-যাপন করবে। আর তাদের জাতি যুলুম-নির্যাতন, নিপীড়ন, হুমকি-ধমকি, রুগ্নতা-অসুস্থতা, অজ্ঞতা-মূর্খতা আর দরিদ্রতার অন্ধকারের শিকার হবে তা হতে পারে না।

ইসলামী বিশ্ব ও মুসলিম উম্মাহর মুক্তি কেবল মানবতার অস্তিত্ব ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক পঞ্চমাংশের মুক্তি নয়; বরং এটা ভবিষ্যৎ সকল মানুষের মুক্তিও বটে। মানব সভ্যতা আজ বিপন্ন, ক্ষতিগ্রস্থ, বাজে বিশ্বাস ও বন্য হিংস্রতার হুমকির সম্মুখীন।

আফসোসের বিষয়, মুসলিম উম্মাহকে আজ রক্ষা করা শুধু কেবল অনুভূতি ও আগ্রহের বিষয় নয়, বরং এটা বাস্তবে কার্যকর করার বিষয়। আর পদ্ধতিগত বিজ্ঞানের সুবিন্যস্ত প্রচেষ্টা উম্মাহকে সুমহান পবিত্র ইসলামের দিকে পৌঁছে দেবে, যার সঠিক উপলব্ধি ও সংস্কৃতি মিশে আছে মুসলিম জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসের সাথে। তবে মুসলমানদের

www.pathagar.com

অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি, পুরনো কৃষ্টি-কালচার, অনুশীলনীর বিলুপ্তি, সীমালংঘনের অন্ধকার দিক এবং পূর্বপুরুষদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ভোগবাজি, বাতিল ও মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিদের বিষয়ে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইসলাম, ইসলামী সংস্কৃতি এবং এর মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিষ্কার বুঝতে হলে অবশ্যই কুরআনুল কারীমকে সেভাবেই বুঝতে হবে যেভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে। সামান্যতমও রদবদল করা চলবে না। উম্মাহর ইতিহাস জানতে হবে। জানতে হবে উম্মাহর চিন্তা-চেতনা, মত ও পথ এবং ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ও নমুনার কারণ। এতে উম্মাহ নোংরা সংস্কৃতি ও সামাজিক বিকৃতির বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে জানার দিক নির্দেশনা পাবে। পাশাপাশি এসব নোংরা সংস্কৃতি ও সমাজ বিকৃতির পথকে কীভাবে ঠিক করা যায় এবং এর মূল কারণসমূহকে চিহ্নিত করে সামাজিক সঠিক মূল ধারাকে কীভাবে চালু করা যায় এ সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

একক ও সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করলে মানবতার সম্মুখে ইসলামের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা স্পষ্ট হবে।

এতে মানুষের অন্তরে ইসলামের হেদায়েতের আলো উপলব্ধি হবে। সুস্থ স্বভাব, অতি মূল্যবান ও উত্তম স্বভাব গঠনের আগ্রহী হবে। এমনকি মানুষের নিকট তখন নফস বা আত্মগঠন ও মহাবিশ্বজগত নিয়ে চিন্তা করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। বোধগম্য হবে যে, নিঃসন্দেহে ইসলাম ও ইসলামের হেদায়েত সত্য পথ। আর বিশাল আকাশ ও বিস্তীর্ণ জমীনের মালিক ও মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসা এ মহান দীন ইসলাম নিঃসন্দেহে একটি ইসনাফ-ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা।

পদ্ধতি : গাইড ও পথপ্রদর্শক (المنهج : دليل ومرشد)

এ গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা শুরুতেই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি স্পষ্ট করে দিতে চাই। এতে আমরা বিভিন্ন সমস্যা ও কারণসহ এর তদারকীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো।

অনেক সময় সংলাপ ও আলোচনা সংলাপকারীদের আলোচনা পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিক বিভিন্ন হবার এবং আলোচক ও গবেষকদের চিন্তাধারার ও অনুভূতির বিভিন্নতায় আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ, অভিন্ন চিন্তাধারা ব্যতীত আলোচনা ও গবেষণা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি (الشمولية والجزئية في المنهج)

সমগ্র সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগত বিষয়ে আল্লাহর নিয়ম সম্পর্কে জানার বিষয়ভিত্তিক গবেষণার অংশ হিসেবে এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। চারিত্রিক মূল্যবোধ ও পূর্ণ আত্মগঠনের

www.pathagar.com

দিক থেকে এ পদ্ধতিকে ইসলামী পদ্ধতি বলা যায়। ইসলাম প্রতিনিধিত্ব করে এমন কল্যাণকর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে এবং এটা পূর্ণাঙ্গ সমাধানমূলক পদ্ধতি। আর সামাজিক বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা একটি জরুরি বিষয়। কারণ, এতে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝা যায় এবং সামাজিক মৌলিক অজানা কারণসমূহ জেনে একটা লক্ষ্যে পৌছা যায়। অপরদিকে অপূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকে কাঠামোগত জটিলতা। অনেক ক্ষেত্রে গবেষক অপূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বাস্তবতায় পৌছতে ব্যর্থ হন। বাস্তবতায় তো পৌছতে পারেন-ই না; বরং এমন উল্টো ত্রুটিপূর্ণ পথে চলেন যেখানে শুধু থাকে কল্পনা আর কল্পনা। তখন বাস্তবতা কল্পিত বস্তুতে পরিণত হয়। সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সম্ভবতঃ কাছাকাছি সাদৃশ্যের সম্পর্ক পাওয়া যায় ঐ ব্যক্তির সাথে, যে কয়েক টুকরো কাগজ জমা করে তাতে কালি টেনে দিল। এরপর কাগজের টুকরোগুলোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে চিন্তা-ভাবনা করল। এ চিন্তা-ভাবনার দ্বারা বাস্তবে তার কিছুই অর্জিত হলো না। বরং এ ধরনের খেয়াল বা চিন্তা-ভাবনাকে ধারণা বা কল্পনা বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলেও কোন লাভ নেই। কারণ, তা কেবল কল্পনাই হবে। বিক্ষিপ্ত কিছু কাগজে কালি ঢালা ব্যতীত এতে ভিন্ন কোন চিত্র লক্ষ্য করা যায় না।

আবার গভীর চিন্তা-ভাবনাকে ভালভাবে প্রয়োগ করতে পারে না- এমন ব্যক্তিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি নিছক কল্পনা ও ব্যর্থ ফলাফলের দিকে পৌছে দেয়। বাস্তবতার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। কখনো ঐ ব্যক্তি আবেগময়ী হয় এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রবল ধারণা অনুযায়ী তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও যখন শ্রোতামণ্ডলী তার বক্তব্য শ্রবণ থেকে বিরত থাকে, তখন তিনিও বিস্ময়ে তাদের থেকে বিরত থাকেন।

স্থান, কাল ও পাত্রের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিলে পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সন্দেহমূলক পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ বা আংশিককে ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

এ পর্যায়ে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে : কোন লোক এলোপাথাড়িভাবে বলল যে, এক মিলিয়ন দেরহাম কম কিংবা বিরাট অংকের অর্থ। উপরিউক্ত দু'টো বিষয়ের একটি দিক সঠিক হবে কিন্তু দেরহামের এ অংক থেকে এ উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় নি। তবে হ্যাঁ যদি এ অংকটা কোনো ব্যক্তির মাসিক বেতন হিসেবে ধরা হয়, তাহলে হয়তো তা বড় ধরনের অংক ধরে নেয়া যায়। আর যদি এ অংক দ্বারা কোন সংস্থা কিংবা কোন দেশের বাজেট উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা একেবারে নগণ্য হিসেবে গণ্য হবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

www.pathagar.com

সুদীর্ঘ কাল ধরে ইসলামী সভ্যতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হওয়া, উম্মাহর সন্তানদের দায়িত্ব পালনে দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ উদ্ঘাটন এবং উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষা করার সংকট সমাধানের জন্য আজ গবেষকদের গবেষণা করা আবশ্যক। গবেষক এ বিষয়ে সমাধানমূলক পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে গবেষণা করবেন। এ গবেষণায় উম্মাহর পারস্পরিক অনৈক্য, দুর্বলতা, অক্ষমতা ও পশ্চাতপদতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষককে অবশ্যই সাহিত্যমনা সাহসিকতা ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে সজ্জিত হতে হবে। যে কোন বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের পরও যেন বাদ না পড়ে এমনভাবে গবেষণা করতে হবে। এতে বাস্তবতা ও সত্য প্রকাশ পায়।

গবেষণাকর্মে ভয়ভীতির উর্ধ্বে থাকতে হবে। এখানে সাহিত্যমনা সাহসিকতা ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতা থাকা চলবে না। অথচ উম্মাহর বর্তমান সন্তানদের মাঝে এ বিষয়গুলো দেখা যায়। তাদের মনে চরম ভয়-ভীতি কাজ করে। কোন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা, আবেগময়ী হওয়াও কোন বিষয়কে অসত্যের জালে আবৃত করা হলে ভয় পাওয়া ও স্বাভাবিক। উপরিউক্ত বিষয়গুলো তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় তাদের মনে ভীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এমন কি মনে হয় একজন আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদ এতটা ভয়-ভীতি তার মনে কাজ করে যা প্রাণীকূলের মধ্যে পাখীদেরও হার মানায়। আপনি দেখবেন একজন চিন্তাবিদের ভয়-ভীতি তার চিন্তা-চেতনায় ও বক্তব্যেও ফুটে উঠে। তিনি ভীতির কারণে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা করতে পারে না। আসলে মুসলিম ভয় পাবার জাতি নয়। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে যারা বিশ্বাস করে, তারা ভীতু। যুগ যুগ ধরে দেখা যাচ্ছে, হিন্দুরা নিজেরাই নিজেদের আক্বিদা-বিশ্বাসে সন্দেহ পোষণ করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী শত শত মিলিয়ন লোক অসহায়ভাবে দিনাতিপাত করছে। অপমানজনক কারাগারে তাদের নিরাপদ জীবন চলছে। কখনো ভয়ে মুখ খুলে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না।

এবার আমাদের চিন্তাবিদদের গবেষণা বিষয়ে আসা যাক। আপনি অনেক ইসলামী চিন্তাবিদকে দেখবেন তারা পূর্বপুরুষদের বক্তব্য ও অভিমত থেকে বের হতে চান না। তারা পূর্বসূরী সংস্কৃতি (الثقافة التراثية) গ্রহণ করে থাকেন। কোন বিষয়কে বাদ দেয়ার ভয়ে পূর্বের বিষয়কে তারা বহাল রাখেন। ফলে উম্মাহর জন-মানুষের মনে একই বিষয় বারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। শরয়ী মাকাসিদ ও আক্বিদা সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণামূলক বিষয় শুধু সংলাপ দ্বারা সমাধান কখনো সম্ভব নয় এবং পূর্ববর্তী যুগের এখতেলাফী বক্তব্য দ্বারাও তার সমাধান সম্ভব নয়। বারবার একই সংস্কৃতি গ্রহণ পদ্ধতিগত অজ্ঞতারই নামান্তর। এতে উম্মাহ ও সংস্কৃতিমনা লোকজনের মনে ভীতি

www.pathagar.com

এবং অন্ধ অনুকরণের প্রভাব সৃষ্টি হয়। আর সত্যিকার অর্থে উম্মাহর পারস্পরিক অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা, হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। সমাজ সভ্যতায় কোন নতুনত্ব আসে না। অপরদিকে উম্মাহর চিন্তা-গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও নতুনত্ব না আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একজন মুসলিম গবেষককে মত প্রকাশে সাহসিকতা ও চিন্তা, গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনত্ব আনতে হবে। কারণ, এটা বাস্তব জীবনে আমূল পরিবর্তন, অভিজ্ঞতা অর্জন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সজ্জিত হওয়াসহ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন হয়। এতে বাস্তব জীবনে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি তাদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি গঠন : (الشمولية وبناء الأوليات)

সামাজিক যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দলিল ছাড়া প্রভাব বিস্তারকারী কোন কারণে পূর্ণাঙ্গ সমাধানমূলক গবেষণা গ্রহণ করা যায় না। বরং দেখতে হবে সমাধান কোন পথে সম্ভব। সাধারণতঃ সামাজিক যে কোন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকটি কারণের মধ্যে যে কোন একটি কারণ দিয়ে সমাধানের পথ গ্রহণ করা যায়। সাংস্কৃতিক, অস্বচ্ছ দর্শন ও আবেগপ্রবণতা কিংবা এলোপাথাড়ি ইচ্ছার কারণে কোন বিষয়ের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা অপূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে। এক বা একাধিক কারণ অথবা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কারণকে না জানার ভান করা ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যার শামিল। আর ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা অপূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত।

অপূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল সাধারণতঃ পূর্ব থেকে আসা অনুভূতি ও আবেগ- প্রবণতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ অনুভূতি ও আবেগ-প্রবণতার কারণে মানুষ সঠিক লক্ষ্য স্থলে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। পদ্ধতিগত জটিলতা তৈরি হয়। সবল সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয় এবং নীরব সংলাপ ব্যর্থ হয়। নীরব সংলাপ বলা যায় এমন সংলাপকে যার মাধ্যমে প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা যায়, জটিলতা দূর হয়, সমস্যার সমাধান হয় এবং সর্বোপরি সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা যায়। যে কোন সমস্যা কিংবা ক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ কারণ জানা এবং মৌলিক অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া সামাজিক প্রভাব ও সমাজের সাথে কীভাবে কার্যকরী সমাধান করা যায় এ বিষয়টি অনুধাবনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব রাখে। অবশ্য এসব কারণের মধ্যে সামাজিক পারস্পরিক আচরণের উত্তম দিক গ্রহণ করতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

আসলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সামাজিক সমস্যা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা। শুধুমাত্র কারণ জানলে হবে না। আবার মৌলিক কারণ ও নতুন নতুন জটিলতার মধ্যকার পার্থক্য রয়েছে।

www.pathagar.com

অনেক চিন্তাবিদ রয়েছেন যাঁরা নতুন নতুন জটিলতাকে গ্রহণ করেন। মৌলিক বিষয়ের বাইরে অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করেন না। তারা সহজ সরলভাবে সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

মূলত নতুন জটিলতা এমন বিষয় যা মোকাবেলা করলে মৌলিক বিষয়ের ও মোকাবেলা করতে হয়। আমাদের উপনিবেশবাদ, বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিক অত্যাচারী প্রভাব বিস্তারকারী সংশ্লিষ্ট শক্তি সমূহের মোকাবেলা করা উচিত। কোন অবস্থায় এদের মোকাবেলা বাদ দেয়ার মত বড় ধরনের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি করা যাবে না। উম্মাহর অধঃপতন, শক্তিহীনতা ও অক্ষমতা এবং পশ্চাতপদতা থেকে উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আমাদের মোকাবেলা করা উচিত।

এমনিভাবে এ গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, আমাদেরকে উম্মাহর বিচ্ছিন্নতা, দুর্বলতা, অক্ষমতা ও পশ্চাতপদতার সংকটের ক্ষেত্রে প্রভাববিস্তারকারী কী কী কারণ রয়েছে তা ভালভাবে অবগত হতে হবে। এতে পূর্ণাঙ্গ একটা নমুনা স্পষ্টরূপে জানা সম্ভব হবে। সময় ও কাল ভেদে কোনটি নতুন ও কোনটি মৌলিক বিষয় তা সুনির্দিষ্ট করার জন্য প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রভাবিত হয় এমন পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য উপাদানসমূহ জানতে হবে। আর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নতুন জটিল বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। যখন চলমান প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহ বাস্তবসম্মত ও অর্থবহ হবে, তখন তাকে সঠিক পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বলা যেতে পারে। একে উন্নত কিংবা অনুন্নত অস্থিতিশীল রাস্তার সাথে তুলনা করা যায়। আমাদের অনেক চিন্তাশীল এমন রয়েছেন, যারা মূল কারণকে খুজে বের করার চেষ্টা করেন না। সহজ সরল পথকে গ্রহণ করতে গিয়ে জটিল পন্থাকেই বেছে নেন। অনেক সময় তাঁরা কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে চলমান দ্বিধাদ্বন্দ্বে জর্জরিত হন। তাদেরকেই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব উপেক্ষা করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে। কারণ, দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিমজ্জিত থাকলে তা সঠিক উপলব্ধি ও দর্শনকে প্রতিহত করে এবং বাস্তবমুখী চিন্তাধারাকে সমূলে ধ্বংস করে তা ধূলো-বালির সাথে মিশিয়ে দেয়।

সঠিক পদ্ধতি (المنهج الشمولي السليم) এমন পদ্ধতিকে বলা হয় যা বাস্তবমুখী ও মৌলিক কারণ বিশ্লেষণে গুরুত্বারোপ করে। যখন বাস্তব কারণ, নতুন জটিলতা এবং উৎকৃষ্ট ও প্রভাববিস্তারকারী বিষয় একাধিক হয়, তখন নতুনভাবে মোয়ামেলা বা আচরণের জন্য পদ্ধতি ও মাধ্যমও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। উম্মাহকে সর্বশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে পারস্পরিক আচরণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সকল বাধা-বিপত্তি ও জটিলতাকে উপেক্ষা করে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ সমাধানের পথ বের করার জন্য সার্বক্ষণিক গবেষণা করতে হবে। যখন আমরা পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও পশ্চাতপদতা লক্ষ্য করি, তখন আমাদের নিকট একটি বিষয় স্পষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে যায় যে, দীর্ঘ এক সহস্র কালের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উম্মাহর সভ্যতা সংস্কার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

এতদ্সত্ত্বেও দীর্ঘকাল যাবত উম্মাহ পারস্পরিক অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও অধঃপতনের সংকট থেকে মুক্তি এবং উম্মাহর চিন্তার সুস্থতা ও তাদের মূল সভ্যতা যা আজও বিশ্বে সাক্ষ্য বহন করছে- (الشاهد في العالمين) তা ফিরিয়ে আনার জন্য একাধিক সমাধানের পথ গ্রহণ করেছে। অবশ্য উম্মাহর অনেক সন্তান ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পর্যায়ের অনেকের এখলাস বা একনিষ্ঠতা ও আত্মত্যাগ থাকা সত্ত্বেও এ পদক্ষেপ সফল হয় নি। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পূর্ণদক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে ত্রুটি থাকায় পূর্ববর্তী উম্মাহ ও মুসলিম উম্মাহর মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, উম্মাহর নিকট আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করার অধিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করে পরাধীনতা ও পরাজয়ের গ্লানি তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে। উম্মাহর অস্তিত্ব টিকে থাকবে কি-না এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। উম্মাহর সন্তানদের ভাগ্যে যেন শুধু ক্ষুধার জ্বালা-যন্ত্রণা, অজ্ঞতা, অসুস্থতা ও পশ্চাতপদতা। আল্লাহ না করুন, হয়তো একদিন এমন আসবে সে সময় উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ পাথুরে মানুষে পরিণত হবে। যখন পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জের যুগ ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র- উসমানী রাষ্ট্রের অধঃপতনের সময়কালের প্রতি আমরা লক্ষ্য করি, তখন সেখানে প্রায় তিন শতাব্দীকাল ধরে ইসলামী বিশ্বে পুনঃজাগরণ (রেনেসাঁ) ও দীনি সংস্কার আন্দোলনের প্রচেষ্টার বিষয়টি জানতে পারি।

দীর্ঘকাল ধরে যে সকল মনীষী দীনি সংস্কার ও ইসলামী রেনেসাঁ বা পুনঃজাগরণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তাদের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :

আরব উপদ্বীপে ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব (রহ) (মৃতঃ ১৭৯২ খৃঃ) দীনি সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁকে দীনি সংস্কার আন্দোলনের মূল প্রবর্তক বলা যেতে পারে।

এদিকে ভারত বর্ষে দীনি সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন জনাব শহীদ শাহওয়ালী উল্লাহ (রহ) (মৃতঃ ১৭৩৬ খৃঃ) এবং উসমানী সুলতান তৃতীয় সালিমের (মৃতঃ ১৮০৭ খৃঃ) নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এভাবে দীনি সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় লিবিয়ায় আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী আল-সানুসীর (মৃতঃ ১৮৫৯ খৃঃ) নেতৃত্বে। সুদানে মুহাম্মদ মাহদীর (মৃঃ ১৮৮৫ খৃঃ) নেতৃত্বে। মিশরে মুহাম্মদ আলী পাশা (মৃঃ ১৮৪৯ খৃঃ) এবং উসমানী মন্ত্রী (الوزير العثماني) খায়রুদ্দীন পাশা তিউনিসীর (মৃঃ ১৮৯০ খৃঃ) নেতৃত্বে। এবং ভারতে স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খানের (মৃঃ ১৮৯৮ খৃঃ) নেতৃত্বে।

www.pathagar.com

আরো যারা এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা হলেন : জামালুদ্দীন আল-আফগানী (মৃঃ ১৮৭৯ খৃঃ) শায়খ ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহু (মৃঃ ১৯০৫ খৃঃ), শায়খ আব্দুর রহমান আল-কাওয়াকিবী (মৃঃ ১৯০২ খ্রিঃ), সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রশীদ রেজা (মৃঃ ১৯০৩ খ্রিঃ), শহীদ হাসানুল বান্না (মৃঃ ১৯৪৯ খৃঃ)।

এরপর থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে বেসামরিক আযাদী আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়েছে। এ সকল আন্দোলন ও চিন্তা- ধারার ফলাফল স্পর্শকাতর।

এ সকল আন্দোলনের সমস্যা ও প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিটি রোগ নির্ণয়, উপযুক্ত সমাধান করাসহ যুগের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সভ্যতা সংস্কার বাস্তবায়ন এবং দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে উম্মাহ সফল হতে পারে নি। উম্মাহর সকল সংকট থেকে বাঁচার জন্য আজ ইসলামী পুনঃজাগরণ আন্দোলন শুরু করার লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করে দীনি সংস্কার আন্দোলন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ইসলামী চিন্তাধারায় আন্দোলন গড়ে তোলা সময়ের দাবি।

আমরা ইসলামী আন্দোলনের যাত্রা শুরু করতে পারি সরাসরি ইসলামের মৌলিক চিন্ত াধারা থেকে। মৌলিক চিন্তাধারা বিষয়ক দু'টো গ্রন্থ লিখেছেন শায়খ আব্দুর রহমান আল-কাওয়াকিবী (রহ)। গ্রন্থ দু'টো হলো :

ক. উম্মুল কুরা (أم القرى)

খ. তাবায়িউল ইসতেবদাদ (طبائع الاستبداد)

* প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে তিনি ইসলামী নীতিমালা ও মূল্যবোধ বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে-

* একত্ববাদ,
* ন্যায় ও ইনসাফ,
* পারস্পরিক ঐক্য ও সমন্বয় এবং
* পরামর্শ বিষয়ক আলোচনা।

দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে তিনি স্বৈরাচার, যুলুম-নির্যাতন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে যারা ক্ষমতার মসনদে আরোহন করেছে সে সকল সরকারের কাঁধে উম্মাহর পশ্চাদপদতা ও অধঃপতনের দায়ভার তুলে দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো- এ আন্দোলন কেন সফল হয় নি। কেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্ত বতার মুখ দেখেনি? এতে কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল?

জবাবে বলা যায়, যদি আন্দোলনের রূপরেখা নির্ণয়ে ভুল হয় তাহলে আন্দোলনের শুরুটা তো ভুলই হবে। আসলে প্রথমতঃ আন্দোলনের রূপরেখা নির্ণয় বিশ্লেষণধর্মী ও

www.pathagar.com

গবেষণামূলক হয় নি। দ্বিতীয়তঃ আন্দোলনের রূপরেখা নির্ণয় বিজ্ঞানসম্মত হয় নি। হ্যাঁ, একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত গবেষণাই আল্লাহর ইচ্ছায় পূর্ণ সমাধানের পথে পৌছতে পারে। উম্মাহর সংকট মোকাবেলা করে সকল বাঁধা অতিক্রম করে। ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের বাস্তবায়ন হতে পারে।

অবশ্য একথা বলা যাবে না যে, আজ পর্যন্ত যা কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে তা ভুল ছিল। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের সংস্কার ও পরিবর্তনের জন্য এতটুকু বাস্ত বায়ন যথেষ্ট ছিল না। আর তাই বলা যায়, উম্মাহর চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদেরকে বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় যে, হয়তো একদিন উম্মাহর পারস্পরিক অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা, পশ্চাতপদতা এবং তাদের সন্ত ানদের দায়িত্বপালনে দুর্বলতা ও অক্ষমতার সংকট চিরতরে দূরীভূত হবে ইনশাআল্লাহ।

বিশ্বাস ও চিন্তাগত নিয়মের বৈশিষ্ট্যসমূহ জানার গুরুত্ব :

প্রথমেই একজন গবেষককে কোন কারণ ছাড়াই লক্ষ্য করতে হবে কীভাবে দীনি সংস্কার ও পুনঃজাগরণ আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাকলিদ বা অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে দীনি সংস্কার শুরু হয়। হ্যাঁ উম্মাহর এ তাকলিদ দু'টো দিক থেকে শুরু হয়।

ক. ইতিহাস বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উম্মাহর আবেগ ও অনুভূতির প্রবণতার মধ্য দিয়ে উম্মাহর তাকলিদ শুরু হয়।

অথবা, খ. প্রভাবশালী বিদেশীদের হুমকী-ধমকী, চাপ প্রয়োগ ও মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা দেয়ার কারণে উম্মাহর তাকলিদ বা অনুকরণ ও অনুসরণ শুরু হয়। একথা স্পষ্ট যে, অনুকরণ-অনুসরণের চিন্তাধারা কোন শক্তিকে কার্যকর শক্তিতে পরিণত করে নি বা কার্যকর শক্তিতে পরিণত করতে পারেনি। কিংবা কোন প্রেরণাকে আন্দোলিত করতে পারেনি এবং কখনো পারবেও না। আর এক্ষেত্রে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানগণ যখন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি করবে, মুসলিম অস্তিত্ব যখন দুর্বল ও নড়বড়ে হয়ে পড়বে তখন উম্মাহর অবস্থা আরো করুন ও ভয়াবহ হবে এবং তাদের পুনর্জাগরণ আন্দোলন সফলতার মুখ দেখতে পারবে না।

যেহেতু উম্মাহর দীনি সংস্কার ও পুনঃজাগরণ আন্দোলন ইতিহাস ও বিদেশীদের অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল সেহেতু তা ইতিহাসের পৃষ্ঠাসমূহকে পরিবর্তন করতে পারেনি।

এজন্য অবশ্য গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিকে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানমূলক পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিতে সজ্জিত হতে হবে। এতে উম্মাহর অধঃপতনের দিকসহ পশ্চাতপদতার

www.pathagar.com

কারণ জানা সম্ভব হবে এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগের জন্য বাস্তবসম্মত পদ্ধতিসমূহ জানা যাবে। আর স্থান ও কাল ভেদে বাস্তব জীবনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উম্মাহর অনুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মৌলিকভাবে জানা সম্ভব হবে।

বর্তমান ও অতীতের মাঝে সংক্রামিত চিন্তাগত ভুল-ভ্রান্তি :

অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সূচনা লগ্ন থেকে উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিনিধিত্বকারী জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণতায় পৌছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বড় ধরনের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার মধ্যে গণ্ডগোল থাকায় এবং অনেক ক্ষেত্রে উম্মাহর চিন্তা-চেতনায় ভুল-ভ্রান্তি বিদ্যমান থাকায় কিংবা উত্তম বিষয় কোনটি তা নির্ধারণ করতে না পারায় এবং বিভিন্ন জাতির প্রাচীন-কিংবদন্তী ও দর্শন গ্রহণ করার কারণে উম্মাহ সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। এভাবে উম্মাহর শক্তি-সামর্থ সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। উম্মাহর দর্শনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। উম্মাহর চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসে দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং উম্মাহর মাঝে ফিতনা-ফাসাদ, কুসংস্কার, অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা প্রতিনিয়ত তাদের বেষ্টন করে রেখেছে।

এজন্য উম্মাহর বৈশিষ্ট্য এবং উম্মাহর সভ্যতার চিন্তাধারাসমূহ বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে জানতে হবে যে, কোন কিছুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কিছু System বা পদ্ধতি থাকে- যা কোষ থেকে শুরু হয়ে অণু পর্যন্ত থাকে। আর প্রত্যেকটি নিয়মের কিছু বৈশিষ্ট্য, কাজের পদ্ধতি এবং শক্তির সীমাবদ্ধতা থাকে। যদি নিয়মের বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতার প্রতি যথাযথ লক্ষ্য না করা হয়, তাহলে নিয়ম-নীতি ধ্বংস হতে বাধ্য। নিকটতম স্পর্শকাতর একটা উদাহরণ হলো মানবদেহ। মানবদেহের একটা নিয়ম আছে। এ নিয়মের কিছু বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি ও শক্তির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দেহটাকে উদাহরণস্বরূপ ধরে নেয়া যাক।

যদি কেহ নাক দিয়ে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে, তা তার জন্য উপকারী বটে কিন্তু তা যদি শিরায় গ্রহণ করে– তা এক সে. মি. পরিমাণ হোক- তাহলে শিরার রগ ফুলে তাৎক্ষণিক সে মৃত্যু মুখে পতিত হবে। নিয়ম গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে কোন কৃতত্ব নেই। বরং পদ্ধতিগতভাবে কতটুকু গ্রহণ করা গেল তাই আসল কথা। এমনিভাবে বিষয়টি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথেও সম্পৃক্ত। আমাদেরকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ ও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনটা গ্রহণীয় ও কোনটা বর্জনীয় তা লক্ষ্য করতে হবে। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বিষয়টিকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও সূক্ষ্ম গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করেন না। উম্মাহ আজ দুর্বল চিন্তা- ধারা, অসচ্ছ নিয়ম-নীতি গ্রহণ করছে। উন্নয়নমূলক নতুন কোন চিন্তা-গবেষণা করছে না। তারা আজ প্রভাবশালী শক্তি দ্বারা প্রভাবিত। কোন পদ্ধতি ব্যতীত বিভিন্ন জাতির চিন্তাধারা ও দর্শন গ্রহণ করছে।

www.pathagar.com

তারা ভাবছে না এ চিন্তাধারা তাদের আক্বিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনায় কতটুকু পরিবর্তন করছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, উম্মাহ পাশ্চাত্য, বস্তুবাদী দর্শন অনুকরণ করছে বিধায় চরম ভুলের মধ্যে অবস্থান করছে। বস্তুবাদী চিন্তাধারায় জীবন ও জীবন ধারণের উপকরণই চূড়ান্ত কিছু। এর বাইরে ভাবার কোন সুযোগ নেই। এ চিন্তাধারা খুবই মারাত্মক। এ বস্তুবাদী চিন্তাধারা উম্মাহর চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে বিনষ্ট করছে। উম্মাহর মজবুত ভিতকে নেড়ে দিচ্ছে এবং ঈমান ও আক্বিদা বিশ্বাসকে ধ্বংস করছে।

মুসলিম উম্মাহর অনুভূতি, বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। উম্মাহর ঈমানীশক্তিকে প্রকাশসহ তাদের সাহসিকতাকে জাগিয়ে তোলা এবং উম্মাহর সন্তানদের মনে ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় জাগ্রত করা বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদার (রা.) যুগের প্রথম সময়কাল ছিল উম্মাহর ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আধুনিক ইসলামী চিন্তাধারা সে অবস্থা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। তারা সঠিক দর্শনের দলিল ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে। আব্বাসীয় ও উমাইয়্যাহ যুগে গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করার উদাহরণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে গ্রহণ করার এ কার্যক্রম যদিও ইসলামী সভ্যতাকে অতীত কর্মদক্ষতার পন্থা শেখায় এবং পদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় লাভে কিছু উপকরণ দেয় কিন্তু এটা ইসলামী সভ্যতার প্রাণশক্তিকে চরম ক্ষতির সম্মুখে ঠেলে দেয়। তাওহিদ, আক্বিদা-বিশ্বাস ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে জীবন গড়ার পদ্ধতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইসলামী আন্দোলনকে কয়েক ধাপ পিছিয়ে দেয়। ইসলামী বিশ্বজনীন দর্শনকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। ফলে এ দর্শন কতক বাহ্যিক যুক্তিতে পরিণত হয়। বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত ইসলামী জীবন গড়ার পদ্ধতিকে ধ্বংস করে দেয়। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে উম্মাহর চিন্তাধারায় ইসরাঈলী চিন্তাধারা ও কুসংস্কার স্থান করে নেয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে ইসলামী সভ্যতা নিষ্প্রাণ বস্তুতে পরিণত হয়।

জ্ঞান ও অনুভূতির মধ্যে সম্পর্ক :

উম্মাহর আলেম সমাজ, চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা পদ্ধতিগত সংকট সৃষ্টির প্রধান কারণ। মানবিক জ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় গুরুত্ব না দেয়ার ফলে উম্মাহর চিন্তাশীলদের মধ্যে এ অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। ফলে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিশু ও নারীর ভূমিকা ও গুরুত্বহীনতায় পরিণত হয়। এতে শিশুদের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা তৈরির বাস্তব দিক অনুপস্থিত থাকে। অথচ শিশুদের বিভিন্ন স্তরে কীভাবে পাঠদান করতে হবে সে বিষয়ে

www.pathagar.com

গবেষণাসহ শিশুদের বুদ্ধি ও অনুভূতি কীভাবে বিকাশ লাভ করবে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন এবং পাশাপাশি উম্মাহর সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও অনুভূতি তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষামূলক চিন্তাধারা ও সামাজিক পরিবর্তন :

এ গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো চিন্তা, গবেষণা ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৌলিকভাবে শিশুদের সমস্যা ও শিক্ষামূলক চিন্তাধারার ভূমিকা সম্পর্কে জানা। ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতির স্বচ্ছতা ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী চিন্তাধারা এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। স্থান ও কালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তব উপদেশ ও শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং ইতিহাস, ভাষাজ্ঞান, প্রকৃতি ও নিয়ম সম্পর্কে গবেষণা করা চিন্তার পদ্ধতিগত উপকরণ দ্বারা সম্ভব হয়।

মুসলিম শিশুর বুদ্ধিমত্তা ও অনুভূতি গঠনে এ গবেষণা একটি কার্যকর বাস্তবমুখী ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এতে শিশু এমন বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা পাবে, যা একজন মুসলিমের বিশ্বজনীন দর্শনকে নষ্ট করে দেয়। কার্যকরী প্রাণশক্তি ও সৃজনশীল শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। আর এতে করে মুসলিমের ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও মনোবৃত্তি গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

সামাজিক পরিবর্তন সৃষ্টিতে শিশুর বিজ্ঞান সম্মত মনোবৃত্তি গঠনের চিন্তাধারা বর্তমানে নেই বললেই চলে। তাই সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শিশুর অনুভূতি শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য, শিশুর বিজ্ঞান সম্মত মনোবৃত্তি গঠনের চিন্তাধারা বর্তমান সময়ের দাবি। উম্মাহকে এ কমতির পূর্ণতা দানের জন্য কার্যকরী বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি জানতে হবে। মানবতা ও উম্মাহর সেবাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের জন্য, উম্মাহকে সংস্কার ও পুনঃজাগরণ আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য গবেষক চূড়ান্ত চেষ্টা করলে আল্লাহ চাহে তো আশা বাস্তবায়িত হবে।

একথা মনে রাখতে হবে যে, নিশ্চয়ই বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে অতীতকে বিচার করা ভুল। বরং অতীতের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও প্রেক্ষাপটের সাথে বর্তমানকে মিলিয়ে দেখতে হবে। এতে বাস্তব দিকগুলোর পারস্পরিক তুলনা করা সম্ভব হবে।

একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, মানবতার ইতিহাসে ইসলামী সভ্যতার মহানুভবতা ও বিশালত্বের কারণে আমরা সম্মানিত হয়েছি। আজও যদি পরিস্থিতি সুন্দর হয়, পরিবেশ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অনুকূলে হয়, আত্মশুদ্ধির প্রেরণা মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়, জটিলতা ও কুসংস্কার কমে যায়, তাহলে আবারও মানবতার ইতিহাসে ইসলামী সভ্যতা উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হবে। তখন ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে ঐ সভ্যতার নিদর্শনসমূহের।

www.pathagar.com

আর সাক্ষ্য দেবে মুসলিম জাতির জীবনে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল। এবং আধুনিক মানব সভ্যতা নতুন কি পদ্ধতি ও মূলনীতি তৈরি করেছিল।

সেই যা হোক আজ আমাদেরকে উম্মাহর চারিত্রিক মূল্যবোধ ও আত্মশুদ্ধির জন্য সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর হেদায়েত গ্রহণ করতে হবে। তাহলে উম্মাহর ভিত মজবুত ও শক্তিশালী হবে এবং উম্মাহ নামক বৃক্ষটি ফলবান বৃক্ষে পরিণত হবে।

মূল সংকট :

যখন আমরা স্বীকার করে নেব যে, উম্মাহ সংকটের মধ্যে বিরাজ করছে। এ সংকট যেন এক সাগর থেকে অন্য সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বস্তুবাদী উৎসসমূহ এ সংকট কমাতে পারছে না। এক বিলিয়ন কিংবা দু'শত বিলিয়ন মানুষ অথবা এক পঞ্চমাংশ মানবতাও যেন এ সংকট হ্রাস করতে পারছে না। কোন আদর্শ, বিশ্বাস, মূলবোধ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ইসলামী শরয়ী মাকাসিদও এ সংকটকে হ্রাস করতে পারছে না। ইসলাম আসমানি রিসালাতসমূহের সর্বশেষ রিসালাত। ইসলাম মানবতাকে কল্যাণ, হক, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি আহ্বানের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। ইসলামের হেদায়েতের বার্তা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সমান।

উপরিউক্ত সবকিছু মেনে নেয়ার পর যখন আমরা মেনে নেব যে, উম্মাহর সংকট নিরসনে এবং উম্মাহর সুস্থ চিন্তা-চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে আজ পর্যন্ত কোন প্রচেষ্টা ও ইসলামী সংস্কার আন্দোলন সফল হয় নি। সত্য কথা বলতে কি, উন্নত প্রযুক্তির বিপ্লব ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিকল্পনার বিশ্বে পূর্ববর্তী উম্মাহ ও মুসলিম উম্মাহর মাঝে অনেক ব্যবধান ও অপূরণীয় ফাঁটল ছিল। এসব কিছু মেনে নেয়ার পর আমাদের প্রতি একটি প্রশ্ন আরোপিত হয়।

আর তা-হল, কীসের কারণে উম্মাহর বিপদ এলো, কেন উম্মাহকে এ সংকটে নিমজ্জিত হতে হল? আর কীভাবে উম্মাহর সঠিক পথ বিচ্যুত হলো বা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল? এবং কীভাবে ইসলামের প্রাণ শক্তির প্রেরণা বাধাগ্রস্থ হল? উম্মাহর চিন্তার সুস্থতা ফিরিয়ে আনা, উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং দীনি সংস্কার আন্দোলন যুগ যুগ ধরে কেন সফল হয়নি?

এসবের জবাব হলো, সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রবল আগ্রহ না থাকায় অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও উম্মাহ সংকট থেকে অব্যহতি পাচ্ছে না। প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে আরো চলবে- তবে সমাধানের পথে বাধাগ্রস্থ হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে যেমন,

ক. পরিবেশ পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ না করা;

খ. সমস্যাবলীর প্রতি সকলের দৃষ্টি না দেয়া;

www.pathagar.com

গ. মোকাবেলা করার চাহিদা না বুঝা।

এখন প্রশ্ন হলো- কেন এ পরিস্থিতি হলো বা কেন চেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতি হলো?

জবাব হলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয়েছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে চেষ্টার ত্রুটি করা হয়েছে।

চেষ্টার দিকগুলো হলো :

ক. সঠিক পথ নির্ণয়ে পরিবর্তন আনা।

খ. ইসলামের প্রাণশক্তি বা আত্মশুদ্ধির পথকে উন্মোচন করা।

গ. এবং জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার চেষ্টা করা।

চেষ্টার ত্রুটির দিকগুলো হলো :

ক. ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট ঘটনাবলী থেকে উত্তরণের প্রেরণা না নেয়া।

খ. সংকট থেকে সঠিক সমাধান খুঁজে বের না করা।

ইসলামের হেদায়েত কোন জাতি বা গোষ্ঠী কিংবা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং ইসলামের হেদায়েত সকল যুগের পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। ইসলাম একটি শাশ্বত চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা। যুগ যুগ ধরে ইসলাম মানবতার কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করে আসছে। যাঁরাই এ দীন গ্রহণ করে কল্যাণ লাভে ধন্য হতে চান- এ দীন তাদেরকেই কল্যাণের পথ দেখায়।

স্বভাবত দীনের জ্ঞান পর্যাপ্ত পরিমাণ আহরণ ও দীন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন, বারবার দীনের নসিহত শ্রবণ এবং কালের অগ্রগতি ও উন্নতি সাধনের মাধ্যমে দীন নামক নহরের পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে বেড়ে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি দীন নামক নহরের পানি পান করে তথা দীন গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে, মর্যাদাবান হতে পারে। দীনি সম্পর্কের মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার মানুষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়। দীনের অঙ্কুর বা মূল অনেক দূর সম্প্রসারিত এবং দীনের দান ও অনুগ্রহ অফুরন্ত ও অত্যন্ত ব্যাপক।

আল্লাহ বলেন-

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

আমি অচিরেই আমার আয়াত বা নিদর্শনসমূহ তাদেরকে দেখাব দুনিয়ার দিক দিগন্তে এবং তাদের অন্তরে। যাতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ দীন হক। (সূরা ফুসসিলাত : ৪১/৫৩)

সুতরাং রিসালাতের যুগে রিসালাতের রূপদানের জন্য, মানুষের বাস্তব জীবনে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ্য, ন্যায়, ইনসাফ, পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ, হক ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ দীন এসেছে। ইহা নিছক কোন চিন্তাধারা নয় বরং এর হেদায়েত শাশ্বত। দুনিয়ার সকল

www.pathagar.com

মানুষের জন্য সমভাবে এর আহ্বান। প্রত্যেক শ্রেণী, গোত্র কিংবা জাতির মানুষ সকলেই এ দীন গ্রহণ করে ধন্য হতে পারেন।

আল্লাহ্‌র বাণী-

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি সেই যিনি তোমাদের থেকে সবচেয়ে পরহেযগার, আল্লাহ ভীরু।"

(সূরা হুজরাত : ৪৯/১৩)

কালের আবর্তে মানুষ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে মিলিত হলো, মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেল। মানুষ অপর জাতির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেল, তখন সকলের জন্য ইসলামের বার্তা বা মিশনই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এ মিশনের আবেদন চিরন্তন। এ মিশনের উপকার বিশাল ও ব্যাপক। এ মিশনের বাস্তবায়ন অতীব জরুরি ও সময়ের দাবি।

ঈমান সভ্যতার প্রেরণার উৎস ও সভ্যতা কেন্দ্রিক বস্তুবাদের যোগসূত্র

যখন আমরা ইসলামের প্রথম যুগের প্রতি তাকাই, সেখানে লক্ষ্য করি ঈমানী প্রেরণার উৎস, ইতিহাস স্বীকৃত ইসলামী সভ্যতা ও দর্শন এবং উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষায় নিয়োজিত রিসালাত বিশ্বাসী একদল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ।

তাহলে পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত উম্মাহর বাস্তব জীবনে রেসালাতের যাত্রা কীভাবে পথে পথে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, জবাব হলো : আজ উম্মাহর বাস্তব জীবনে রিসালতের মূল্যবোধ, রিসালতের দর্শন, রিসালতের প্রাণ শক্তি, আত্মশুদ্ধির প্রেরণা, ভ্রাতৃত্ব ন্যায়-ইন্‌সাফ ও সুনিপূণ দায়িত্ব পালন বলতে যা কিছুই বুঝায়, সব কিছুই যেন অনুপস্থিত এবং ব্যর্থ ও অকেজো হওয়ার পথে।

আর এ ভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থা জাতির ঘাড়ে চেপে বসে। আত্মশুদ্ধির চর্চা, সৃজনশীলতা ও নতুনত্ব গ্রহণের পরিবর্তে, দুর্বলতা, অক্ষমতা, কুসংস্কার ও যুলুম-নির্যাতনের রীতি তাদের অনুসরণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

উম্মাহ একদিকে যেমন তাদের আত্মশুদ্ধির প্রেরণা এবং উন্নয়ন ও নতুনত্ব গ্রহণ থেকে বঞ্চিত, অপর দিকে অপসংস্কৃতির চর্চা, ইসলামী সভ্যতার অধঃপতনের কারণে রেসালাতের সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের যুগের প্রথম দিকে ইসলামী রিসালত বাস্তবায়নের উত্তম দায়িত্ব পালনের পথ থেকে মুসলিম যখন

www.pathagar.com

সরে আসে, তখন তাদের মধ্যে নতুনভাবে কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। স্থান ও কালভেদে তাদের অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়।

যে সময়ে ইসলামের প্রাণ শক্তি তথা উম্মাহর আত্মশুদ্ধি গঠনের দিক দুর্বল হতে থাকে, ঠিক একই সময়ে উম্মাহর রাজ্যের পরিধি, শিল্প ও সভ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলামের রিসালত (মিশন) আরবে এসেছিল, যে সময় তারা আরব্য বেদুঈন ছিল। অজ্ঞ ছিল, লিখা-পড়া জানতো না। সে সময় ছিলনা তাদের রাষ্ট্র, ছিল না রাষ্ট্রের নীতিমালা, ছিল না কোন সভ্যতা, ছিল না জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কল-কারখানা।

আরবরা যখন পারস্য, রোম, ভারত, মিশর ও সিরিয়ার সভ্যতা থেকে গ্রহণ করছে। ঠিক সে সময়ে পারস্য, রোম ও ভারতের সভ্যতা ফাসাদ-বিপর্যয় ও ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। যে সময় আরবরা ভিন দেশীদের বিকৃত কৃষ্টি-কালচার সভ্যতা চর্চা করে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঠিক সময় বিশ্বজনীন একত্ববাদ দর্শন নিয়ে বিশ্ববাসীর নিকট আগমন করে ইসলামের বার্তা (রিসালত)। একত্ববাদ দর্শন তাদের নিকট আদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, কল্যাণকর সভ্যতা নিয়ে হাজির হয়।

তখন ইসলামের রিসালত বিশাল দিগন্ত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রবর্তন করে, যা মানব সমাজ ও সভ্যতার প্রেরণার জন্য শক্তিশালী মূলনীতি হিসেবে স্বপ্রকাশিত হয় এবং মহাজগত সম্পর্কিত ও মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিনব ও নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। এরপর এ রিসালত সমগ্র মানবতাসহ গোটা আরবজাতিকে জাহিলিয়্যাত ফাসাদ-বিপর্যয় ও যুলুম নির্যাতন থেকে বের করে- মহাজগত সম্পর্কিত বিশ্বাস, আদর্শ ও দর্শনের উচ্চাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ধাবিত করে। এ রিসালাত মানবতার ইতিহাসে আরব উপদ্বীপ-সহ তার চর্তুপার্শ্বে সভ্যতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে, যে সভ্যতায় পূর্ণাঙ্গরূপে স্থান পেল- আত্মশুদ্ধি গঠনের অনুভূতি, জ্ঞান, অদৃশ্য ও বাস্তব সংক্রান্ত বিষয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেয়ীদের যুগে ইসলামী রিসালতের প্রাণ শক্তির প্রেরণা যেমনটি ছিল তা কালক্রমে স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়েছে। গোটা সভ্য আরব জাতিসহ সভ্য দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও নিয়মনীতির বিভিন্ন দিক পরিবর্তন করেছে। এমন কি তাদের কেউ কেউ ভাষাকে পরিবর্তন করেছে। ভাষাকে যারা পরিবর্তন করেছে- তারা হল দক্ষিণ আরব উপদ্বীপ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার লোকজন।

কালক্রমে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সমাজের লোক এবং বিভিন্ন সভ্যতা ইসলামে প্রবেশ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়। এতে শিল্প ও সভ্যতার উন্নতি সাধিত হয়। বিভিন্ন জাতি ইসলামের প্রবেশের কারণে, তাদের কৃষ্টিকালচার,

www.pathagar.com

ঐতিহ্য দর্শন এবং তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী প্রাণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সামাজিক রীতিনীতি মহাজগত সম্পর্কিত দর্শন, সংস্কৃতি এবং আক্বিদাগত চিন্তাগত দূষণ পাওয়া যায়। এছাড়া রোম ও পারস্য সম্রাট, কায়সার ও কিসরার যুলুম নির্যাতন, স্বৈরাচার ও কুসংস্কার চর্চা এ দীনের সাথে যুক্ত হতে থাকে।

এভাবে উম্মাহর বিভিন্ন জাতির চিন্তাধারা, নিয়ম পদ্ধতি এবং চর্চা ইসলামী মূলনীতির সাথে মিশতে থাকে। যা উম্মাহর জন্য বড় ধরনের বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই স্বাভাবিকভাবে আমরা দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের সূচনা লগ্নে ইসলামের প্রেরণার শক্তি এবং পরবর্তী সময় ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি ব্যাপক ও প্রসার হওয়া এ দু'সময়ের মধ্যে উম্মাহর অসামঞ্জস্য বিপরীতমুখী ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়।

চারিত্রিক ঈমানী শক্তির দুর্বলতা কীভাবে শুরু হয়েছে

ইতিহাস সন্দেহাতীতভাবে আমাদের নিকট উপস্থাপন করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের যুগের পরবর্তী সময় থেকে ধর্মীয় আক্বিদা-বিশ্বাসের মূলে কুসংস্কার ও বিকৃতির প্রকাশ ঘটা শুরু হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উন্নত লক্ষ্য উদ্দেশ্যের অধিকারী ও দীনের প্রতি আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে খেলাফতের রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব- করবেন এমন যোগ্য সৈনিক ও উপযুক্ত পাহারাদার এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নিয়ম-পদ্ধতি পর্যাপ্ত ছিল না। ফলশ্রুতিতে খোলাফায়ে রাশেদার পর পরবর্তী সময়ে খেলাফত রাজতন্ত্রে (ملك غضوض) রূপান্তরিত হয়। এ রাষ্ট্রটি গোত্রিক গোঁড়ামি দমন ও লুটের কায়দায় রাজনীতি করার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কালক্রমে উম্মাহর সাথে যুক্ত হয়েছে গোত্রিক আন্দোলনের (الشعوبيات) দর্শন ও কুসংস্কার।

এ জন্যই রিসালত যুগের পরবর্তী সময়ের ব্যক্তিদের মধ্যে যে ঘাটতি ছিল তা হলো :

ইসলামী প্রাণশক্তি ও আত্মশুদ্ধির প্রেরণা, রিসালত বহন করার মাধ্যমে অবস্থা মোতাবেক এর থেকে উপকার লাভ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নতুনত্ব পরিবর্তন ও গবেষণা করা। তবে হ্যাঁ এ গবেষণার দাবিই হলো ইসলামের রিসালাতের হেদায়েত, ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গ্রহণ। এরই আলোকে উম্মাহ বিভিন্ন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে যুদ্ধে বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন বেদুঈন গোত্রের সন্তানদের পূর্ব থেকেই শিক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া হত। পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদার ঐ পদ্ধতি ধ্বংস করার কারণে ঐ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। তাই খোলাফায়ে

www.pathagar.com

রাশেদার পদ্ধতি ধ্বংসই ইসলামী আক্বিদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং মহাজগত সম্পর্কিত ইসলামী দর্শনের বিকৃতি ও পরিবর্তনের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

খোলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী যুগে বিভিন্ন জাতি ও গোত্র ইসলামে দীক্ষিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে শিক্ষিত করার চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়ে উঠে নি। উম্মাহ ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়টি এমনিতেই শেষ হয়ে যায়।

এদিকে রাষ্ট্রের পরিধি প্রশস্ত হতে থাকে। বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতি এমনভাবে প্রবেশ শুরু করল, যেন তা সমুদ্রের তরঙ্গমালা। বিভিন্ন গোত্র এবং বেদুঈনদের মধ্য হতে মুসলিম সন্তানেরা জিহাদী প্রেরণায়, সাহসকিতায় ও শক্তিতে উজ্জীবিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের পুনঃ পুনঃ আত্মগঠনমূলক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করার পর্যাপ্ত সুযোগ হয়ে উঠেনি, যেমনটি রাসূল ﷺ-ও খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম আমলে সৈনিকদের আত্মগঠনমূলক শিক্ষা দেওয়া হতো। এতে সৈনিকদের মেজাজ ও স্বভাবে পরিবর্তন আসত। পরবর্তীতে বিষয়টি নতুন নেতৃত্ব চর্চার অংশ হিসেবে ইসলামী সমাজ গঠনের মহৎ বিষয় হিসেবে সুনির্দিষ্ট হয়।

অধিকাংশ সময় বিভিন্ন কৃষ্টি-কালচার, গোত্রিক বিশ্বাস ও গোঁড়ামী জাহেলী বিশ্বাস থেকে গৃহীত হয়। এতে খোলাফায়ে রাশেদাসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সকল নেতৃত্বশীল সাহাবীদের নেতৃত্বের চিহ্নসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায়। নেতৃত্বশীল সাহাবী যথা :

* হজরত হোসাইন ইবনু আলী (رضي الله عنه)
* হজরত হাসান ইবনু আলী (رضي الله عنه)
* হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (رضي الله عنه) প্রমুখ।
* হজরত মুসয়াব ইবনু যুবাইর (رضي الله عنه)।

মাসয়িক ও রাজনৈতিক নিয়ম পরিবর্তনের কারণে নেতৃত্বের বিষয়টি বনু উমাইয়্যা রাজা-বাদশাহদের জন্য স্থায়ী হয়ে যায়। তবে, এটা ধারণা করা কখনো ঠিক হবে না, হজরত উসমান ইবনু আফফান (رضي الله عنه) এবং আলী ইবনু আবী তালিব (رضي الله عنه) ভুল করেছেন। কারণ, তারা হজরত মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) আমলের রাজতন্ত্রের মত নিয়ম-পদ্ধতি মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন নি। ভুলের নেসবত যদি খোলাফায়ে রাশেদার দিকে কেউ করতে চায়, তাহলে এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, হজরত শাসকবর্গ রাজতন্ত্র চালু করে তারা আরো দ্বিগুণ ভুল করেছেন। মূলত খোলাফায়ে রাশেদার দিকে ভুলের নেসবত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ, খোলাফায়ে রাশেদার খেলাফত পদ্ধতি ধ্বংসের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে একটি প্রথম দৃষ্টান্ত। ঐ খেলাফত পদ্ধতি ধ্বংসের বিষয়টি

www.pathagar.com

ইসলামী আক্বিদা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিরাট প্রভাব ফেলেছে। এটা ইসলামী প্রাণশক্তি ও দর্শনে আঘাত হেনেছে। ইসলামী মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এতে আত্মগঠন, অভ্যাস, চর্চা ও গোত্রিক সীমাবদ্ধতার দিককে চরমভাবে নষ্ট করেছে। কারণ, যে সময় মুসলমানগণ বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজয় লাভ করল, একাধিক বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি প্রশস্ত হলো, প্রজাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, ঠিক সেই সময়ে এর ফলে ইসলামী প্রাণশক্তি ও আত্মশুদ্ধির প্রেরণার মূলে দুর্বলতার সূত্রপাত হয়।

রাজনীতি, চরিত্র, ধর্ম : নেতৃত্বের প্রকারভেদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মতবাদের উৎপত্তি

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ ﷺ এর মুয়াল্লিম (শিক্ষক) ছিলেন স্বয়ং বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ তায়ালা। অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বনবী ﷺ-কে একত্ববাদসহ সব কিছুর পথ নির্দেশ করেন। তাইতো আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ্ উন্নত দর্শন, প্রাণশক্তি ও উন্নত সভ্যতার প্রেরণার শক্তিতে উজ্জীবিত।

যখন খোলাফায়ে রাশেদার পতন হলো এবং গোত্রিক নেতৃত্বশীল প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব বিস্তার লাভ করলো, তখন রিসালত-বিশ্বাসীদের নেতৃত্বের কার্যক্রম দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়লো। পর্যায়ক্রমে একশত বছর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর নেতৃত্বের বিষয়টি সমাপ্তির পর্যায় পৌছে। উমাইয়্যা যুগে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম এক কেন্দ্রিক হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তাদের কার্যক্রম ও মতবাদ মসজিদ ও মাদ্‌রাসা কেন্দ্রিক সীমিত হয়ে যায়। যে সময় গোত্রিক দ্বন্দ্ব, গোঁড়ামি ও স্বৈরাচার, ফিতনা-ফাসাদ এবং বিপর্যয়ের মাত্রা চরমে পৌছল- ঠিক তখন তারা নিজেদেরকে তাহারাত (পবিত্রতা) ও যুহুদ (বৈরাগ্যতা) এর নামে নেতৃত্ব ছেড়ে দুনিয়া বিমুখ হয়ে পবিত্র জীবন যাপনের চেষ্টা চালায়।

এদিকে রিসালত বিশ্বাসী ওলামারা নেতৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবে সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা খর্ব হয়। ফলে তাদের চিন্তা-চেতনা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তখন তাদের গবেষণা করার যোগ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান মতামত প্রকাশের (مدرسة الرأي) প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়। অতঃপর মতামত প্রকাশের প্রতিষ্ঠান গদবাঁধা প্রতিষ্ঠানে (مدارس النص) রূপান্তরিত হয়। এবং সর্বশেষে গতবাঁধা প্রতিষ্ঠান জড়তা ও তথাকথিত তাকলিদ বা নকল করার প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে (مدارس الجمود والتقليد)।

www.pathagar.com

মূল রাজনীতি ও নেতৃত্ব থেকে ওলামায়ে কেরামের সরে আসার কারণে একদল বিকল্প ধারার দার্শনিকে উদ্ভব ঘটে। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা সঠিক পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির ছিল না। এতে উম্মাহর বৈশিষ্ট্য, সভ্যতা, আক্বিদা ও বিশ্বাসগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনের উপাদান বিদ্যমান ছিল না। ফলে সাধারণ মুসলমানেরা দর্শন, কল্যাণ শাস্ত্র, সুফিবাদ, গ্রিক সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনে মগ্ন হয়ে পড়ে। এ দর্শন-তত্ত্বে বিভ্রান্তি, গোমরাহি, কুসংস্কার, বাহ্যিক কুতর্ক ও যুক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। একই সময়ে ওলামায়ে কেরাম রিসালতের ঐতিহ্যে শরয়ী ফিকহের জ্ঞান ও আদি বিদ্যা শেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে শরয়ী ওলামায়ে কেরাম মূল রাজনীতি থেকে সরে আসে। ফলে উম্মাহ অধঃপতন, স্বৈরাচার, জড়তা বা বদ্ধমূল ধারণায় নিমজ্জিত হয়। আর সাধারণ জনগণ কুসংস্কারমূলক সুফিবাদকে গ্রহণ করে নেয়। এতে উম্মাহর সভ্যতার প্রেরণা শক্তির যা আছে প্রায় সবটাই সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর নিয়ন্ত্রণকারী নির্বাচিত রাজনৈতিক শক্তি ও উম্মাহর স্বৈরাচার নেতৃত্বের ফলে বস্তুবাদী সন্ত্রাস গভীরে অবস্থান করে। এতে উম্মাহর সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার শক্তি খর্ব হয়ে যায়।

শরিয়তের আলেম ব্যক্তিদের ইসলামী শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়া এবং বাস্তবমুখী চর্চার দুর্বলতার কারণে তাদের কর্মকাণ্ড 'সেলফ প্রফেশন সার্ভিস (حرفية هامشية) ইনস্টিটিউট' এর সাথে তুলনা করা যায়। সাধারণতঃ ব্যক্তিগত জীবন চালানো ব্যতীত, সামাজিকভাবে কোন ভূমিকাই তাদের থাকে না। আর ফতোয়া, কাজিগিরি ও মসজিদের ইমামতির দায়িত্বই তখন তাদের পালন করতে হয়। তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না।

উম্মাহর বিভক্তির প্রভাব, প্রাতিষ্ঠানিক ধ্বংস এবং সামাজিক চিন্তার অনুপস্থিতি

উম্মাহর প্রাতিষ্ঠানিক ধ্বংস যখন চরম পর্যায়ে পৌছে এবং ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পায়, ঠিক তখন একজন মুসলিম ব্যক্তিগত, মানসিক, বস্তুগতভাবে রাজনৈতিক স্বৈরাচারী সন্ত্রাস, দীনি ভয়-ভীতির মুখোমুখি হতে থাকে তখন উম্মাহর মনমানসিকতা থেকে স্থায়িত্ব, আবাদ ও সভ্যতার প্রেরণা দূর হতে থাকে।

এর সাথে যুক্ত করে বলা যায় যে, তখন উম্মাহর মূল চিন্তাশীল চালিকাশক্তি বাস্তব কার্যকরী ও বিজ্ঞানভিত্তিক কায়দায় জেগে উঠে না, যে পন্থায় উম্মাহর সংস্কার ও পরিবর্তনের সফল পথ পাওয়া যাবে। এ সকল পথ প্রাপ্তির জন্য কেবল উম্মাহকে সমাজের অভ্যন্তরে পৌছতে হবে। এজন্য মৌলিকভাবে উম্মাহর চিন্তার উৎস ও অনুভূতি জাগ্রত করার মাধ্যমে শুরু করতে হবে। আর তা হলো ঃ উম্মাহকে শিক্ষিত করে তোলা, পুনঃপুন শিক্ষা দান করা। যখন তারা সংস্কারের পথকে যুদ্ধও সংঘর্ষের পথ ধারণা করে নিল, তখনই তারা সঠিক পথ হারাল। এতে উম্মাহর স্থায়িত্বের ভীত নড়ে উঠল,

www.pathagar.com

সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হলো, যুলুম-নির্যাতন, দমন, স্বৈরাচার ও অনৈক্য বৃদ্ধি পেল। এটা উম্মাহর ইতিহাস চলার গতিকে বিপরীত দিকে ঠেলে দিল। তাতে উম্মাহর দুর্বলতা, অক্ষমতা, নির্জীবতা, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা, হীনতা ও লাঞ্ছনার চিত্রফুটে উঠল।

হ্যাঁ এতদসত্ত্বেও আমাদেরকে আমাদের সচেতনতা থেকে দূরে থাকলে চলবে না। কারণ, উম্মাহর ইতিহাসের সকল মুহূর্ত ও সকল দেশের অবস্থা সমান নয়। এক শহর বা দেশ ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখোমুখী হলেও একই সময়ে অন্য শহর বা দেশ ভাল অবস্থানে থাকতে পারে। যে সময়ে আরবদের প্রাণশক্তির অগ্নিশিখা নির্বাপিত হয়ে গেল এবং স্পেনে মুসলমানদের নাম নিশানা বিলীন হয়ে গেল, ঠিক সে সময়ে তুর্কী বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের শক্তি ও প্রভাব নতুনভাবে দেখা গেল। তারা দৃঢ়তার সাথে ইসলামে প্রবেশ করল। যুদ্ধমুখর দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করল। সে সময় উসমানী রাষ্ট্রের মুকুল প্রকাশিত হল।

যখন উম্মাহর সৃজনশীলতা ও চিন্তাশক্তি তাদের মাঝে প্রত্যাবর্তন করে এবং সভ্যতার প্রাণশক্তি ফিরে আসে, তাতে আবার স্ববিরোধিতা কীসের? এমন কি উম্মাহর অধঃপতন বিচ্ছিন্নতা ও চরম সংঘর্ষের যুগেও তা সম্ভব। বরং কখনও কখনও এজন্য উম্মাহর বিধান সম্মত চিন্তাশীল, ব্যতিক্রমধর্মী, সংস্কারবাদী প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আগমন ঘটে থাকে। যেমন : ইমাম গাজালী ইবনে হাযম, ইবনে রুশদ, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনে খালদুন, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ধর্ম, বিজ্ঞান, শরিয়া, দর্শন, বিজ্ঞান বিশেষতঃ পদার্থবিজ্ঞানে অবদান রেখেছেন। তারা উম্মাহর বিভিন্ন দূরাবস্থা ও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে উম্মাহর মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কারের প্রেরণা উজ্জীবিত করেছেন। আজও তা উম্মাহর প্রাণশক্তি ও আত্মগঠনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু এটাও উম্মাহর ইতিহাসে ও সভ্যতার প্রেরণার পথে বড় ধরনের পরিবর্তন সাধন করতে পারে নি। কারণ, উম্মাহ প্রাণশক্তি ও আত্মগঠনের শক্তি হারিয়েছে। উম্মাহর শক্তি প্রশমিত হয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার মহা জগত সম্পর্কিত দর্শনের স্বচ্ছতা কলুষিত হয়েছে। এতে উম্মাহর অস্তিত্বে স্বৈরাচার ও ফাসাদ বিপর্যয় অনুপ্রবেশ করে। তাদের ইজ্জত সম্মান প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের মাঝে চরম ভয়ভীতি কাজ করে। তারা কেবল পৃথিবীতে এক লোকমা খেয়ে সুস্থ জীবন-যাপন করতে চায়।

এ মুহূর্তে অবশ্যই উম্মাহকে অদৃশ্য ও গোপন হওয়া থেকে জেগে উঠতে হবে। দোষ-ত্রুটি মুক্ত হয়ে তাদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে। যুগ যুগ ধরে ইসলামের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ প্রাণশক্তিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

যখন উম্মাহর সম্মুখে বিরোধী শত্রুবাহিনী, সভ্যতার প্রেরণা শক্তিসম্পন্ন, এবং সৃজনশীল আত্মিক শক্তি, বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি ও বস্তুগত যোগ্যতাসম্পন্ন জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটল,

www.pathagar.com

সে সময় উম্মাহ তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ, যুদ্ধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েও দুর্বলতা, চিন্তার অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতার কারণে চরমভাবে পরাজিত হয়। এমনিভাবে তারা শত্রুদের দুর্বল ও সহজ শিকারে পরিণত হয়।

এ সুযোগ লুফে নিয়ে এক শ্রেণীর ঔপনিবেশিক যুদ্ধবাজ জাতির শাসকগোষ্ঠী উম্মাহর উপর বিভিন্নভাবে লাঞ্ছনা, অসম্মান ও যুলুম নির্যাতনের স্টিমরুলার চালিয়ে দেয়। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত এ অবস্থা থেকে রক্ষাকারী আর কেউ নেই। অবশ্য উম্মাহর চিন্তাশীল এবং সংস্কারবাদী মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকজন ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করেন। এমনকি আল্লাহর মেহেরবাণীতে উম্মাহর দুর্বলতা, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও পশ্চাতপদতা চিরতরে দূরীভূত হয়ে যেন উম্মাহর চিন্তার সুস্থতাসহ, শক্তি, সাহসিকতা ও কর্মচাঞ্চল্যতা ফিরে আসে এজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখেন

Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT)

Proudly announces the following latest publications of IIIT, USA

*	Shaikh Muhammad Al Ghazali- A Thematic commentary of the Qur'an (Vol-2)	450/-
*	Kutaiba S. Chaleby- Forensic Psychiatry in Islamic Jurisprudence	500/-
*	M. Umer Chapra- Islam And The Economic Challenge	800/-
*	Tahir Amin- National & Internationalism in Liberalism, Marxism & Islam	250/-
*	Dr. Taha Jabir Al-Alwani- Missing Dimensions in Contemporary Islamic Movements	150/-
*	Aisha B. Lemu- Laxity, Moderation & Extremism in Islam	150/-
*	Abdelwahab M. Almessiri- Feminism vs Women's Liberation Movements	150/-
*	Akbar S. Ahmed- Toward Islamic Anthropology	200/-
*	Ismail Raji Al-Faruqi- Islam & Other Faiths	1,000/-
*	Abdul Hamid A. AbuSulayman- Crisis in the Muslim Mind	400/-
*	Zahra Al Zeera- Wholeness & Holiness in Education	550/-
*	Malik Badri- Contemplation : An Islamic Psycho-spiritual Study	250/-

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

উম্মাহর মানসিক রোগ নির্ণয়

উম্মাহর মাঝে কীভাবে ইসলামী সভ্যতার প্রাণশক্তির প্রেরণাকে ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে পূর্বে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে উম্মাহর চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও মানসিকতায় কীভাবে পরিবর্তন আনা যায়, সে বিষয়ে বর্ণনাসহ উম্মাহর লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংস্কার প্রচেষ্টায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির দিক বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এতে আশা করা যায়, গবেষণা কার্যক্রম একটা পূর্ণাঙ্গ সমাধানে পৌঁছতে পারবে। ফলে উম্মাহর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ চারিত্রিক মূল্যবোধ ও আত্মগঠনের প্রেরণা জাগ্রত হবে ইনশাআল্লাহ্।

উম্মাহর চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিতে বিভ্রান্তি

মুসলিম উম্মাহর আজ অধঃপতনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো ঃ উম্মাহর চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতি কুসংস্কার ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। এসব কুসংস্কার ও বিভ্রান্তিগুলো উম্মাহর মনোবৃত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে, উম্মাহর সুস্থ চিন্তা ফিরিয়ে আনা বাধাগ্রস্ত করেছে এবং উম্মাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

এখন প্রশ্ন হলো ঃ উম্মাহর চিন্তা-চেতনা ও সাংস্কৃতিক কুসংস্কার ও বিভ্রান্তিসমূহের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ?

জবাব হলো ঃ এ ধরনের ছয় প্রকারের বিভ্রান্তি রয়েছে, যা উম্মাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চরম বাধা। নিম্নে সবিস্তারে তা আলোকপাত করা হলো।

প্রথম বিভ্রান্তি : পূর্ণাঙ্গ দর্শন বিভ্রান্তি

উম্মাহর চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিতে মহাজগত সম্পর্কিত ইসলামী দর্শনই হলো সবচেয়ে অধিক বিপদজনক ও প্রথম বিভ্রান্তি। কারণ, মুসলমানদের ঈমান, আক্বিদা-বিশ্বাস, রীতি-নীতি, চাল-চলন ও চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত ও দলিল প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মহাজগত সম্পর্কিত ইতিবাচক পূর্ণাঙ্গ একত্ববাদ দর্শন এখানে অনুপস্থিত।

আল-কুরআনের আলোচনায় মহাজগত সম্পর্কিত দর্শন পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্টরূপে ইতিবাচকভাবে মানব স্বভাব সম্পর্কিত বিষয় স্থান পেয়েছে। আল-কুরআনের দর্শন হলো, মানুষ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, যিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, ন্যায় বিচারক ও অতুলনীয়। কোন কিছুর সাথে যাঁর তুলনা করা যায় না। মানুষ আরো বিশ্বাস রাখবে যে, তারা আল্লাহর প্রিয় ও শ্রেষ্ঠতম মাখলুক। কল্যাণ,

www.pathagar.com

সংস্কার ও আবাদের লক্ষ্যে মানুষ পারস্পরিক ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, একে অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ ও পরামর্শের ভিত্তিতে পৃথিবীর জীবন পরিচালনা করবে। মানুষ মানুষের উপকার করবে। পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজন মেটাবে। একজন অপরজনকে ইজ্জত-সম্মান করবে। মানুষ পরকালীন জীবনকে সুন্দর করার জন্য এখলাস ও নিষ্ঠার সাথে তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গড়ার চেষ্টা করবে। যদি দুনিয়ার জীবন ভাল ও সুন্দর হয় তাহলে চিরস্থায়ী আবাসস্থল আখেরাতের জীবনও ভাল ও সুন্দর হবে। আর দুনিয়ার জীবন মন্দ ও অসুন্দর হলে, আখেরাতের জীবনও এর ব্যতিক্রম হবে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى - وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى - ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى - وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾

"আর মানুষের জন্য তাই থাকবে যা সে চেষ্টা করে, আর নিঃসন্দেহে তার প্রচেষ্টার ফলাফল অতিসত্বর দেখা যাবে। অতঃপর তাকে চেষ্টা অনুযায়ী পূরো প্রতিদান দেয়া হবে। আর আপনার রবের নিকটেই তাকে যেতে হবে।"

(সূরা নজম (৫৩/৩৯-৪২ আয়াত)

সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী মহাজগত সম্পর্কিত দর্শন তিনটি মৌলিক বিষয়ের সার সংক্ষেপ। যথা ঃ

১. গায়েব বা অদৃশ্য : মুসলিম গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। বিশ্বাস করবে, আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তাঁর কোন শরিক নেই।

২. দুনিয়ার জীবন : দুনিয়ার জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য পারস্পরিক ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং মানব কল্যাণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দায়িত্বানুভূতি সহকারে আবাদ ও সংস্কারের জন্য চেষ্টা করবে।

৩. আখেরাত বা পরকালীন জীবন : দুনিয়ার জীবনের শেষে মানুষের জন্য এক অনন্ত কাল জীবন রয়েছে। এ অনন্তকাল জীবনের জন্য মানুষ পূর্ণ ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে আমল করবে। তাহলে সে পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়ে চির সুখের জান্নাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দে চিরস্থায়ী জীবন কাটাতে পারবে। অন্যথায় তার জীবনাকাশের ভাগ্য হবে খুবই মন্দ। চিরস্থায়ী দুঃখের স্থান জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা।

এজন্য আল-কুরআনে ঈমান ও আমলে সালেহ উভয়টির ব্যবহার একত্রে এসেছে। কোথায়ও ঈমানের আলোচনা করা হলে সাথে সাথে আমলে ছালেহকেও তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সুতরাং ঈমানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হলো 'আমলে ছালেহ'। আর 'আমলে ছালেহ' হলো: মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে সকল আমলের বাস্তবায়ন। মূলত ঈমান ও আমলে ছালেহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এমনকি আমল যদি সামান্যও হয় তার প্রতিদান পরকালীন জীবনে পাওয়া যাবে। আর আমলে ছালেহের জন্য চেষ্টা করলেও তারও প্রতিদান পাওয়া যাবে। কারণ, এর স্থায়িত্ব রয়েছে। এজন্য আল্লাহর ওয়াদা বান্দাহদের জন্য ঈমান আনার শর্তে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হয়। কারণ, ঈমান বান্দাহকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। অন্তরসমূহকে দৃঢ় ও মজবুত করে এবং বান্দাহদেরকে দীনের উপর অটল-অবিচল রাখে। আর ঈমানের সাথে যুক্ত হয় আমল এবং আমলের বাস্তবায়ন। আবার আমলে ছালেহের সাথে যুক্ত হয় বান্দাহর ঈমানের দৃঢ়তা ও মজবুতি এবং দয়া ও ইহসানের প্রাণশক্তি। বান্দাহ এখলাস ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সৃষ্টি ও বিধান জানার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করে। এতে আমল মজবুত ও সালেহ হিসেবে বিবেচিত হয়।

শুধুমাত্র নিয়ত করার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। আমলের নিয়ত করলে তার সাওয়াব পাওয়া যাবে ঠিকই, তবে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করা কল্যাণমূলক কাজ করা এসব কিছুই ইহসান, আমলের দৃঢ়তা এবং আমলের চেষ্টার সাথে শর্তযুক্ত। আর আমলের মজবুতি ও দৃঢ়তা থাকলে আল্লাহর বিধান বুঝা সহজ হয় এবং আমলের বাস্তবায়নসহ সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছা যায়।

আল্লাহ বলেন :

﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল (عمل صالح) করেছে। তিনি তাদেরকে অবশ্যই প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন যেমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিক তাদের দীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (সূরা নূর : ২৪/৫৫)

এটাই স্রষ্টার একত্মবাদের ব্যাপার মহাজগত সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ দর্শন।

www.pathagar.com

অনেক প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাশীল রয়েছেন, যারা চিন্তা ও গবেষণা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকেন। তারা সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকেন। এসব চিন্তাশীলরা কিছু কাজ ভাল নিয়তে করেন অথচ এগুলো ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তিমূলক। দীর্ঘকাল ধরে এসব বিভ্রান্তি ইসলামের প্রাণশক্তি ও আত্মগঠনমূলক প্রেরণা শক্তি ধ্বংস করছে।

এ বিভ্রান্তিগুলো উম্মাহর অস্তিত্বকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করেছে। এগুলো উম্মাহর সৃজনশীল শক্তিকে প্রশমিত করছে এতে উম্মাহর চিন্তা ও গবেষণা করার ইচ্ছা শক্তি হারিয়েছে। আর উম্মাহ তাকলিদ বা অনুকরণ ও অনুসরণের পথ বেছে নিয়েছে। এতে উম্মাহর চরম ক্ষতি সাধিত হয়েছে। উম্মাহর আদর্শিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে এবং উম্মাহর সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে। তাদের মাঝে পারস্পরিক অনৈক্য সৃষ্টি হচ্ছে।

কালাম ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে যেসব মূলনীতি সাধারণতঃ উপস্থাপন করা হয়, সেখানে মুসলিম ব্যক্তির শিক্ষা ও মনোবৃত্তি গঠনের মূলভিত্তি পাওয়া যায়। এসব মূলভিত্তি সামষ্টিক কোন দর্শন নয় বরং এগুলো একক দর্শন। আলেম-ওলামা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের কারণে এ দর্শনের উৎপত্তি হয়। এ দর্শন ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণ জনগণ এবং তাদের রীতিনীতি, বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

এ দর্শন ও চিন্তাধারায় শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, গণসংযোগ, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, ন্যায়-ইনসাফ ও পারস্পরিক পরামর্শের কোন স্থান নেই। জীবন পরিচালনা ও সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা-ধারা এ দর্শনে অনুপস্থিত। এ দর্শনের মূল হলো : মসজিদে এতেকাফে নিয়োজিত থাকা, যিকির-আযকার, তাসবিহ-তাহলিল যাকে আল-কুরআনী দর্শন বলে আখ্যায়িত করা হয়। আবার মসজিদে যিকির ও দরস-তাদরিসের কাজ করা, যাকে ইলমে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় ইবাদত বলা হয়। আর মানুষের জীবন-কর্ম পরিচালনা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করণকে ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ মোয়ামেলাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ মোয়ামেলাত বলতে মুসলিম ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন প্রণালী, আচার-বিচার উদ্দেশ্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন উদ্দেশ্য নয়। মুসলিম ব্যক্তির জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে মোয়ামেলাত দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ফিকহী সমাধানকেও উদ্দেশ্য করা যায়।

এ ফিক্‌হী দর্শন কুরআনী দর্শনের বিপরীত। কুরআনী দর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধানমূলক দর্শন। এ দর্শনে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ সমাধান রয়েছে। এ দর্শনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে কোন পার্থক্য করে না। এ দর্শনে উম্মাহও প্রতিটি মানুষের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ দর্শনে মানুষের জীবনের সকল আমলই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী তার সকল কর্মই ইবাদত। এমন কি বৈধ উপায়ে

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রীর মিলন ও যৌন কর্মও ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। সুতরাং আল-কুরআনের দর্শন অনুযায়ী মানুষের গোটা জীবনটাই যিকির, জিহাদ, গোটা জীবনটাই ইবাদত।

তাই মুসলিম ব্যক্তির সালাত আদায়, দোয়া, সিয়াম সাধনা, যাকাত দেয়া, কুরআন তেলাওয়াত, হজ্ব পালন এবং হজ্বে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করার মাধ্যমে তার জীবন পরিচালিত করবে। একে আল-কুরআনের দর্শন অনুযায়ী ইবাদত ও যিকির বলা হয়। যা মুসলিম ব্যক্তির অন্তরকে সতেজ রাখে এবং কর্তব্য পালনে সহায়তা করে।

আল্লাহর বাণী :

﴿إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾

"নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমাকে স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর।" [সূরা ত্বহা : ২/১৪]

﴿فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾

"সুতরাং তোমরা 'মাশ্‌য়ারে হারামের" নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর যেমনিভাবে তিনি তোমাদেরকে পথ নির্দেশ করেছেন, যদিও তোমরা ইতোপূর্বে পথহারা ছিলে।"
(সূরা বাকারা : ২/১৯৮)

﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

"আর তোমরা সুনির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর স্মরণ করো। সুতরাং যে ব্যক্তি দু'দিন পূর্বে সম্পাদন করল তাতে কোন অপরাধ নেই, আর যে ব্যক্তি দু'দিন বিলম্ব করল তাতেও কোন অপরাধ নেই। এ বিধান তাঁর জন্য প্রযোজ্য, যিনি আল্লাহ ভীরু হয় (মুত্তাকী হয়)। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রেখো, তোমাদের সকলকে তাঁর নিকট উপস্থিত হতে হবে।" (সূরা বাক্বারা : ২/৩০৩)

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾

www.pathagar.com

"অবশ্যই সে ব্যক্তি সফলকাম হলো যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল এবং আল্লাহর স্মরণ (যিকির) করল ও সালাত আদায় করল।"

(সূরা আলা : ৮৭/১৪, ১৫)

﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ﴾

"যখন তোমরা নিরাপদে অবস্থান করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবে- যেমনিভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন।"

(সূরা বাক্বারা : ২/২৩৯)

﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাধা প্রদান করে। আর আল্লাহ্‌র যিকির (স্মরণই) সবচেয়ে মহৎ কর্ম।"

(সূরা আনকাবুত : ২৯/৪৫)

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ﴾

"আর তারা যখন কোন অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হয় কিংবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তাদের গোনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গোনাহ মাফ করবেন?" (সূরা আলে ইমরান : ৩/১৩৫)

আল-কুরআনে বর্ণিত দর্শন অনুযায়ী মুসলমানদের জীবনের সকল কাজ কর্ম ও প্রচেষ্টা সবই ইবাদত। এ সবগুলোই জিহাদ। মুসলিম ব্যক্তি ইলম অর্জনে, জীবিকা-উপার্জনে, আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করার ক্ষেত্রে, ন্যায়-ইনসাফ কায়েম ও দুর্বলদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে জিহাদ করে। অপর উম্মাহর প্রয়োজনের জন্য চেষ্টা করাসহ মুসলমানদের রাষ্ট্র রক্ষা করা এবং হক ও দীনের দাওয়াত পৌছানোর ক্ষেত্রে জিহাদ করে। বরং সকল কর্মে আল্লাহকে স্মরণ করাই মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহর আনুগত্য ও কল্যাণ অন্বেষণের ক্ষেত্রে মুসলিম জীবনকে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহ বলেন :

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦١) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي

www.pathagar.com

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

" [হে মুহাম্মদ ﷺ] বলুন, নিঃসন্দেহে আমার রব আমাকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন, যে পথ মিল্লাতে ইব্রাহীমের সহজ সরল ও খাঁটি দীনের পথ। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [হে মুহাম্মদ ﷺ] বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী (আমার ইবাদত) আমার জীবন, আমার মরণ এসবই বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোন শরিক নেই। এজন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আর সর্বপ্রথম নিজেকে মুসলিম (আতসমর্পণকারী ঘোষণা) দিচ্ছি। (সূরা আল-আন'আম : ৬/১৬১-১৬৩)

সুতরাং এ পর্যায়ে বলা যায়, আল-কুরআনে বর্ণিত মহাজগত সম্পর্কিত দর্শনই হলো বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ দর্শন। এর তুলনায় মানব রচিত দর্শন অনেক ক্ষেত্রেই অপূর্ণাঙ্গ। উম্মাহর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং মানসিকতা গঠনের ক্ষেত্রে এসব দর্শনে ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তি র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে আজ উম্মাহর এ অধঃপতন, অক্ষমতা ও পশ্চাদপদতা।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি : পদ্ধতিগত বিভ্রান্তি

আলেম সমাজ ও চিন্তাবিদগণের মাঝে সমাজ বিচ্ছিন্নতার কারণে পদ্ধতিগত বিভ্রান্তি প্রকাশ পায়। ইসলামীচিন্তা বিদগণের গবেষণা ছিল পুথিগত বিদ্যার অন্তর্গত। অথচ সামাজিক জীবনে চিন্তাধারার বাস্তব অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। বাস্তব অনুশীলনের বিচ্ছিন্নতা সঙ্কটের সৃষ্টি করে। জ্ঞানকে শুধু প্রচার-প্রকাশ ও অনুকরণ-অনুসরণের কার্যক্রমে পরিণত করে। সেখানে সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগতের প্রকৃতির নিয়ম জানা এবং সময় ও কালের উপাদানের কার্যকরী প্রভাব অনুপস্থিত থাকে।

এক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বিভ্রান্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সেটা হলো পারস্পরিক অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার দিক। যেখানে গ্রিক যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের অধিবিদ্যা যুক্ত রয়েছে। এ দুটো বিষয় উম্মাহর চিন্তাধারার আবহাওয়ায় প্রভাব রাখার কারণে উম্মাহর গবেষণাধর্মী কর্মকাণ্ড বাস্তবতা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই এখন বাস্তবসম্মত চিন্তাধারা, পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করতে হবে। উম্মাহর চিন্তা-চেতনায় গভীরতা আনাসহ তুলনামূলক জ্ঞান-অর্জনের লক্ষ্যে পৃথিবীর দিক দিগন্তে সফর করতে হবে।

www.pathagar.com

উম্মাহর আলেম সমাজের চিন্তা ও গবেষণামূলক গভীরতা না থাকায় তাঁরা সকল ক্ষেত্রে তাকলিদ বা অনুকরণ-অনুসরণের পথ বেছে নিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে শুধু কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অন্বেষণকে পবিত্র জিনিস মনে করে তা ব্যাপক ও গভীরভাবে করে যাচ্ছেন। এতে তাদের চিন্তা ও গবেষণা করার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি দুর্বল হয়ে পড়ে। ওহির জ্ঞান ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত লাভের জন্য মানবিক জ্ঞান সমন্বয়ের উপকরণ প্রয়োজন হয়। সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক জ্ঞান সমন্বয়ের কোন বিকল্প নেই। পদ্ধতিগত জ্ঞানের বিভ্রান্তির কারণে ইসলামী আক্বিদা-বিশ্বাসের মধ্যে সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো অনুপস্থিত থাকে। অন্যদিকে ফিক্‌হ ও উসুলে ফিক্‌হশাস্ত্র শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে অনুশীলন করার মধ্যে সীমিত হয়ে থাকে। অবশ্য মালেকী মাজহাবের শ্রেষ্ঠ আলেমদের কারো কারো জন্য ইলমে ফিক্‌হ ব্যক্তিগত জীবনে অনুশীলনীসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও তা চর্চা করার সুযোগ হয়। অভিনব পদ্ধতিতে ইসলামী চিন্তা-ধারার সম্মুখে সামাজিক মানবিক জ্ঞানের দ্বার উম্মুক্ত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার কারণে এ অভিনব চিন্তাধারাও এক পর্যায়ে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। আর এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা প্রকল্প এক সময় অকেজো হয়ে পড়ে। ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম দার্শনিক ইবনু খালদুনের তাত্ত্বিক গবেষণাধর্মী লেখনী ও দর্শন তত্ত্ব থাকার পরও উম্মাহ তা থেকে যথাযথভাবে গ্রহণ করছে না। বরং পাশ্চাত্য জাতি এসব লেখনী ও দর্শন-তত্ত্ব থেকে বাস্তব জীবনে গ্রহণ করছে। তারা সুনিপুণভাবে দায়িত্ব পালনসহ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হচ্ছে। তারা আত্মগঠন ও সৃজনশীল শক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে সজ্জিত করতে পারছে।

পূর্ণাঙ্গ নেতিবাচক দর্শন পদ্ধতিগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে। সেখানে সুস্থ চিন্তার বিলুপ্তিসহ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে সেখানে সভ্যতা ও ধর্মীয় জ্ঞান-দানের ক্ষেত্রে বিকৃতি ও পরিবর্তন দেখা যায়। এতে উম্মাহ সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়। মূলত সামাজিক বিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যেখানে ইসলামী সমাজ জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে হেদায়েত ও ওহির জ্ঞান পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকে। পাশাপাশি জীবন যাপনে নতুনত্ব আনয়ন, জ্ঞানার্জন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার দিক নির্দেশনা এ বিজ্ঞানে পাওয়া যায়।

এ পর্যায়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান পদ্ধতি এবং জ্ঞান অন্বেষণকারীদের দর্শনে পদ্ধতিগত বিভ্রান্তির কিছু নমুনা স্পষ্ট করে দিতে চাই।

www.pathagar.com

কোন এক ইসলামী রাষ্ট্রের সম্মানিত মুফতী সাহেব জুময়ার দিন তাহারাত (পবিত্রতা) বিষয়ক একটি খুতবা দিয়েছিলেন। খুতবায় তিনি তাহারাতের অর্থ ও এর বিভিন্ন বিধানের বর্ণনা দিয়েছেন। সালাত শেষে মসজিদ অফিসে গিয়ে 'আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তাকে সালাম দিয়ে আদবের সাথে তাঁর নিকট বসলাম। তারপর খতিব সাহেবের খুতবার ব্যাপারে কিছু কথা বললাম। আমি আপনার প্রাঞ্জল খুতবায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তবে ঐ ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে। তাহারাত বিষয়টির আলোচনা আরো পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবমুখী হওয়া প্রয়োজন ছিল। যেমন : নাকের শ্লেষ্মা কখনো কখনো পাকস্থলীর রোগে আক্রমণ করে। সুতরাং শরীর পবিত্র রাখার সাথে সাথে কাপড়ের মধ্যে এসব নাকের শ্লেষ্মা লেগে থাকলে তা সাথে সাথে পরিষ্কার করা দরকার। আমরা লোকজনকে এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে দেখি না।'

আমাদের মাঝে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে ইলমী সংলাপটি সংগঠিত হয়েছিল। এটা প্রমাণ করে পারস্পরিক অনৈক্য দূরীকরণ, জ্ঞান-দান পদ্ধতি সংশোধন, আমাদের জীবনের সমস্যা ও সংস্কৃতি বুঝা এবং জ্ঞানের পরিধির ব্যাপকতা ও মত বিনিময়ের জন্য এ ধরনের সংলাপের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন থাকা এবং সাবধানতা অবলম্বন করা পবিত্রতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর সুমহান আদর্শ থেকে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। তিনি মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে কোন অপরিচ্ছন্নতা দেখলে তা পরিষ্কার করার জন্য নির্দেশ দিতেন। এমন কি বাড়ির আঙ্গিনায় যদি কোন ময়লা আবর্জনা ও কোনরূপ অপরিচ্ছন্নতা দেখতেন সাথে সাথে পরিষ্কার করার জন্য নির্দেশ দিতেন। যাতে তারা ইয়াহুদীদের মত না হয়ে যান। ইয়াহুদীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তেমন কোন গুরুত্ব দিত না। আজ এ উম্মাহর একটা বিরাট অংশ ইয়াহুদীদের মতই সামাজিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর যুগেও ইয়াহুদীদের অপরিচ্ছন্নতা বিষয়টি লক্ষ্য করা যেত।

হাদীসে এসেছে, সালেহ ইবনু আবু হাসসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে ভালবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন। তিনি দানশীল, দান করাকে পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের বাড়ীর আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো এবং ইয়াহুদীয়ের মত হয়ে যেয়ো না।' রাবী সালেহ বলেন, আমি হাদিসটি মুহাজির ইবনে মিছমার (রহঃ) এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন : আমার নিকট আমের ইবনু সাদ ইবনু আবু আক্কাস (রাঃ) তার পিতা সাদ, ইবনু আবু আক্কাস (রাঃ) অনুরূপ বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছেন। অবশ্য এ বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ) তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার রাখো (তিরমিযী-২৭২৩)। পদ্ধতিগত বিভ্রান্তির কারণে কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান অপূর্ণাঙ্গ পেশামূলক কাজে পরিণত হয়েছে। অন্ধ যা তাকলিদ বা অনুকরণ অনুসরণের জন্ম দেয়। এতে আক্বিদা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সেখানে ইলমুত তাওহীদকে শুধু ইলমুল আক্বিদা কিংবা ইল্মুল কালাম বলা হয়। আবার একে 'লাহুতী (ঐশ্বরিক) তর্ক শাস্ত্রও বলা হয়। ইলমুল ফিক্হ ইলমুল আক্বিদা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তারিত অনুশীলন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে থাকে।

উম্মাহর অক্ষমতা, জড়বদ্ধতা ও অন্ধ তাকলিদের যুগে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জনের মতই ইমামদের বক্তব্য গ্রহণকে পবিত্র জিনিস মনে করা হয়। এমনকি আমরা বিস্মিত হয়ে যাই, যখন ইমামদের কথিত ও কল্পিত গুণাবলী বর্ণনা করা হয়। কেউ কেউ দশ হাজারের অধিক বর্ণনার গর্ব প্রকাশ করেন। এসব বর্ণনাকে 'জাল হাদিস' বলা হয়। আর 'জাল হাদিস' পাঠকের উপর বিরাট ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

তবে এক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হলো : হাদিসের ছাত্ররা কোনটা সহিহ রেওয়ায়েত এটা জানার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করবে। জাল ও মিথ্যা বর্ণনা থেকে সুন্নাহকে হেফাজত করবে। আর উম্মাহর চিন্তা-চেতনায় জাল ও মিথ্যা বর্ণনার প্রভাব প্রবেশ করানো চরম গাফিলতির শামিল। এসব চিন্তা-চেতনা কখনো যেন শিশুর মাথায় না ঢুকে এজন্য উম্মাহকে সদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শিশুর বাল্যকাল থেকে সহিহ বর্ণনা ও সুস্থ অনুভূতি শিশুর মন ও মগজে ঢুকাতে হবে। বলা বাহুল্য যে, শিশুকাল থেকেই শিশুদের আত্মগঠন, আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি হয়। বাল্যকালই হলো শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা ও সচেতন করে গড়ে তোলার উত্তম স্তর। যেমনটি যাকাতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যাকাত পারস্পরিক দয়া ও ইহসান, আত্মত্যাগ এবং নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া শেখায়। অসহায়, দরিদ্র ও অভাবীদের কষ্টের অনুভূতি শেখানো যাকাতের মূল শিক্ষা। যাকাতের শিক্ষার মতই শিশুর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

তৃতীয় বিভ্রান্তি : বুঝ ও উপলব্ধির বিভ্রান্তি

সব বিভ্রান্তির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তি হলো : মানুষের বুঝ ও উপলব্ধির বিভ্রান্তি। আলেম সমাজের পারস্পরিক চিন্তার অনৈক্য ও মানসগত বিচ্ছিন্নতার কারণে বুঝ ও উপলব্ধির বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাদের চিন্তাগত অক্ষমতা, জড়বদ্ধতা ও গোঁড়ামির কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি প্রকাশ পায়। এতে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংশোধন ও

www.pathagar.com

বিচার বিশ্লেষণ করার প্রাণশক্তি নির্বাপিত হয়ে যায়। অধিকাংশ সময় ইসলাম বিষয়ক মৌলিক বুঝ ও উপলব্ধির বিভ্রান্তি সম্প্রসারিত হয়। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সহজ-সরল ও সাদা-মাঠা বিষয়ে পরিণত হয়। তখন বিবেক-বুদ্ধি ও মন মানসিকতা বিভ্রান্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। মনে বিভ্রান্তি গ্রহণের আত্মসমর্পণের ভাব তৈরি হয়। সে সময় উম্মাহকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইবাদত 'অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইবাদত (عبادة) অর্থ বুঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ এ 'ইবাদত' অর্থ বুঝা নিয়ে বড় ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে। যথাযথ চিন্তা-গবেষণা, অনুসন্ধান ও সমালোচনামূলক বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত থাকায় এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

মুসলিম আল্লাহর সম্মানিত খলিফা। আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামি করার মধ্যেই মুমিন ব্যক্তির ইজ্জত-সম্মান নিহিত রয়েছে। মুসলমানগণ আল্লাহর একনিষ্ঠ খাঁটি আব্‌দ বা বান্দাহ। আল্লাহ আল-কুরআনে গোটা মানব জাতিকে ইবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

'ইবাদ' (عباد) শব্দটি আরবি عَبْدٌ (আবদুন) শব্দের বহুবচন। এটা তা'বীদ (تَعْبِيد) (দাসত্ব করা) থেকে এসেছে। তবে এটা 'ইস্‌তেবাদ (استعباد) (দাস বানানো) অর্থ থেকে সংগৃহীত হয় নি।

আর عَبْدٌ (আব্দুন) শব্দের আরেকটি বহুবচন রয়েছে। তা হলো عَبِيْد (আবীদ)। কুরআনুল কারীমের পাঁচটি স্থানে একই ছিগায় (ভাষায়) এসেছে তা হলো :

(وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (ق:٢٩)

"আমি বান্দাহদের প্রতি সামান্যতম যুলুমও করি না।"

(সূরা কাফ : ২৯)

এ আয়াতের আলোকে বুঝা যায়, আল্লাহ নয় বরং বান্দাহ নিজেই নিজের প্রতি যুলুম করে। কারণ, যখন বান্দাহ আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্টিকে শরিক করে এমতাবস্থায় নিজের নফসের প্রতি যুলুম করে এবং নফসকে নিজের গোলাম বানায়। সুতরাং আল্লাহর বান্দাহ আল্লাহর গোলামি করার জন্য নফসকে প্রস্তুত করবে। বান্দাহ হক ও হেদায়েত থেকে বিরত থাকলে, তার নফসের প্রতি যুলুম করা হয়, নফসের গোলামি বা দাসত্ব করা হয়। সুতরাং মানুষ কেবল আল্লাহর গোলামি করবে। মানুষকে মানুষের দাস বা গোলাম বানাবে না। কারণ, আল্লাহই মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তাঁরই গোলামি করতে হবে। তাগুত ও নফসের গোলামি করা যাবে না। বরং তাগুতি শক্তি ও নফসকে দাসে পরিণত করতে

www.pathagar.com

হবে। নফসকে দাসে পরিণত করতে পারলে, পিতা-মাতার প্রতি বিনয় প্রদর্শন এবং দয়া ও ইহসানের প্রার্থনা দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হয়।

আল্লাহ বলেছেন-

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

"আর পিতা-মাতা উভয়ের জন্য বিনয়ের ডানা অবনত কর এবং বলো, হে আমার রব। তুমি উভয়ের প্রতি দয়া কর যেমনিভাবে শৈশবকালে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা ইসরা : ১৭/২৪)

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ সসীম। আর আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, তিনি অসীম। সুতরাং সসীম ও অসীমের মাঝে যেমন কোন তুলনা করা যায় না, তেমনি সৃষ্টি ও সৃষ্টার মধ্যে কোন তুলনা চলে না। ইবাদত অর্থের বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মাঝে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার ও প্রসার করা বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার অমর্যাদার শামিল। বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের দর্শন, অধিবিদ্যা এবং বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন করার জন্য ওহিভিত্তিক জ্ঞান জানা অবশ্যই প্রয়োজন। ওহিভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করলে 'ইবাদত' অর্থের বিভ্রান্তি বুঝা সহজ হবে।

আর 'ইবাদত' অর্থের বিভ্রান্তি উম্মাহর সন্তানদের মনোবৃত্তি ও মানসিকতা তৈরির ক্ষেত্রে চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক প্রথায় পরিণত হয়। ফলে 'ইবাদত' বলতে যা বুঝায় তা না বুঝিয়ে ইবাদত অর্থের বিভ্রান্তির দিকগুলোই তাদের মন-মগজে ঢুকে যায়। এটা অত্যন্ত মারাত্মক।

সন্দেহ নেই যে, মুসলিম ব্যক্তির ইবাদত অর্থের বিভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া তার আত্মবিশ্বাস ও ইজ্জত-সম্মানের উৎস। কারণ, মুসলিম ব্যক্তির মন-মানসিকতা সর্বদাই হক গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে। এভাবে হক গ্রহণের সুযোগ না থাকলে চিন্তা-গবেষণার পরিবর্তে তাকলিদ অন্ধ বা অনুকরণ ও অনুসরণকেই গ্রহণ করে নেয়। ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের পরিবর্তে বল প্রয়োগকে গ্রহণ করছে।

এজন্য ইসলামী মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হলে অবশ্যই তাওহিদ বা একত্ববাদ, ইবাদত, আত্মশুদ্ধি, সভ্যতা নির্মাণ, প্রতিনিধি নিয়োগ ও ইচ্ছাশক্তির সঠিক অর্থ বুঝতে হবে। সুতরাং মানুষের বাস্তব জীবনে তাওহিদের সঠিক অর্থ বুঝে এর বাস্তবায়নই হলো এ মহান দীনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

www.pathagar.com

"তাওহিদ" (একত্ববাদ)-এর মূল অর্থ এবং অর্থবহ জীবন

জীবন ও জগতকে চেনা ও জানার জন্য ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাওহিদ মানবিক সম্পর্কের বিশ্বাসকে দৃঢ় ও মজবুত করে। তাওহিদের মূল কথা হলো : সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়। মানুষের জীবন ও জগত এক। মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। মানুষের মৃত্যুর পর অনন্তকালের জীবন রয়েছে। আল্লাহ মানুষকে মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের কল্যাণ চান। সুতরাং মানুষ মানুষের সাথে অহংকার প্রদর্শন, কিংবা একে অন্যের প্রতি যুলুম অথবা মানুষের মাঝে স্বৈরাচারি করার বৈধতা নেই। মানুষ মানুষের সম্মান দেবে। ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা ও মানবিক দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব দেবে। এভাবে তাওহিদ মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক পরামর্শদানসহ হকের ব্যাপারে সমতা বিধানের গুরুত্বারোপ করে। মানুষের চূড়ান্ত ও সার্বিক কল্যাণ, ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা ও মানবিক দায়িত্ব পালন তাওহিদের মূল কথা। তাওহিদে আত্মশুদ্ধি, আত্মগঠন ও আবাদ করণের দিক বিদ্যমান রয়েছে। জীবন ও জগতের বিষয়ে আল্লাহর দেয়া বিধান জেনে মানুষ আত্মগঠনের চেষ্টাসহ মানবিক কল্যাণে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

মানুষ ওহিভিত্তিক হেদায়েত ও জ্ঞানের মাধ্যমে নিজেদের স্বভাব-চরিত্র, চারিত্রিক মূল্যবোধ, আত্মশুদ্ধি, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা-সহ আত্মগঠনের চেষ্টা করবে। ওহির জ্ঞানের আলোকে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করবে এবং সর্বোপরি আত্মশুদ্ধির কাজ করবে। এটাই ইবাদতের মূল অর্থ যাকে আরবিতে তা'বীদ (تعبيد) বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের নিয়ম-নীতি বুঝার মাধ্যমে 'ইবাদত'-এর অর্থ বুঝা যায়।

মুসলিম হৃদয় ও মনে ইজ্জত-সম্মান ও দৃঢ়তার উৎস এবং মনোবৃত্তি ও অনুভূতি গঠনের ব্যাপারে 'কুরআনুল কারীম' সরাসরি 'ইবাদত' অর্থের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। যার অর্থ দাসত্ব বা গোলামি করা, দাস বা গোলাম বানানো নয়। মানুষ মানুষের গোলামে পরিণত হবে না। বরং সকল মানুষ আল্লাহর গোলামি করবে।

'মুসলিম মানস' গঠনের ভিত্তি হবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস এবং মুসলিম ব্যক্তি নিজের আচার-আচরণ, চাল-চলন, রীতি-নীতি, পদ্ধতি, বুদ্ধিমত্তা ও অনুভূতি। এসব কিছু উম্মাহর প্রজন্মকে উন্নত শিক্ষায় গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। অবশ্য উম্মাহর অবস্থা পরিবর্তন হওয়া কিংবা উম্মাহ পূর্বের শক্তি সামর্থ ও মর্যাদায় পুনরায় আসীন হওয়া সম্ভব নয়। এটাই আল্লাহর সুন্নাত। আর আল্লাহর সুন্নাত বা নিয়মে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নেই।

আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তাওহিদ, ইবাদত, খলিফা নিয়োগ, সংস্কার ও সভ্যতা নির্মাণ বিষয়ে ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মূল ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।

www.pathagar.com

তাওহিদ, ইবাদত ও আত্মশুদ্ধি

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাওহিদ বা একত্ববাদ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তাওহিদের বিশ্বাসকে মৌলিক বিশ্বাস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ সৃষ্টিজগতের পরিচালক আল্লাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাদের রব। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক একাধিক হলে পৃথিবী অবশ্যই বিপর্যয়ের মুখে পতিত হতো। এতে সহজেই বুঝা যায়, সৃষ্টিকর্তা একজনই। তিনি মহাজ্ঞানী। তিনি সৃষ্টিজগতের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি সকল সৃষ্টি ও মানুষকে পরিচালিত করেন। সেই মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর প্রতিটি হুকুমের আনুগত্য করা প্রতিটি মানুষের উচিত। তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর আনুগত্যের মাঝে অবশ্যই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি এবং ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হওয়া তাঁর হুকুম পালনের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

একত্ববাদের বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ের দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾

"এতো আল্লাহ তোমাদের রব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।"

(সূরা আল-আনয়াম : ১০২/৬)

আল্লাহ্ আরো বলেন-

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

"যদি আকাশ ও জমীনের মাঝে আল্লাহ ব্যতীত কয়েকজন ইলাহ থাকতো তাহলে অবশ্যই আকাশ-জমীন ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে পড়তো। সুতরাং পবিত্রতা ঘোষণা করছি মহান আরশের মালিকের যিনি তাদের (মুশরিকদের) দেয়া বর্ণনা থেকে পূতপবিত্র।"

(সূরা আল-আম্বিয়া : ২২/২১)

একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾

"নিশ্চয়ই আমি এভাবে সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই সে (নূহ নবী (আঃ)) ছিল আমার মুমিন বান্দাহদের অন্যতম।" (সূরা আস-সাফ্ফাত : ৩৭/৮০/৮১)

www.pathagar.com

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾

"সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন আমলে সালেহ (নেক আমল) করে এবং যেন তাঁর রবের সাথে কাউকে শরিক না করে। (সূরা আল-কাহফ : ১৮/১১০)।"

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

"আর আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও মুমিনদের জন্য ইজ্জত-সম্মান নিহিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"

(সূরা আল-মুনাফিকুন : ৬৩/৮)

'আমালে সালেহ' বা নেক কাজ সম্পাদন করা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের ইজ্জত ও সম্মানের পথ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় গ্রন্থ আল-কুরআনে বলেন-

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾

"আমি কি যারা ঈমান আনে এবং 'আমলে সালেহ' করে তাদেরকে পৃথিবীতে যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদের সমকক্ষ করবো? না-কি আমি আল্লাহ ভীরুদেরকে পাপীদের সমকক্ষ করবো? (কখনো নয়)।" (সূরা সোয়াদ : ৩৮/২৮)

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন কর সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর তুমি আমার (নেক্কার) বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"

(সূরা আল-ফজর : ৮৯ : ২৭ - ৩০)

﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾

"অবশ্য যারা ঈমান আনয়ন করে এবং 'আমলে সালেহ' করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।" (সূরা আল-ইনশিক্বাক ৮৪/২৫)

www.pathagar.com

প্রতিনিধিত্ব, সংস্কার ও আবাদ প্রসঙ্গ

এ পর্যায়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কিছু আয়াত উল্লেখ করবো, আয়াতগুলোতে কুরআনুল কারীম স্পষ্টভাবে হেদায়েত ও কল্যাণের পথ কোনটি তার বর্ণনা দিয়েছে। পাশাপাশি এ আয়াতসমূহে কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন এমন সুদক্ষ কর্মতৎপর, দায়িত্বশীল, প্রতিনিধিত্বকারী, ও সৎকর্মশীল মুমিনের পরকালীন জীবনের শেষ পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে কুরআনুল কারীম পথভ্রষ্টতা ও কুফরির পথ কোনটি এর স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। এছাড়াও এ আয়াতসমূহে অস্বীকারকারী, কাফির ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তির শেষ পরিণতি কীরূপ হবে, সে সম্পর্কেও স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এ বর্ণনায় হকের মূলনীতি, রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রভাব, সংস্কার ও আবাদ পদ্ধতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ বলেছেন-

﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى - وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾

﴿إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾

﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

www.pathagar.com

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾

﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾

﴿وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُونَ﴾

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত আয়াতসমূহের সরল অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হলো :

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করে এবং আমলে ছালেহ বা সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) দান করবেন। যেমন তিনি শাসন ক্ষমতা দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।

(সূরা নূর : ২৪/৫৫)।

অতঃপর আমি তাদের পরে তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি। যাতে দেখি তোমরা কেমন আমল কর।

(সূরা ইউনুস : ১০/১৪)।

হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব, তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। নিঃসন্দেহে আমার রব অতি নিকটবর্তী ও প্রার্থনায় সাড়া দানকারী। (সূরা হুদ : ১১/৬১)

আর তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে হতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়েতের বদলে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।

(সূরা আল-ক্বাসাস : ২৮/৫০)

যিনি সৃষ্টি করেছেন, এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। আর যিনি সুপরিমিত করেছেন এবং পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা আল-আ'লা : ৮৭/৪২)

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন-ই। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (সূরা ত্বালাক : ২৫/৩)।

অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি। আর আমি কতই না উত্তম সক্ষম স্রষ্টা। (সূরা আল-মুরছালাত-৭৭/২৩)

নিঃসন্দেহে আমি সবকিছুকে পরিমিত সৃষ্টি করেছি।
(সূরা আল-ক্বামার : ৫৪/৪৯)

যারা ঈমান আনে এবং যুলুম বা শিরকের সাথে তাদের ঈমানকে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত।
(সূরা আল-আনয়াম : ৬/৮২)

যে 'আমলে ছালেহ' সম্পাদন করে– সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী– আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের প্রতিদান দিব তাদের উত্তম কাজের বিনিময়ে যা তারা (দুনিয়ার জীবনে) করত। (সূরা নাহল : ১৬/৯৭)

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং আমলে ছালেহ সম্পাদন করে। নিঃসন্দেহে আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদানকে নষ্ট করি না।
(সূরা কাহ্ফ : ১৮/৩০)

আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে, যারা আমলে সালেহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ সম্মান।
(সূরা তহা : ২০/৭৫)

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, আর যারা ঈমান আনে এবং আমলে 'ছালেহ' করে ও যারা কু-কর্ম করে (তারা সমান নয়)। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। (সূরা গাফের : ৪০/৫৮)

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। অতএব, তোমরা মাপ ও ওজন পরিপূর্ণ করে দাও এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না। পৃথিবীতে সংস্কার সাধনের পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (সূরা আল-আরাফ : ৭/৮৫)

আল্লাহ আরো বলেন :

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

www.pathagar.com

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ- وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾

﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, এর দ্বারা তুমি পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি দয়া ও ইহসান কর, যেমন আল্লাহ আপনার প্রতি ইহসান করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করে না।

(সূরা আল-ক্বাসাস : ২৮/৭৭)

আর যখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তখন পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করার প্রচেষ্টা করে। আর আল্লাহ বিপর্যয় ও বিশৃংখলা পছন্দ করেন না। যখন বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে বেষ্টন করে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (সূরা আল-বাকারা : ২/২০৫-২০৬)

পৃথিবীর কোন জনবসতিকে আমি ধ্বংস করি না। অবশ্য সেখানকার অধিবাসীরা জালিম হলে তাদেরকে ধ্বংস করি।

(সূরা আল-ক্বাসাস : ২৮/৫৯)

আর আপনার রব এমন নন যে, অন্যায়ভাবে জনবসতিগুলোকে ধ্বংস করে দেবেন অথচ সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল ও সংস্কারবাদী। (সূরা : হুদ : ১১/১১৭)

সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর রবের দিদার কামনা করে, সে যেন আমলে সালেহ (নেক আমল) করে এবং তাঁর রবের ইবাদতে কাউকে যেন শরিক না করে। (সূরা আল-কাহফ : ১৮/১১০)

এছাড়াও আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদিসেও এ বিষয়ে হেদায়েত ও সঠিক পথ নির্দেশ রয়েছে।

www.pathagar.com

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : মুসলিম ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলামী মৌলিক বিশ্বাস ও আদর্শকে পুনর্জীবিত করাসহ যাবতীয় বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারকে দূরীভূত করতে হবে। এতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক পরামর্শ ও দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে আবাদ ও সংস্কারমূলক ইতিবাচক কর্মসূচীর প্রাণশক্তি জাগ্রত হবে।

চতুর্থ বিভ্রান্তি : বর্ণনামূলক বিভ্রান্তি

মুসলিম অনুভূতি, মানস ও মানসিকতায় সবচেয়ে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক হলো আলোচনা ও বর্ণনামূলক বিভ্রান্তি। এ বিভ্রান্তি মূলত ইসলাম বিষয়ক আলোচনা ও বর্ণনার বিভ্রান্তি। নির্বাচিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মাঝে পারস্পরিক অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার কারণে ঐ বর্ণনামূলক বিভ্রান্তির সূচনা হয়। এ অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা, চিন্তা-গবেষণা, নতুনত্ব ও সৃজনশীলতার প্রেরণাশক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়। ফলে উম্মাহ অন্ধ তাকলিদ বা অনুকরণ ও অনুসরণের পথ গ্রহণ করে নেয়। এতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তা হলো, গাফেল ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিবর্গকে কাফির ও নাস্তিকদের পর্যায়ে বিবেচনা করা। পরিণতিতে জাতি অজ্ঞতা, দারিদ্র ও মানসিক অসুস্থতার দিকে ধাবিত হয়। এতে উম্মাহর প্রাণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে বলা হয়ে থাকে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একদিন মুসলিম জনগণের উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহণ করে উম্মাহর সম্পদ রক্ষা ও বাইতুল মাল সংরক্ষণের খুতবা প্রদান দিয়েছিলেন। তিনি খুতবায় বাইতুল মালকে (مال الله) [মালুল্লাহ্] আল্লাহর সম্পদ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরক্ষণেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিশিষ্ট সাহাবী হজরত আবু যর গিফারি (রাঃ) ঘোষণা করলেন, বরং এ সম্পদ (مال المسلمين) (মালুল মুসলমান) মুসলিম জনগণের। সুতরাং এ সম্পদ তাদের মাঝে সুষম বণ্টন করতে হবে।

যখন কোন মুসলিম ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, তখন এ দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিমত্তাকে হ্রাস করে দেয় এবং আত্মনির্ভরশীলতাকে ধ্বংস করে দেয়। এটাও বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, উম্মাহ পশ্চাতপদতায় পৌঁছার কারণ হলো ক্ষমতাশীল নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের শিকার হওয়া।

এ পর্যায়ে বর্ণনামূলক বিভ্রান্তি কীভাবে সৃষ্টি হয় এ বিষয়ে দু'-একটি উদাহরণ পেশ করা হলো :

একবার আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে (O.I.C) কিছু ইসলামী ব্যক্তিত্বের আলোচনা থেকে কিছু বিভ্রান্তি আমি লক্ষ্য করেছি। সেখানে লেকচার ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত।

www.pathagar.com

হল ছিল পরিপূর্ণ। আলোচ্য বিষয় যতটুকু মনে হয় আলোচকদের জ্ঞান ও যোগ্যতা অনুযায়ী ছিল না। পূর্ব থেকে নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুতি না থাকায় আলোচকবৃন্দ বিব্রতবোধ করেন। আলোচকদের কেউ কেউ আবেগময়ী বক্তব্য, আবার কেউ উপলক্ষ্য হীন বক্তব্য প্রদান করেন। এমন কি মৃত্যুর আলোচনা ও এখানে স্থান পায়। গঠনমূলক আলোচনা না হয়ে এলোপাথাড়ি আলোচনা হওয়ায় কেউই তা থেকে উপকৃত হতে পারেন নি।

চিন্তাগত ভয়-ভীতি প্রয়োগ করার পদ্ধতিতে জুময়ার দিন খুতবা দেয়ার একটা উদাহরণঃ

জনৈক খতিব জুম'আর দিন দাড়ি রাখার ব্যাপারে খতুবা প্রদান করেন। উপস্থিত জনগণের নিকট এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার মত জ্ঞান ও যোগ্যতা তার ছিল না। সে খতিব বিষয়টি শ্রোতামণ্ডলীর নিকট ভালভাবে পৌছানোর দায়িত্বও পালন করেন নি। উল্লেখ্য, খতিবের পিছনে এমন অনেক লোক ছিল যারা দাড়ি মুণ্ডন করে। তারা মনে করে, এটা সৌন্দর্যের বিষয়। অথচ খতিব শ্রোতামণ্ডলীকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে দাড়ি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন। তিনি দাঁড়ি রাখাকে ফরজ বলেছেন। কিন্তু তার বক্তব্য উল্টো প্রভাব পড়েছে। মাথার চুল রাখা ও পোষাক পরিধান করা যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক, তারা মনে করে নিয়েছেন যে, দাড়ি রাখাও সৌন্দর্যের প্রতীক। খতিব দাড়ির বিষয়টিকে ঈমান ও আক্বিদার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ধরেই নিয়েছেন যে, দাড়িমুণ্ডনকারীরা মূলত সুন্নাহর অস্বীকারকারী। সুন্নাহর অস্বীকারকারী দীন অস্বীকারকারীর শামিল। আর দীন অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে বিবেচিত হয়। বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা না দিলে আলোচনায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

বাস্তব জীবন ও সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সঠিক চিন্তাধারা প্রয়োগ ও সুপরিচিত পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষাদান প্রয়োজন।

যখন আক্বিদা-বিশ্বাস, দীন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষাদান মুসলিম মনোবৃত্তি ও মানসিকতা গঠনের বিশেষ দিক বলে বিবেচিত, তখন দীনি শিক্ষা দানের সময় একে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা জরুরি। তাই শিশুকে শিক্ষা দান, শিশু মনে সুস্থ আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা করে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবী ﷺ আমাদের সর্বোত্তম শিক্ষক হিসেবে যথেষ্ট। তিনি ছিলেন একজন সফল পিতা, সফল নানা ও সফল অভিভাবক। তিনি কখনো কোন শিশুকে প্রহার করেন নি। সুতরাং রাসূল ﷺ এর আদর্শ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কোমল আচরণের মাধ্যমে অনুভূতি পরিবর্তন করা যায়। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট জিনা করার অনুমতি চেয়েছিল। তিনি জবাবে এ গর্হিত কাজটি তার মা,

www.pathagar.com

বোন, ফুফু কিংবা খালার সাথে করা হলে সে রাজি হবে কি-না? পর্যায়ক্রমে এ প্রশ্নের জবাবে লোকটি রাজি হবে না বলে জানালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটির অনুভূতিতে যেন দাগ কাটে এজন্য বললেন : দেখ তুমি যার সাথে জিনার অনুমতি চাচ্ছ সে কারো না কারো, মা, কিংবা বোন, কিংবা ফুফু অথবা খালা। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপযুক্ত ও সময় উপযোগী শিক্ষাদানের মাধ্যমে লোকটির অনুভূতি পরিবর্তন করে দিলেন। তাঁর জন্য দোয়া করে দিলেন।

হাদীসে এসেছে, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল[1] তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু উমামা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা এক যুবক আল্লাহর নবী ﷺ এর নিকট হাজির হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে জিনা করার অনুমতি দিন। একথা শুনে উপস্থিত লোকজন অগ্রসর হয়ে তাকে ধমক দিল। তারা বলল : তুমি কী বলছ, থাম, থাম।

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বললেন : তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। এরপর লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকটে গিয়ে বসল।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ গর্হিত কাজটি তোমার মার জন্য পছন্দ কর। জবাবে লোকটি বলল : না- হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।

জবাবে তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : অন্যান্য লোকজনও এ কাজ তাদের মায়েদের জন্য পছন্দ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি কি এ কাজ তোমার মেয়ের জন্য পছন্দ কর? জবাবে বলল- না-হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন : লোকজনও এ কাজ তাদের মেয়েদের জন্য পছন্দ করে না।

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ কাজ তোমার ফুফুর জন্য পছন্দ কর? জবাবে লোকটি বলল : না, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, লোকজনও তাদের ফুফুদের জন্য এ কাজ পছন্দ করে না।

---

[1] মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং- ২১১৮৫ হাশিয়া : দ্র. (أزمة الإرادة والوجدان المسلم) 'মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট'।

www.pathagar.com

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ কাজ তোমার খালার জন্য পছন্দ কর? জবাবে লোকটি বলল : না, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : লোকজনও এ কাজ তাদের খালাদের জন্য পছন্দ করে না। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপন হাতকে তার হাতের উপর রাখলেন এবং দোয়া করলেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

হে আল্লাহ্! তুমি তার গোনাহ ক্ষমা করে দাও। তার অন্তরকে পবিত্র করে দাও এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত কর।

রাবী বলেন : এরপর থেকে সেই যুবকটি কোনদিন কোন কিছুর দিকে তাকাত না।

(মুসনাদে আহমদ)

নিঃসন্দেহে সমাধানমূলক এবং ইসলামী শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের সহায়ক গ্রন্থাবলী বিষয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে জ্ঞান থাকা চাই। কারণ, এতে গবেষণা ও মতামতের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

ওহির জ্ঞানের ভিত্তিতে- ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক- উপদেষ্টামণ্ডলী উম্মাহর জন্য যা কল্যাণকর তা গ্রহণ করতে পারেন। মানুষের মন-মানসিকতা, আচার-স্বভাব, প্রয়োজন, চাহিদা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি এসব কিছুতে ইসলামী জ্ঞান ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী পদ্ধতি সম্পৃক্ত থাকা জরুরি। এতে উম্মাহ জীবন ও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শভিত্তিক আলোচনা করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে।

ইসলাম বিষয়ক আলোচনা পর্যালোচনাসহ প্রত্যেক ধরনের আলোচনায় ভীতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ শিশু সংক্রান্ত আলোচনা ও শিশু শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে এ ভীতি কাজ করে। তবে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর পরম বিনয়ভাব থাকা উত্তম। এক্ষেত্রে একটা প্রবাদ বাক্য উল্লেখ করা যেতে পারে- من علمني حرفا صرت له عبدا অর্থাৎ : আমাকে যে একটা হরফ বা বর্ণ শিক্ষা দিলেন, আমি তার গোলামে পরিণত হলাম।

পঞ্চম বিভ্রান্তি : বুদ্ধিবৃত্তিক কুসংস্কার :

বুদ্ধিবৃত্তিক কুসংস্কারমূলক বিভ্রান্তি উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বিপদজ্জনক ও ভয়ঙ্কর। এ বুদ্ধিবৃত্তিক কুসংস্কারমূলক বিভ্রান্তির অর্থ হলো উম্মাহর সন্তানদের সুস্থ বুদ্ধিমত্তাকে ধ্বংস করে দেয়া। এ যুগে উম্মাহ যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পশ্চাতপদতার মোকাবেলা করা। অর্থাৎ

www.pathagar.com

উম্মাহকে রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক বা আবাদি কিংবা যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে সুনিপুণতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, উম্মাহর সংবিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাপারেও বুদ্ধিবৃত্তিক কুসংস্কার প্রকাশ পেয়েছে। যে কুরআন উম্মাহকে চিন্তা, গবেষণা, দৃঢ়তা, দয়া ও ইহসান এবং আল্লাহর পথে জিহাদের দিকে আহ্বান করতে এসেছে।

আরো বিস্ময়কর হলো, উম্মাহর দীন, হক রেসালত এবং মহানবী ﷺ কে আনুগত্য করার ব্যাপারেও বুদ্ধিবৃত্তিক কুসংস্কার বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবন চরিত থেকেও এ কুসংস্কার বাদ যাচ্ছে না। অথচ রাসূলে কারীম ﷺ মানুষ হিসেবে রেসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল-কুরআনে তাকে মানবীয় স্বভাব ও গুণাবলী সম্পন্ন বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি পার্থিব উপকরণাদি অনুকরণের মাধ্যমে রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি মানুষ হিসেবেই কষ্ট পরিশ্রম করতেন। তবে তিনি কর্ম প্রচেষ্টার চিন্তা-গবেষণা ও জিহাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক ও একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ও তাঁর জাতি শত্রুকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বিজয় লাভ করেছেন। আবার কখনো পরাজয়ও বরণ করতে হয়েছে। তিনি সুস্থ ও অসুস্থ উভয় অবস্থায় দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানুষ হিসেবে ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভব করতেন। রেসালতের সংবাদ ব্যতীত পার্থিব কোন বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত দিলে সঠিক হওয়া ও না হওয়া উভয়টির সম্ভাবনা থাকত। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মানবীয় গুণাবলীর উর্ধ্বে মনে করা এক ধরনের কুসংস্কারমূলক বিভ্রান্তি।

এক কথায় আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন মানুষ। অবশ্য তিনি মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন একজন মহামানব ছিলেন। তিনি যুদ্ধ পরিচালনা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছিলেন একজন অভিনব কৌশলী ও মহান ব্যক্তিত্ব।

এ পর্যায়ে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মহানবী ﷺ এর যেসব মানবীয় গুণাবলী প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো :

﴿قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلاّ مَا شَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

﴿قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

www.pathagar.com

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ﴾

"হে নবী ﷺ আপনি বলুন! আমি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমার নিজের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না। আর আমি যদি গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হতাম তাহলে অবশ্যই অধিক উত্তম হয়ে যেতাম এবং আমাকে কোন অপরাধ স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী এবং ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদদাতা।" (সূরা আল-আরাফ : ৭/১৮৮)।

"[হে নবী ﷺ] আপনি বলুন! আমি বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন ভাণ্ডার আছে এবং আমি গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত নই। আমি একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমার নিকট যে ওহি প্রেরণ করা হয় আমি তাই অনুসরণ করে থাকি।" (সূরা আল-আন'আম : ৬/১৫০)

"[হে নবী ﷺ] আপনি বলুন! আমি তো তোমাদের মতই মানুষ। আমার নিকট ওহি প্রেরণ করা হয়। কেবলমাত্র তোমাদের ইলাহ একজনই। অতএব, যে ব্যক্তি তার রবের দীদার কামনা করে সে যেন আমলে ছালেহ বা সৎকর্ম করে। আর তার রবের এবাদতের সাথে কাউকে যেন শরিক না করে।" (সূরা কাহাফ : ১৮/১১০)।

"মুহাম্মদ ﷺ রাসুল ভিন্ন অন্য কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। অতএব, যদি তিনি এন্তেকাল করেন কিংবা শাহাদত বরণ করেন, তাহলে কি তোমরা তোমাদের পশ্চাতে ফিরে যাবে?" (সূরা আলে ইমরানে : ৩/১৪৪)।

www.pathagar.com

"নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।"

(সূরা ক্বালাম : ৬৮/৪)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন বিনিময়ে তাদের জান্নাত দেবেন। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, জীবন নেবে এবং জীবন দেবে। তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিলে তার যথাযথ ওয়াদা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর চেয়ে অধিক ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে হতে পারে?"(সূরা তাওবা : ১১১/৯)

অতএব, নবী কারীম ﷺ ও তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর গোটা জীবনটাই ছিল জিহাদ, কর্মতৎপরতা, আমল ও পার্থিব উপকরণাদির মাধ্যমে দীন কায়েমের পূর্ণ প্রচেষ্টা। এ রেসালত বহনকারী, কুরআন তেলাওয়াতকারী এবং এ নবী কারীম ﷺ এর অনুসরণকারীগণ তাদের মন-মানসিকতায়, বিবেক বুদ্ধিতে কীভাবে কুসংস্কারকে স্থান দেবেন? কীভাবে তারা কুসংস্কারকারীদের শিকারে পরিণত হবেন। বিশ্বজগত পরিচালনায় আল্লাহর সুন্নাত বিষয়ক জ্ঞান ও গবেষণার পথে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে? না, এ উম্মাহর রেসালত বহনকারীগণ কখনো কুসংস্কার গ্রহণ করতে পারে না।

মহাজাগতিক বিধান অন্বেষণ করা আবশ্যিক শর্ত, যথেষ্ট নয় : তাওয়াক্কুল (ভরসা) ও তাওয়াক্কুলের ভান

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এমন হাজারো আয়াতের বর্ণনা রয়েছে যেগুলো মানুষের হৃদয় ও বিবেককে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতগুলোর আলোচনায় যুক্তি, দলিল ও প্রমাণ উপস্থাপনসহ আমল ও দায়িত্ব পালনের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। এবং সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর পথে জিহাদ ও পার্থিব প্রয়োজনীয় উপকরণ গ্রহণের জন্য উম্মাহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মহানবী ﷺ তাঁর একজন সাহাবীকে উপকরণ গ্রহণের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেন-

اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

"উটনীকে আগে বেঁধে নাও, এরপর আল্লাহ্‌র উপর তায়াক্কুল (ভরসা) কর।"[2]

আল্লাহ বলেন-

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى - وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾

[2] তিরমিজী ঃ হাদিস নং ১৪৪১

www.pathagar.com

"যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। আর যিনি নিয়তি নির্ধারণ করেছেন এবং পথ নির্দেশ করেছেন।"

(সূরা আল-আ'লা : ৮৭/২,৩)

﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾

"অতঃপর তিনি একটি কার্য উপকরণ অবলম্বন করেছেন।"

(সূরা কাহ্ফ : ১৮/৮৫)

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾

"এবং মানুষ তাই পায়, যা সে নিজে চেষ্টা করে।"

সুতরাং আমল করা ও উপকরণাদির মাধ্যমে চেষ্টা করা এবং দায়িত্ব পালনসহ অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মহাজগত সম্পর্কিত আল্লাহর বিধান অন্বেষণের মাধ্যমে যোগ্যতার বাস্তবায়ন আবশ্যিক শর্ত। এ শর্ত ব্যতীত কারো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

কর্ম উপকরণ গ্রহণ না করে কুসংস্কারের পশ্চাতে অবস্থান করলে মানব জীবন জগতে কোন বাস্তব ফলাফল লাভ করতে পারবে না। কোন প্রকার কুসংস্কারমূলক কু-ধারণার মধ্যে তাওয়াক্কুল, কর্ম তৎপরতা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং মহাজগত সম্পর্কিত আল্লাহর সুন্নাত জেনে নেয়ার কোন অর্থ থাকে না। কারণ, প্রকৃত তাওয়াক্কুল ও দোয়া এবং উভয়ের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া কেবলমাত্র আমল করা এবং সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করার মাধ্যমে সম্ভব।

মূলত সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করে আমল বা কাজ করার পর আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিক চেয়ে তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা করাকে তায়াক্কুল توكل বলা হয়। আর কাজ ছেড়ে দিয়ে অলসতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে কর্ম পরিত্যাগ এবং কর্মের উপকরণাদি গ্রহণ না করাকে তাওয়াকুল {تواكل} বা 'ভরসার ভান' বলা হয়। এটা ইসলাম ও আল্লাহর সুন্নাহ বা বিধানের পরিপন্থী পথ। আর যে ব্যক্তি কুসংস্কার চর্চার করে এবং দাজ্জাল ও কুসংস্কারবাদীদের পথ ধরে চলে, নিঃসন্দেহে এটা পথভ্রষ্টতার পথ, শিরক ও কুফুরির পথ। এ পথ থেকে উম্মাহকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এ পর্যায়ে সর্বাত্মক চেষ্টা, কর্ম-উপকরণ গ্রহণ এবং দোয়া ও তায়াক্কুল করার মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কী সম্পর্ক রয়েছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্য একটা উদাহরণ পেশ করা হলো :

যে ছাত্রকে শিক্ষক পাঠদান করেন, সে ছাত্রের উচিত নিজের পাঠকে বুঝা, নিজে পড়া মুখস্থ করে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার হলে যাওয়া। অন্যথায় এসব উপকরণ গ্রহণ না করলে যে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। আবার শুধু এসব উপকরণ গ্রহণ করলেও

www.pathagar.com

চলবে না, উপকরণের পাশাপাশি আল্লাহর নিকট সাহায্য ও তাওফিক কামনা করে দোয়া করবে এবং আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল করবে। আবার আমল বা কাজ না করে শুধু দোয়া করলে হবে না বরং কর্মের উপকরণাদি গ্রহণ করে কার্যসম্পাদন শেষে মহান রবের নিকট তাওফিক কামনা করে দোয়া করবে সর্বোপরি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করবে। এটাই চেষ্টা, কর্ম-উপকরণ গ্রহণ এবং দোয়া ও তাওয়াক্কুলের মধ্যকার সম্পর্ক। কোন ছাত্র পরীক্ষার হলে একটি প্রশ্ন ভুলে গেল। সবকটি প্রশ্নের উত্তর ঠিকই দিতে পারল কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। পরীক্ষার হল থেকে বের হয়েও জানতে পারল না কেন সে উত্তরটি ভুলে গেল। এখানে মূলত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিলে চলবে না। পরীক্ষার প্রস্তুতি, লেখা-পড়া তার আমল বা কাজ। কিন্তু এতটুকু আমলই যথেষ্ট নয়। বরং আমল করার পর তাকে আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিক কামনা করতে হবে এবং সর্বপরি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। এটাই ইসলামী জীবন দর্শন।

সুতরাং যে মুসলমানগণ আল্লাহর পাঠানো সর্বশেষ হেদায়ত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অনুসারী যারা জ্ঞানার্জন ও চেষ্টা করা ও কর্ম উপকরণ গ্রহণের জন্য আদিষ্ট, কী করে তারা কর্ম থেকে কিংবা কর্ম-উপকরণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন, কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস গ্রহণ করবেন? এটা অবশ্যই ইসলামী জীবন দর্শনের পরিপন্থী।

সন্ত্রাস, স্বৈরাচার ও পশ্চাদপদতা কুসংস্কারের উর্বর ভূমি

এটা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, পূর্বে যে সব বিভ্রান্তির কথা আলোচিত হয়েছে তা উম্মাহর মানসে স্থান করে নিয়েছে। পাশাপাশি এগুলো কুসংস্কারমূলক চিন্তা-ধারার উপযুক্ত উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

যখন উম্মাহর সাধারণ জনগণ স্বৈরাচার, যুলুম-নির্যাতন, রাজনৈতিক সন্ত্রাস এবং চিন্তাগত ভীতির শিকারে পরিণত হলো, তখন উম্মাহ এ অবস্থাটুকু মেনে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা আত্মগঠন ও সৃজনশীলতা ছেড়ে দেয়। এতে উম্মাহ দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। ফলে মানুষ আত্মনির্ভরশীলতা ও জীবন কর্মের তৎপরতা হারিয়ে ফেলে।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অজ্ঞতার কারণেই হোক আর অক্ষমতার কারণেই হোক কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও সুন্নাহর অপব্যাখ্যা এবং মিথ্যা-বানোয়াট ও কল্পকাহিনী তাদের কর্মসমূহকে অতিষ্টি করে দিচ্ছে। অক্ষমতার কারণে এটা দমনও করতে পারছে না। কারণ, তাদের সংস্কৃতি, মানসিক শক্তি ও মনোবৃত্তি ধ্বংসের পথে। তাদের চিন্তা-গবেষণা, সৃজনশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। পৃথিবীর কোন জাতির ভাগ্যে এ ধরনের নাজুক অবস্থা ও পরিস্থিত সংঘটিত হয় নি। তাহলে তো আল-কুরআনের অনুসারী এ উম্মাহর ভাগ্যে এ ধরনের পরিস্থিতি না

www.pathagar.com

হওয়ারই কথা ছিল। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উম্মাহর দুর্বলতা ও অক্ষমতার সুযোগে তারা রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও স্বৈরাচারের যুলুম-নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে।

কুসংস্কারকে পবিত্র বস্তু ও দীন মনে করার বিপদ

উম্মাহর মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়া ও বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়াকে সবচেয়ে বড় ধরনের বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উম্মাহকে এসব বিপদ ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্যে সমাধানের পথ বের করতে হবে।

যেসব কুসংস্কারকে পবিত্র বস্তু ও দীন মনে করা হয় তন্মধ্যে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও জাল হাদিস রেওয়ায়েত, প্রাচীন কিংবদন্তী, মিথ্যা ও কল্পকাহিনী এবং ঈসরাঈলী বর্ণনা চালু করা। উম্মাহকে এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। চালু করতে হবে আল-কুরআনের মিশন। যে মিশনের দায়িত্ব আল্লাহ উম্মাহকে অর্পণ করেছেন। কুরআনী মিশনে মানুষের আক্‌ল বা বিবেক বুদ্ধির সম্মান ও ইচ্ছাশক্তির গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ জিন জাতির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-

﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً - وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً﴾

"আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণের জন্য বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। নিঃসন্দেহে আমরা জানি না, পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল কামনা করা উদ্দেশ্য, না-কি তাদের রব তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন।" (সূরা জ্বিন : ৭২/৯.১০)

আল-কুরআনে যখনই কোন পূর্ববর্তী জাতির স্বভাব-বহির্ভূত বিষয় চর্চা করা সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করেছে, তখন কেবল অতীত ইতিহাস, মানুষের উন্নতির বিকাশ ও স্তর এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা ও পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু যখন মানবতা-পূর্ণ একটা অবস্থানে পৌঁছল, তাদের চিন্তা-চেতনা পূর্ণতা লাভ করল, তারা পূর্ণাঙ্গ দীনের সন্ধান লাভ করল এবং মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তা বিকাশের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মিশন নাজিল হলো, যাতে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ হেদায়েতের আলোক রশ্মি, বিভিন্ন স্থানে কর্মের উপকরণ গ্রহণ বিষয়ক বিস্তারিত বর্ণনা, তখন পূর্বের সকল অবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

www.pathagar.com

আল-কুরআন আল্লাহ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এ বিশ্বজগতের বাইরে অন্য কোন জগতে পলায়নের কারো ক্ষমতা নেই, কিংবা আল্লাহর উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের শক্তিও কারো নেই।

এজন্য আল্লাহ বলেন-

﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾

"এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে।" (সূরা জ্বিন : ৭২/৯)

"আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন মানুষের উপকার কিংবা ক্ষতি করার শক্তি কারো নেই।"

আল্লাহ বলেন :

﴿قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ﴾

﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾

﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾

"তিনি [মুসা (আ.)] বললেন : তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকজনের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল এবং তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করল।" (সূরা আল-আরাফ : ৭/১১৬)

"তিনি [মূসা (আঃ) বললেন : বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।" (সূরা ত্বহা : ২০/৬৬)

"তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।" (সূরা ত্বহা : ২০/৬৯)

আল্লাহ আরো বলেন :

﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾

"তারা তাই শিক্ষা গ্রহণ করে যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে।" (সূরা বাকারা : ২/১০২)

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মিশন ছিল বিশ্ববাসীর জন্য। তন্মধ্যে মানব জগতের বাইরের জগত জিন জগত বা জিন জাতিও এ মিশনের আহ্বানে শামিল।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন-

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾

"[হে নবী ﷺ] আপনি বলুন, আমার নিকট এ মর্মে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে যে, একদল জিন (মহাগ্রন্থ আল-কুরআন) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে।" (সূরা জ্বিন : ৭২/১)

আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী ﷺ কে জিন জাতির সংবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে শিখিয়েছেন। কারণ, আল-কুরআনের ভাষা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দেখেন নি। কিন্তু তাদের কুরআন শোনার সংবাদ দিয়েছেন অথচ তাঁর জগত ও জিনদের জগত এক নয়।

জিন জাতির নেতা ইবলিসকেও দেখা যায় না। তার কুমন্ত্রণার ব্যাপারে কুরআনে সংবাদ দেয়া হয়েছে, মানুষ এ কুমন্ত্রণা অনুভব করে থাকে। অবশ্য নেক্কার ঈমানদার বান্দাহ্দের পথভ্রষ্ট করার শক্তি তাকে দেয়া হয়নি।

আল্লাহ্ বলেন :

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"নিশ্চয় যারা আমার বান্দাহ, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু পথভ্রষ্টদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে তাদের কথা আলাদা।" (সূরা হিজর : ১৫/৪২)

"নিঃসন্দেহে তার ক্ষমতা বা আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবের উপরই তাওয়াক্কুল করে।"(সূরা নাহল : ১৬/৯৯)

আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতি সকলের কল্যাণ চান। কারো অকল্যাণ চান না। তিনি বিচার দিবসে সকলের ভাল-মন্দের হিসেব নেবেন। কারো প্রতি সামান্যতমও যুলুম করবেন না। সামান্যতম নেক হলেও তার প্রতিদান এবং সামান্যতম গোনাহ হলেও এর প্রতিফল প্রদান করবেন।

আল্লাহ্ বলেন :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ-وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾

www.pathagar.com

﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

﴿كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾

"অতএব যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি যে অপকর্ম বা গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।"

(সূরা আল-আনয়াম : ৬/১৬৪)।

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর কৃত কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। তাদের কারো প্রতি যুলুম করা হবে না।" (সূরা আলে ইমরান : ৩/২৫)।

"আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেব। আজ কারো প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না।" (সূরা গাফের : ৪০/১৭)।

"তোমাদেরকে যেসব বিপদ-আপদে আক্রান্ত করে, এসবই তোমাদের হাতের উপার্জন বা কৃতকর্মের ফল।" (সূরা শূরা : ৪২/৩০)।

সুতরাং উম্মাহকে যাবতীয় কুসংস্কারকে পবিত্র বস্তু ও দীনের মত গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হবে।

আল-কুরআনে বর্ণিত দু'টো সূরা 'আন-নাস' ও আল-ফালাক' কুসংস্কারমূলক চিন্তার প্রতিবন্ধক

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং তাঁর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রেখে আল-কুরআনে বর্ণিত দু'টো সূরা- সূরা 'আন-নাস' ও 'আল-ফালাক' তেলাওয়াত করে যাবতীয় কুসংস্কার থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। উক্ত দু'টো সূরাকে একত্রে 'মুআওবিযাতান' বলা হয়। এ দু'টো সূরা আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করে। এ দুটো সূরা পাঠে মুমিন বান্দাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হন এবং অন্তরে পরম প্রশান্তি লাভ করেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে,

www.pathagar.com

কতিপয় গালিফ কুসংস্কারবাদী পরিবেশ পরিস্থিতি না বুঝে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে কুসংস্কারের পথ উন্মুক্ত করে।

আল্লাহর উপর নির্ভর করে নয়, দোয়া ও ঝাড়ফুঁক এক ধরনের অনুভূতিমূলক সম্পর্ক

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশেষ হেদায়েত বাণী। এ গ্রন্থে মানবতা জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সকল দিক-নির্দেশনা ও সমাধান পাবে। কিন্তু আফসোসের বিষয়। আজ মানুষ কুরআনকে ঝাড়-ফুঁক দেয়ার বাণী বানিয়েছে। কোন কোন মানুষ এর মাধ্যমে কুসংস্কারের পথ উন্মুক্ত করছে। কেউ কেউ ঝাঁড় ফুঁক দেয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এভাবে কুরআনকে ব্যবসা করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা আদৌ যুক্তি সংগত নয়।

মূলত দোয়ার মাধ্যমে বান্দাহ ও আল্লাহর মাঝে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বান্দাহ তার সকল প্রয়োজনের কথা তার রবের নিকট প্রাণ খুলে বলবে। আল্লাহ অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেবেন।

আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

"যখন আমার বান্দাহগণ আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে আপনি বলে দিন, নিঃসন্দেহে আমি অতি নিকটেই আছি। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় আমি সাড়া দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে তথা দোয়া করে।" (সূরা বাক্বারা : ২/১৮৬)

এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের দোয়া শুনেন এবং গোপন বিষয় জানেন।

আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

"অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি মানুষের মন (গোপনে) যে কুচিন্তা করে। আর আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (সূরা ক্বাদ : ৫০/১৬)

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

"আর তোমাদের রব (আল্লাহ্) বলেন : তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়ায় সাড়া দেব তথা দোয়া কবুল করব।" (সূরা : গাফের : ৪০/৬০)

www.pathagar.com

আর পিতা-মাতা পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। দোয়া ভালবাসা স্থাপন এবং কল্যাণমূলক ও সুন্দর সম্পর্কের মাধ্যম। কারণ, দোয়ার মধ্যে আবেগ-প্রবণতা ও অনুভূতির অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

তাই মানুষের কল্যাণ কামনা করে, মানুষের ভালবাসায় এবং বিপদের মহাসমুদ্রে যে অবস্থান করছে তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দোয়া করবে। আবার দোয়া করবে নিজের সংশোধন ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রথমে নিজের গোনাহের জন্য তাওবা করবে এবং সাথে সাথে নেক কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করবে। এরপর আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য দোয়া করবে, এভাবে ব্যক্তি দোয়া কবুলের যোগ্য হতে পারে।

এমনিভাবে বিপদগ্রস্থ বাবা-মা ও নেককার লোকের দোয়া এবং অসহায় অভাবীর ফরিয়াদ ও প্রার্থনা তাৎক্ষণিকভাবে কবুল হয়। আবেগ-অনুভূতি সহকারে বড় ধরনের বিপদ-আপদে দোয়া করলে আল্লাহর ইচ্ছায় সেই দোয়া কবুল হয়।

পেশাগত কারণে দোয়া ও ঝাঁড়ফুঁক করলে এটা কুসংস্কার ও শিরক চর্চার দিকে ধাবিত করে। এটা তাওহিদ, তাকওয়া, আল্লাহ্‌র সুন্নাহ পদ্ধতি, কর্মের দায়িত্ব এবং চেষ্টা ও তাওয়াক্কুলের প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। বর্তমানকালে আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, বহু দেশে এবং অনেক মানুষের নিকট এ কুসংস্কার চালু আছে। এ কুসংস্কারকে অনেক মানুষ– এমনকি অনেক আলেমও ভাল নিয়তে গ্রহণ করে নিয়েছে। কেউ কেউ মিথ্যা, বানোয়াট, জাল, কল্পকাহিনী, প্রাচীন কিংবদন্তী ও ঈসরাইলী বর্ণনার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করেন। এ অপব্যাখ্যা পূর্ববর্তীদের থেকে আসা ভুল তাফসির দর্শন ও আক্বিদা বিশ্বাসের অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় অনেকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

হ্যাঁ, যদি মুসলিম সমাজে জ্ঞান ও গবেষণামূলক সঠিক ইসলামী পদ্ধতি মেনে চলা হতো তাহলে তাদের মাঝে কুসংস্কার চালু হতে পারত না, উম্মাহর চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিতে নেতিবাচক চিন্তা অনুপ্রবেশ করত না এবং উম্মাহর সন্তানদের নিকট আজ আল-কুরআনের অপব্যাখ্যা ও ভুল তাফসির চালু হতো না।

আল-কুরআনের আয়াত ও এর ব্যাখ্যাকে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহতকরণ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে জানতে হবে মহানবী ﷺ এর জীবন চরিত। কারণ, মহানবী ﷺ ছিলেন বাস্তব কুরআন। সুতরাং আল-কুরআন অধ্যয়ন এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা উম্মাহর সম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে। কারণ, এ মহাগ্রন্থে মুসলিম উম্মাহর জন্য সকল সমস্যার সমাধানসহ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার দিক নিদর্শনা রয়েছে।

www.pathagar.com

উম্মাহর চিন্তার পদ্ধতি অপূর্ণাঙ্গ। তাই যেসব দর্শন আল্লাহর বিধানের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এমন দর্শন অনুকরণ-অনুসরণ করা অযৌক্তিক। এরূপ দর্শন কোন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে না। সময় ও কাল অনুযায়ী বাস্তব সমাধানের লক্ষ্যে কোন উপযুক্ত পদ্ধতি না থাকা এবং সকল চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়ায় আপনি কুরআন-সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা, মিথ্যা, বানোয়াট, প্রাচীন কিংবদন্তী, কল্পকাহিনী ও ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে মুক্ত থাকার কোন পথ পাবেন না।

কুসংস্কারমূলক চিন্তা ও এধরনের গ্রন্থাদি চালু করা দীনি সভ্যতার পরিপন্থী :

বর্তমানকালে উম্মাহর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সামনে ইলম, আমল, চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কর্মের উপকরণ গ্রহণ এবং দায়িত্ব পালনের প্রতিবন্ধক কিছু চালু করা সামাজিক, ধর্মীয় ও চিন্তাগত রীতি-নীতির পরিপন্থী।

এছাড়া পূর্ণ এখলাস ও সহিহ নিয়ত থাকা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী যুগসমূহের কোন কোন গ্রন্থ প্রচার ও প্রসার করা পশ্চাতপদতা ও কুসংস্কারমূলক সাহিত্য প্রচারের শামিল। দীনের নামে এসব গ্রন্থাদি গবেষণা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ না করে প্রচার ও প্রসার করা অন্যায়। এসব গ্রন্থে মিথ্যা ও কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ। এতে কিছু কিছু এমন বিরল ঘটনাবলী পাওয়া যায়, যা সুস্থ অনুভূতিকে প্রতারিত করে। মুসলিম সুস্থ বিবেকের একান্ত দাবি হলো গ্রন্থাদি রচিত হওয়া চাই এমন সংখ্যক বিশেষজ্ঞ দ্বারা, যাদের গবেষণা ও বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা রয়েছে।

অতীতে এমন অনেক রচনা ও লেখনি রচিত হয়েছিল যেগুলোতে কোন জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণাধর্মী আলোচনা ছিল না। ইসলামের শত্রুরা ওহির জ্ঞানের সাথে কুসংস্কার, মিথ্যা, বানোয়াট ভিত্তিহীন, অবাস্তব ও কল্পকাহিনীর চিন্তা যুক্ত করেছে। এতে ইলমে ওহির প্রাণশক্তি ধ্বংস হয়ে যায়।

উম্মাহকে তাদের আক্বিদা ও বিশ্বাস এবং সহিহ জ্ঞানকে রক্ষা করার জন্য এ ধরনের ক্ষতিকারক চিন্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচতে হবে। অজ্ঞ, হীন ও নীচদের থেকে দূরে থেকে বিশেষজ্ঞদের থেকে ইসলামী মূল্যবান উপকরণ ও ইলমে ওহিকে সংরক্ষণ করতে হবে।

জ্ঞানের মাধ্যমে জাতি উন্নতি লাভ করে, কুসংস্কারে নয়

যাদুকরদের যাদু ও ধাঁধা ও কুসংস্কারবাদীদের কুসংস্কারমূলক প্রচেষ্টা জাতিকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করাতে পারে নি। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীল শক্তির মাধ্যমে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের উচিত উম্মাহর বিভিন্ন যুগের অবস্থা ও পরিস্থিতি এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক স্তরসমূহ খতিয়ে দেখা। অবশ্য স্থান, কাল, সময় ও যুগের সংস্কৃতির সাথে অনেক ইতিবাচক আলোচনা সাদৃশ্য রাখে। এজন্য বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা না করা এবং তুরাছী বা পূর্ব থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে ঐ অবস্থায় রাখার চেষ্টা করা এক ধরনের অজ্ঞতা ও গাফিলতির সামিল। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে- لكل مقام مقال 'স্থান বুঝে কথা বলতে হয়'। কিন্তু উম্মাহর অতীত প্রজন্মদের মাঝে একটি ভুল পরিলক্ষিত হত। তারা বর্ণনা, প্রচার ও প্রকাশ এবং গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে ভুল করত। আজকের বিশ্বে ও পূর্ব থেকে আসা বিষয়কে পবিত্র মনে করার অজ্ঞতা বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং আজ উম্মাহর সন্তানদের মাঝে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করতে হবে। অজ্ঞতা, মূর্খতা ও কুসংস্কার জাতির দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও কষ্ট-দুর্গতি বৃদ্ধি করে। তাই এ অবস্থা থেকে উম্মাহকে রক্ষা করতে হবে। উম্মাহর চিন্তাশীল ও আলেম সমাজের উচিত হবে, তারা যেন অপূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিগত জালে আটকে না পড়েন। বরং তাদেরকে সকল বিভ্রান্তির সংস্কারের লক্ষ্যে গোটা উম্মাহকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শিশু গঠনের মূলে অভিভাবকদের সচেতনতা

শিশুদের গঠন করতে হলে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশু গঠন করার ক্ষেত্রে অভিভাবকবৃন্দ অপূর্ণাঙ্গ কোন পদ্ধতি কিংবা অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত থাকবেন।

এ পর্যায়ে দু'একটা উদাহরণ উপস্থাপন করে বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলা যায়।

আমার যতটুকু মনে পড়ে- মক্কার মায়েরা অন্যান্য দেশের তুলনায় শিশু ও ভবিষ্যত প্রজন্মের ব্যাপারে অধিক মতামত বিনিময় করতেন। তারা পরিবেশ, পরিস্থিতি, সংস্কৃতি ও পুরনো ঐতিহ্য নিয়েও মত বিনিময় করতেন। তারা শিশুর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অধিক আগ্রহী ছিলেন। তারা বলতেন :

إن في كل ثمرة رمانه حبه من الجنة

"প্রতিটি ডালিম ফলের মধ্যে রয়েছে জান্নাতী দানা"। শিশুদের এ ফলে আগ্রহ জন্মানোর জন্য কুসংস্কারমূলক কথাটি বলতেন। কোন বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি ও আগ্রহ জন্মানো ভাল, তবে কুসংস্কারমূলক চিন্তা সৃষ্টি করা ভাল নয়। কারণ, শিশুর মাথায় একবার কুসংস্কারমূলক চিন্তা ঢুকলে তা থেকে ফেরানো যাবে না। এতে ভীষণ খারাপ প্রভাব পড়বে। অনেক এমন অজ্ঞ মা রয়েছেন যারা শিশুদের জ্বিন ভূতের ভয় দেখান। যাতে তারা রাতের অন্ধকারে বাড়িতে বাইরে না যায়।

www.pathagar.com

কখনো কখনো সমাজের পরিবেশ খারাপ হতে দেখা যায়। পরিবেশগত কারণে কোন কোন মা এক শহর থেকে অন্য শহরেও যেতে দেখা যায়। কারণ, তারা জানেন, দুষ্ট ছাত্র, চোর, ডাকাত ও দস্যুদের পরিবেশ অবশ্যই মানবরূপ শয়তানের পরিবেশ।

এ পরিবেশ থেকে দূরে থেকে নিরাপদ পরিবেশে এসে শিশুদের মনোবৃত্তি তৈরি করা দরকার।

সমাজের পরিবেশ খারাপ হওয়ায় অনেক মায়েরা তাদের শিশুদের নিরাপদ রাখতে রাতের অন্ধকারে শিশু সন্তানদের বাড়ি থেকে বের হতে ভয় দেখান। বলেন : দেখো! রাতের অন্ধকারে বাইরে জিন, ভুত থাকে। এরা মেয়েদের মত বোরকা পরিধান করে। এরা অন্ধকার রাতে রাস্তার অলিতে গলিতে ঘুড়ে বেড়ায়। এদের পাগুলো কিন্তু মানুষের পায়ের মত নয়- গাঁধার পায়ের মত। এদের পা ক্ষুরবিশিষ্ট। সত্যি সত্যি যদি রাতের অন্ধকারে কোন শিশুকে যদি বাইরে আসতে বাধ্য করা হয়, তাহলে কীরূপ অবস্থা হবে। এসব ভীতিপূর্ণ কুসংস্কার থেকে সর্বদা শিশু মনকে রক্ষা করতে হবে। কারণ, এ ধরনের শিক্ষা শিশু মনে ভীতি ও কাপুরুষতা সৃষ্টি করে।

হ্যাঁ, শিশু একদিন বড় হয়ে জানতে পারবে রাতের অন্ধকারে এসব জিন-ভুত বলতে আসলে বাস্তবে কিছু নেই। তারপরও শিশুকালের মনের ভীতির প্রভাব বড় হবার পরও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষতঃ যখন রাতে একাকী থাকে। মেঘের গর্জন, ঘূর্ণিঝড়ের শব্দেও সে ভয় পায়। তাই শিশু মনে এ ধরনের ভীতি ঢুকানো থেকে অভিভাবকগণ সতর্কে থাকবেন।

আমি আলেম সমাজ ও চিন্তাশীলদেরকে আহ্বান করবো যে, আপনারা কুসংস্কারমূলক চিন্তার দূষণ ও বিভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকেসহ উম্মাহকে বাঁচাবেন এবং পদ্ধতিগত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবেন। এ পর্যায়ের সম্মানিত পাঠকদের সামনে কাঙ্ক্ষিত সমাধানমূলক কতিপয় মৌলিক কেন্দ্রীয় বিষয় উপস্থাপন করবো।

এ কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো গবেষণার ক্ষেত্রে আবশ্যক হয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মিশন তা নিয়ন্ত্রণ করে। তাওহিদ বা একত্ববাদের বিশ্বাস, প্রতিনিধি নিয়োগ, মানব জীবনের চূড়ান্ত কল্যাণ, আমল বা কর্ম সম্পাদনের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন এবং মহাজগত সম্পর্কিত কর্মের উপকরণ গ্রহণের বিধান অনুযায়ী পৃথিবীতে চেষ্টা ও কর্ম পরিচালনা করতে হয়।

মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

১. এ পার্থিব জগত কর্মের উপকরণ গ্রহণের জগত।

২. শয়তান ও তার বংশধর অদৃশ্য জগতের। জিন জাতি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে মানুষের উপর তাদের কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা নেই।

www.pathagar.com

৩. যাদু ও কুসংস্কারমূলক কাজ অপকৌশল ও কু-ধারণার সামিল।

৪. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মিশন আন্তর্জাতিক মিশন। এ মিশনে মানুষের শিশু জগত থেকে সুক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ও অজানা জগতের গোপন তথ্যাদি ও বাদ যায় নি।

৫. কুসংস্কারবাদী, মিথ্যাবাদী ও যাদুবিদগণ বাস্তবে কোন কিছুর উপকার করতে পারে না ঠিক কিন্তু তাদের নিকট থাকে সম্পদ লুফে নেয়ার শত শত কৌশল।

৬. সহজভাবে আবশ্যিক দায়িত্ব পালন।

৭. প্রতিটি গবেষণার চূড়ান্ত ফল হলো অবশ্যই বাস্তবতায় পৌছতে হবে। কুসংস্কারবাদী, মিথ্যাবাদী ও যাদুবিদরা ধোঁকা ও কুধারণা সৃষ্টি করে কোন মানুষের ক্ষতিও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এদের কাজ ক্ষতিকারক ও কুফরি।

যা হোক উম্মাহকে ইসলামী আক্বিদা ও বিশ্বাস, চরিত্র ও মূল্যবোধের বিপরীতমুখী বিষয়কে ভালভাবে বুঝতে হবে এবং জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও চারিত্রিক শক্তিতে সজ্জিত হতে হবে।

৬ষ্ঠ বিভ্রান্তি : গোত্রিক গোঁড়ামি

আমি পবিত্র মক্কায় বসবাস করার সুবাদে সেখানে বিভিন্ন পেশার ও শ্রেণীর লোকজনের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়। বাইতুল্লাহর প্রতিবেশী ও আশপাশের সকল লোককে আমার আপন মনে হয়েছে। আমার মন থেকে কাউকে আলাদা করার সুযোগ ছিল না। আমার শৈশব স্মৃতি মনে পড়ছে। তখন আমি সেই ছোট্ট শিশু ছিলাম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তেলাওয়াত করছি, বাড়িতে, মাদ্‌রাসায় ও আল্লাহ্‌র ঘরে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অনেক হাদিসও অর্থসহ পড়েছি।

আল-কুরআনের সেই আয়াতগুলোতে একত্ববাদ, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সদাচারণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আয়াতগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়ে অধ্যয়ন করলে গোত্রিক গোঁড়ামির অবসানের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এসব আয়াতগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আল্লাহ বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾

www.pathagar.com

"হে মানবজাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সহধর্মিনীকে এবং উভয় থেকে বিস্তার করে দিয়েছেন অসংখ্য নর ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে পরস্পর পরস্পরের নিকট দাবি পেশ করে থাক এবং আত্মীয়-সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি কড়া নজর রাখেন।" (সূরা নিসা : ৪/১)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নর ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদেরকে আমি বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে অধিক আল্লাহ ভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয় জানেন এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।" (সূরা হুজুরাত : ৪৯/১৩)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾

তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ ও জমিন সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। নিঃসন্দেহে এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রোম : ৩০/২২)

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾

যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবে, তাহলে তোমরা ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচার-ফায়সালা করবে।

(সূরা নিসা : ৪/৫৮)

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾

যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। (সূরা আল-আনয়াম : ৬/১৫২)

﴿فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

www.pathagar.com

তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্‌র জন্য ন্যায়সঙ্গত স্বাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয়, তবুও।(সূরা নিসা : ৪/১৩৫)

﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ﴾

এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখন ও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই আল্লাহ ভীতির অধিক নিকটতম পন্থা। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (সূরা মায়েদা : ৫/৮)

মহানবী ﷺ বলেছেন-

كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى

لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم

يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا

لوان فاطمة بنت محمد شرفت لقطعت يدها

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تراعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

তোমরা সবাই হযরত আদম (عليه السلام) থেকে এসেছে। আর হজরত আদম (عليه السلام) মাটি থেকে সৃষ্টি। তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির গুণ ব্যতীত আরবী ব্যক্তি অনারবিয় এবং আজমী ব্যক্তি আরবির উপর কোন মর্যাদা বা প্রাধান্য নেই।

লোকজন তাদের আমল নিয়েও আমার নিকট উপস্থিত হবে না আর তোমরা তোমাদের বংশধর নিয়েও আদায় নিকট উপস্থিত হবে।

হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট কোন কিছুর সুপারিশ করতে পারবো না। "যদি মুহাম্মদ-কন্যা ফাতিমা ও যদি চুরি করত, অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম"।

www.pathagar.com

এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে অন্য ভাইয়ের প্রতি যুলুম করবে না, তাকে বিপদে সমর্পন করবে না। আল্লাহর কোন বান্দাহর সাহায্যে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকেন যতক্ষণ কোন বান্দাহ তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।

'এক মুসলিম অন্য মুসলিম ভাইয়ের ভবন স্বরূপ, ভবনের কিছু অংশ অপর অংশের সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে।

পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া-ইহসানের ক্ষেত্রে মুমিনগণ একটা দেহের ন্যায়। দেহের একটা অঙ্গ আক্রান্ত হলে পুরা দেহ রাত্রি জাগরণ ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।

একজন শিশু আয়াতসমূহ ও হাদিসগুলোর অর্থ জানলে তার মধ্যে কখনো গোত্রিক গোঁড়ামি থাকবে না। এমনকি যখন একদিন ঐ শিশু বড় হবে, পবিত্র হারাম শরিফসহ সমগ্র আরব ঘুরে বেড়াবে, ঘুরে বেড়াবে আরব, আজম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। পৃথিবীর যেখানেই গোত্রিক গোঁড়ামি দেখতে পাবে, তখন সে মুসলিম উম্মাহর ট্রাজেডি বা মর্মান্তিক বাহিনীর কথা উপলব্ধি করতে পারবে। চিন্তা করবে, উম্মাহ ইসলামের মিশন, ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামের প্রাণশক্তি থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ দীন এসেছে মানবতার মাঝে ঐক্য সৃষ্টির মিশন নিয়ে। পারস্পরিক দয়া ও ইহসান, ন্যায় ও ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শিক্ষা নিয়ে আবির্ভাব ঘটেছে এ জীবন ব্যবস্থার। মানুষ মানুষের সহমর্মিতায় অংশ নেবে। পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে। ইসলামী মিশন ধারণকারী সন্তানগণ এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকেন।

আল্লাহ বলেন-

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং তাদের পূর্বে ঈমান এনেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভাল ভাসেন, মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে, সে জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।"

সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের জঘন্যতম খারাপ দূষণ

জাহেলী সাম্প্রদায়িকতা ও স্বজনপ্রীতি এবং ইসলামী আত্মীয়তার সম্পর্কের মধ্যে আমাদেরকে পার্থক্য করতে হবে। জাহেলী সাম্প্রদায়িকা ও স্বজনপ্রীতিতে এক ধরনের পশুত্ব ও

www.pathagar.com

গোঁড়ামি স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। আর ইসলামী আত্মীয়তার সম্পর্ক হলো পারস্পরিক দয়া ও ইহসান, দান, ব্যয়। এখানে যুলুম ও বিপর্যয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রিক গোঁড়ামির মধ্যে রয়েছে, পারস্পরিক অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা, হিংসা-বিদ্বেষ যুলুম-নির্যাতন। ইসলাম এসব সাম্প্রদায়িক কলহ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পাশাপাশি এসবের পরিবর্তে ন্যায় ও ইসনাফ ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের নির্দেশ দিয়েছে।

আল-কুরআনে এসেছে-

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾

﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾

"তারা নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে।"

(সূরা হাশর : ৫৯/৯)

"যদিও নিকটতম আত্মীয়-স্বজন হোক"। (সূরা আল-মায়িদা : ৫/১০৬)

ইসলাম আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক ও সদাচারণের আহ্বানের মাধ্যমে মানব সম্পর্ককে আরো দৃঢ় ও মজবুত করেছে। সমাজে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালবাসার প্রসার ঘটানোর নির্দেশ দিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক দয়া ও ইহসানের। এতে যুলুম-নির্যাতন অহমিকা ও শত্রুতার কোন স্থান নেই। সাম্প্রদায়িক কলহ ও গোত্রিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত খারাপ ও বিপজ্জনক। কারণ, এটা খোলাফায়ে রাশেদার রাষ্ট্রের ভিতকে পর্যন্ত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। গোটা উম্মাহর চিন্তা ও সংস্কৃতিতে দূষণ সৃষ্টি করেছে। এতে উম্মাহর মাঝে পারস্পরিক অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। উম্মাহ বিভিন্ন দল ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এরূপ সাম্প্রদায়িক কলহ ও গোত্রিক গোঁড়ামি ঈমান ও তাকওয়া পরিপন্থী কাজ।

আল্লাহ বলেন-

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে অধিক আল্লাহ ভীরু বা তাকওয়াবান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবজ্ঞ ও সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।" (সূরা হুজরাত : ৪৯/১৩)

আমরা যখন উম্মাহর ঐক্য ও ইসলামের প্রাণশক্তিকে ফিরিয়ে আনতে চাই, তাহলে অবশ্যই উম্মাহর সন্তানদের সংস্কৃতি আক্বিদা ও বিশ্বাসকে সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রিক গোঁড়ামির দূষণ থেকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ﴾

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, উপহাস যেন না করে কোন লোক কোন লোকের, হতে পারে তারা উত্তম ওদের থেকে।"

(সূরা হুজরাত : : ৪৯/১১)

সাম্প্রদায়িতা ও গোত্রিক গোঁড়ামি মূলত ইসলামী দর্শন ও মূল্যবোধ বিভ্রান্তির ঘৃণিত রূপ। এতে পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব উম্মাহর সন্তানদের এ সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রিক গোঁড়ামি থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখার জন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে।

হক ও আলোর জগত এবং অন্ধকার ও অদৃশ্য জগত

এমন কোন শক্তি নেই যা হক ও আলোর জগত এবং অন্ধকার ও অদৃশ্য জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য বিধান করতে পারে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন শক্তি প্রয়োগ করে পার্থক্য করা যায়।

এ শক্তি কি হক না বাতিলের?

কল্যাণ না অকল্যাণের?

ইনসাফ না জুলুমের?

পারস্পরিক দয়া না নির্যাতনের?

ভ্রাতৃত্ব না অনৈক্যের?

সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব করবে না- এক সৃষ্টি অপর সৃষ্টির দাসত্ব গ্রহণ করবে?

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন কল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় হক বাতিল, কল্যাণ-অকল্যাণ, ইনসাফ-যুলুম, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও বিচ্ছিন্ন এবং আলো ও অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিধান করেছে।

বিশ্বজনীন মানব সমাজের এ যুগে মানুষে মানুষে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও ভালবাসার বন্ধন– এটা বিশ্ববাসীর সর্বশেষ হেদায়েত ইসলামী মিশনের মূলকথা। ইসলামের যে কোন ভূখণ্ডে কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেবল পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব এবং দয়া ইহসানের মাধ্যমে। মূলত এ উম্মাহ্ একে অন্যের কল্যাণ কামনা করবে এজন্যই উম্মাহকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন-

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا﴾

"তোমরা উত্তম জাতি! তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণে উদ্ভব ঘটানো হয়েছে (সৃষ্টি করা হয়েছে)। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহর প্রতি মজবুত ঈমান রাখবে।"

(আলে ইমরান : ৩/১১০)

"তোমরা এ একটিমাত্র উম্মাহ। আর আমি তোমাদের বর। সুতরাং তোমারা আমার ইবাদত কর।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ২১/৯২)

"মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরা হুজরাত : ৪৯/১০)

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান-৩/১০৩)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সত্যই বলেছেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ

"হে ব্যক্তি স্বজনপ্রীতির দিকে আহ্বান করে যে, আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি স্বজনপ্রীতির জন্য সংঘর্ষ বা যুদ্ধ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে ব্যক্তি স্বজনপ্রীতির উপর মারা যায় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[3]

যখন আমরা উম্মাহর পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য ও তাদের অনুভূতি ফিরিয়ে আনাসহ তাদের ঈমান-আক্বিদা, তাওহিদ, ন্যায় ও ইনসাফ এবং শক্তি ও সাহসিকতাকে নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই ; তাহলে অবশ্যই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় করতে হবে এবং সাম্প্রদায়িকতা ও স্বজনপ্রীতি থেকে উম্মাহর শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে মুক্ত করতে হবে।

---

[3] সুনানে আবু দাউদ ঃ ৪৪৫৬।

www.pathagar.com

অতএব মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের মাঝে ঐক্যের দর্শন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। আমাদের চিন্তাশীল ও অভিভাবকদের মূল কর্ম তালিকা থেকে জাহেলী সাম্প্রদায়িকতা, স্বজনপ্রীতি ও গ্যোত্রিক গোঁড়ামির জীবাণু দূর করতে হবে। কারণ এ সাম্প্রদায়িকতা ও স্বজন প্রীতিই সকল বিপর্যয়, স্বৈরাচার, পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন, দুর্বলতা, সংঘাত ও অনৈক্য সৃষ্টির প্রধান কারণ।

আল্লাহ বলেন :

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ (يونس: ١٠/١٠٨)

"(হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন,) হে মানবজাতি। অবশ্যই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হক (সত্য) তোমাদের নিকট পৌঁছে গেছে। সুতরাং যে কেউ সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়, সে পথ প্রাপ্ত হয় নিজের কল্যাণের জন্যই। আর যে কেউ সঠিক পথ হারায়, সে নিজের অকল্যাণের জন্যই পথ হারায়।" (সূরা ইউনুস : ১০/১০৮)

উম্মাহর সুস্থ মানসিকতা গঠনে চিন্তাগত কুসংস্কারের প্রভাব

ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও নির্বাচিত চিন্তাশীলদের মাঝে সংঘাতের প্রভাব থেমে থাকে নি। নির্বাচিত চিন্তাশীলদের পারস্পরিক অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতাও এ সংঘাতের সৃষ্টির জন্য দায়ী। তারা বাস্তব অনুশীলন থেকে দূরে থাকা-সহ সমাজ পরিচালনা বিষয়ে অপূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিমজ্জিত থাকেন।

উম্মাহর সন্তানদের ব্যক্তিগত বিষয়ে কেবল গুরুত্ব দিলে চলবে না, বরং সামাজিক দর্শনের মৌলিক পরিবর্তনের জন্য নির্বাচিত চিন্তাশীলদের এগিয়ে আসতে হবে এবং পারস্পরিক রাজনৈতিক সংঘাত এড়িয়ে উম্মাহর সুস্থ মনোবৃত্তি ও মানসিকতা গঠনে এগিয়ে আসতে হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে শুধুমাত্র ঈমান আনলেই পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। বরং পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য প্রয়োজন বাস্তব আমল। এটাই রেসালতের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। অথচ আরব্য কতিপয় বেদুঈন এ শিক্ষার দুর্বলতার কারণে রেসালাতের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি অনুসরণ না করেই তথা বাস্তব আমল না করেই ঈমানদার হওয়ার দাবি করেছিলেন তখন আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। আর ওহির পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা ও শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণেই খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদ, বিপর্যয় ও অপ্রত্যাশিত

www.pathagar.com

ঘটনাবলী খেলাফত নামক রাষ্ট্রটির পতন ঘটিয়েছিল। পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক কলহের অংশ হিসেবে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[4]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আরব্য বেদুঈনদের আচার-আচরণ, সভ্যতা, তাদের ঈমানী ও শিক্ষাগত দুর্বলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করলেই পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য প্রয়োজন বাস্তব আমল। আর বাস্তব আমলের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা গ্রহণ ও সুস্থ মানসিকতা তৈরি।

আল্লাহ বলেন-

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاً وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (٨) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩) لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاً وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢) أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾

[4] Habibul. Said "A Historical Survey of Land Tenure and land Revenue Administration in some Muslims countries, with special reference to Persia, in the contemporary Aspects of Economic and Social Thinking in Islam. The Muslim students Association of USA and Canada. Planfied. ind, USA. 1970.

www.pathagar.com

﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ﴾

"বেদুঈনগণ বলল : আমরা ঈমান এনেছি। (হে নবী ﷺ আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি কিন্তু তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নি।" (সূরা হুজরাত : ৪৯/১৪)

"বেদুঈনরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন।" (সূরা তাওবাহ : ৯/৯৭)

"মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রাসূলের নিকট কীভাবে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদে হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য ঠিক থাকে, তোমরাও তাদের জন্য ঠিক থাক। নিঃসন্দেহ আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

কীরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না, তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।

তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলছে তা অতি নিকৃষ্ট।

তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী। অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই। আর আমি বিধানসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকি।

আর যদি তারা তাদের শপথ ভঙ্গ করে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পর এবং তারা বিদ্রূপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে, তাহলে কাফির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধ কর। কারণ, তারা এমন যে, তাদের কোন শপথই নেই। হয়তো তারা (শপথে) ফিরে আসতে পারে।

তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা ভঙ্গ করছে নিজেদের শপথ এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েছে রাসূলকে বহিষ্কারের। আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে।" (সূরা তাওবা : ৯/৭-১৩)

"যাদের সাথে আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন, অতঃপর তারা প্রতিবারই তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। এরা (প্রকৃত পক্ষে) আল্লাহ ভীরু নয়।"
(সূরা আল-আনফাল : ৮/৫৬)

www.pathagar.com

এজন্য ইসলাম শিক্ষা দানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে এবং বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু রোম ও পারস্যের সামরিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় তা বাস্তবতার মুখ দেখে নি।

এভাবে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগতভাবে রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা ব্যবস্থায় অবহেলার ছাপ-সহ সামাজিক ও মানবিক জ্ঞানের চিন্তা ধারায় গুরুত্বহীনতা লক্ষ্য করা যায়। এ অবস্থার কারণে শিশু-শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বিনষ্ট হয়। এভাবে মুসলিম ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা স্বৈরাচার, সন্ত্রাস এবং অপূর্ণাঙ্গ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত থাকার কোন সুযোগ হয়ে উঠে নি। তাই মুসলিম ব্যক্তিত্ব বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার চর্চা মোকাবেলার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

এ অবস্থায় শিশুর মন বুঝা, শিশু গঠন, তাকে শিক্ষা দেয়ার জ্ঞান, তার সংস্কৃতির ধরন বুঝা এবং তার বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছাশক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ পর্যন্ত উম্মাহ, সংস্কার ও পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টায় সফল হয় নি। অথচ একই সময়ে আধুনিক ইউরোপে নতুন লিবারেল ধর্মনিরপেক্ষ মহাজাগতিক দর্শনের আলোকে তাদের পুনঃজাগরণ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। তারা যোগ্যতার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞানসম্মত দক্ষতার আলোকে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদান গবেষণাধর্মী পদ্ধতি চালু করতে সক্ষম হয়েছে

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুই যাত্রা পথের ভিত্তি

আমরা ইতিপূর্বে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির অগ্রযাত্রার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং তাদের উপর ধারাবাহিকভাবে আরোপিত কুৎসা রটনা ও বিকৃতি সম্পর্কে যে তত্ত্বের অনুসন্ধান করেছিলাম, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বকালের জন্য ইসলামের যে অবদান রয়েছে তা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। মানবতা সংক্রান্ত ইসলামের রীতি-নীতি চিরকালের জন্য কার্যকর। সময় ও কালের গতির পরিবর্তনের কারণে একটু তারতম্য হলেও ইসলাম তার গতিপথে রয়েছে অটল-অনড়। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরও ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী, আকাঈদ, ও মূল্যবোধ ব্যাক্তির অস্তিত্ব সুরক্ষায় ও চাহিদা পূরণে বদ্ধপরিকর এবং সকল সমস্যা সমাধানে সহায়ক। ইসলাম তার শক্তি-সামর্থ্য, সঠিক মূল্যবোধ ও সুউচ্চ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘকাল থেকে জাহেলী যুগের মূর্তিপূজক ও তাদের অনুসারীদের মোকাবেলা করে আসছে। অজ্ঞতা, মূর্খতা আর অন্ধকারে নিমজ্জিত অনেক জাতি গোষ্ঠীকে শিক্ষা ও হেদায়াতের পথ দেখিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। যে জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, শক্তি, ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ, সভ্যতা-সংস্কৃতির চর্চা এবং উন্নতি অগ্রগতির জন্য মুসলিম মনীষী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন প্রকারের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। নতুন নতুন পদ্ধতি-পন্থা আবিস্কার করেছেন। যেখানেই তারা ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে পেরেছেন, সেখানেই রাষ্ট্রীয়ভাবে মানবতা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার বাস্তব চিত্র আজও এ পৃথিবীতে বিদ্যমান। এসব কিছুর মূলমন্ত্র ও পরিবর্তন, পরিবর্ধনের রূপকার একমাত্র ইসলাম। বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের যে গৌরব-উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। গ্রিক অধিবিদ্যার ও দর্শনের উত্তরাধিকারী হয়েছিল মুসলিম জাতি, যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এদের অবদান ছিল সুদূর-প্রসারী। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম জাতি তাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে, যার ফলে পিছিয়ে পড়েছে, সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির শিখরে পৌছুতে আজ তারা অক্ষম।

আমাদের উচিত, মুসলিম জাতির দুর্বলতা অক্ষমতা ও পশ্চাদপদতার কারণগুলো খুঁজে বের করে তার যথাযথ ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে, সমাধান পথ খুঁজে বের করে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির অগ্রগতির পথ সুগম করা। বিশেষ করে বর্তমান যুগের বিভিন্ন

www.pathagar.com

জাতি, গোষ্ঠীর নানা ধরনের চ্যালেঞ্জর মোকাবেলায়, বিদ্যমান পরিস্থিতি ও সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে অবশ্যই আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হবে এবং সমস্যা ও সংকট চিহ্নিত করে তা নিরসনের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

অবশ্যই বর্তমানে অনেক আলেম উলামা মুসলিম মনীষী, গবেষক, ও চিন্তাবিদগণ অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, মুসলিম উম্মাহ্‌র মৌলিক বিষয়াবলীর মধ্যে মারাত্মক ক্ষতি সাধন হয়েছে, যার কারণে মুসলিম উম্মাহর এত দুঃখ, দুর্দশা, অনৈক্য বিচ্ছিন্নতা ও অবনতি এসেছে। তাই আমাদের অবশ্যই এ সকল পরিস্থিতি ও অবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্‌র হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে এবং ইসলামী সংশোধিত স্থানকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে।

ইসলামী সংস্কার আন্দোলন ও তার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা সংস্কার, পরিশোধন ও পুনর্গঠনের অনেক উদ্যোগ দেখতে পাই। যুগে যুগে যে সকল মুসলিম রাজা-বাদশাহ, নেতৃবৃন্দ ও আলেম-উলামা সংস্কার ও সংশোধনের আন্দোলন করে অশেষ অবদান রেখেছেন। তাদের শীর্ষে রয়েছেন আবু হামিদ আন-গাজ্জানী (৫০৫-১১১২) ও তার সংস্কার আন্দোলন। তার আন্দোলনের লক্ষ ছিল, গ্রিক দার্শনিক চিন্তা-চেতনা থেকে মুক্ত করে ইসলামী চিন্তা-চেতানার অগ্রগতি সাধল। কারণ, গ্রিক দর্শন ও চিন্তা-চেতনা ইসলামী চিন্তা চেতনাকে, নষ্ট ও স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো অনর্থক, অবৈধ, আমার, অর্থহীন যে বিষয়গুলোর প্রতি গ্রিক দর্শন মুসলমানদের আকৃষ্ট করেছিল। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যকে বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের সজীব বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তা চেতনাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ইমাম গাজ্জালীর ও প্রয়াস ও প্রচেষ্টা ইসলামিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও মুসলিম চিন্তা-চেতনা, বিবেক বুদ্ধি গ্রিক দর্শনের কুৎসা ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছে। ইসলামী শরিয়ত কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রতিশ্রুতিকে তাক্‌ওয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল করেছে। ইসলামিক দিক নির্দেশনাকে গ্রিক ও ইসলামী অধিবিদ্যার দর্শন থেকে মুক্ত করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার এ আন্দোলনের পুর্ণরূপে সফলতা অর্জন করতে পারে নি। কারণ, তার এ আন্দোলন নিখুঁত ইসলামী কার্যপ্রণালী অনুযায়ী পরিচালিত ছিল না। তার এ সংস্কার আন্দোলন শুধুমাত্র চিন্তা গবেষণার মধ্যেই সীমিত ছিল। যার কারণে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা ও মৌলিক চিন্তা-ধারার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি।

www.pathagar.com

ইমাম গাজ্জালীর পর যে সকল চিন্তাবিদ গবেষক ও সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের মধ্যে রয়েছেন শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দীন আহমেদ ইবনে তাইমিয়াহ, (৭২৮হিঃ ১৩২৮ খ্রিঃ) ইমাম আলী ইবনে আহমদ ইবনে হাজম, আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে খানদুন (১৪০৬ইং) প্রমুখ।

তেমনিভাবে জিনকী সম্প্রদায়ের (آل زنكي) সম্রাটগণ এবং সালাহ উদ্দীন আয়্যুবীকে সেই মনীষীদের মধ্যে গণ্য করা হয়, যারা সংস্কার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের এ সংস্কার আন্দোলন ও জাতির পুনর্গঠনের সংগ্রাম মুসলিম উম্মাহ্র আত্মিক, মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। যার কারণে তারা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত ও অপদস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং পৃথিবীতে, শান্তি-শৃঙ্খলার ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট ছিল।

অপরদিকে যখন তুরস্কের বিভিন্ন শক্তিশালী গোত্রের লোকজন দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করতে শুরু করল, তখন ইসলামের নতুন প্রাণ সঞ্চালন হয়ে বিভিন্ন স্থানে ইসলামের বিজয়ী পতাকা উদিত হতে লাগল। প্রতিষ্ঠা হলো উসমানী সম্প্রদায়ের শাসন, প্রচলিত হলো ইসলামী আইন, বিস্তার লাভ করল শান্তি, শৃঙ্খলা আর নিরাপত্তা। এমনকি পূর্ব ইউরোপের মানবিক সংগঠনগুলো ইসলামের বিজয়ী পাতাকা উড্ডীন রাখতে সক্ষম হলো। আরবের প্রতিবেশী দেশ সমূহে নিদ্রা আর নিশ্চলতা এবং স্পেনে বিভাজন, খুনোখুনি আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বিজয়ী পতাকা ও সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বে নেমে আসে অবনতি, অবক্ষয়, আর বিপর্যয়, ইউরোপিয়ানদের শক্তি, সামর্থ আর বীরত্বের সামনে থুবড়ে পড়ে ইসলামের বিজয়ী মুখ। দুর্বল হতে থাকে মুসলিম উম্মাহ ও জাতি। তারপর আবারো সংস্কার ও পুনর্গঠনের আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে চলেন মুসলিম মনীষীরা। তাদের মধ্যে শায়েখ মুহাম্মদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (১১৫-১২০৬ হিঃ, ১৭০৩-১৭৯২ খ্রিঃ) এর সংস্কার আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। তিনি ইবনে তাইমিয়ার চিন্ত াধারাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। এমনিভাবে লিবিয়ার মুহাম্মদ বিন আলী মানুসী (১৭৮৭-১৮৫৯ খ্রিঃ) এর আন্দোলন, সুদানে ইমাম মুহাম্মদ মাহদী (১৮৪৩-১৮৮৫ইং) এর সংগ্রাম এবং আলজেরিয়ায় আব্দুল হামীদ বিন রশীদ এর সংস্কার আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল আন্দোলনই ১৯৬২ সালে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের গোড়াপত্তন করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয়েছিল উসমানী খেলাফতের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক সংস্কারসমূহ, যার সূচনা ৩য় সুলতান সালিম (১৭৮৯-১৮০৯) এবং সমাপ্তি ২য় আব্দুল হামিদ এর হাতে। একই ধারাবাহিকতায় মিশরের মুহাম্মদ আলী পাশা ইউরোপীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংস্কার কাজ চালিয়েছিলেন। তিনি

www.pathagar.com

তার সংস্কার কাজে অর্থনীতি, কৃষি-শিল্প, কারখানা ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়সমূহ সংযুক্ত করেছিলেন। রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে জামালউদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৭ খ্রিঃ) এর আন্দোলন অন্যতম এবং ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫) এর মাদ্রাসা স্থাপন আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম নিরপেক্ষবাদী জেনারেল কামাল পাশা আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮ খ্রিঃ) ইউরোপিয় ধারায় তুরস্কের পুনর্গঠনের নামে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী শরিয়তে কার্যকারিতা, বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যকে জবাই করে উসমানী খেলাফতের সমূলে ধ্বংস করেছিল এবং ইসলামী আইন কানুনের পরিবর্তে সুইজারল্যান্ডীয় আইন বাস্তবায়ন করে ১৯২৩ সালে যে তুর্কীগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তা আজও বিশ্বে মুসলিম ঘৃণাভরে স্মরণ করে।

ইসলামী রাজনীতি, সমাজ নীতি, ও সংস্কার নীতির ক্ষেত্রে ইমাম হাসান আল বান্না (মৃতুঃ ১৯৪৯ খ্রিঃ) এর আন্দোলন যা মিশরসহ সকল আরব দেশে বিস্তার লাভ করেছিল এবং ভারত উপমহাদেশে ইসলামী রাজনীতি সমাজনীতি, ও সংস্কার নীতি ক্ষেত্রে শায়খ আবুল আলা আল-মাওদুদী এর আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইসলামী রাজনীতি, সমাজ নীতি, সংস্কার নীতি আন্দোলনে অনেক ইসলামী-চিন্তাবিদ, সংস্কার, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে যাদের নাম তালিকাভুক্ত রয়েছে, তাদের মধ্যে শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী (১৭৬৩ খ্রিঃ), শাহ আহমদ শহীদ বেরলভী শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী, আল্লামা কাসেম নানুতুবী, শায়খুল ইসলাম আল্লামা মাহমুদুল হাসান, আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (১৯৩৮ খ্রিঃ) খায়রুদ্দীন তিউনিসী (১৮৯০ খ্রিঃ), আব্দুর রহমান আল কাওয়াকিবী (১৯০২ খ্রিঃ), রশীদ রেজা (১৯৩৫ খ্রিঃ), সায়্যিদ কুতুব (১৯৬৬ খ্রিঃ), মালিক ইবনে নবী (১৯০৫) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইসলামী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

এ সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা ও সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারা যদিও নানা বিষয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির ছিল, তদুপরি তাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, ঈমান, আক্বিদা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি। এ সকল বিষয়ে সকলের লক্ষ ও কার্যপ্রণালী এক ও অভিন্ন ছিল।

কিন্তু তারপরও এ সকল মহান মনীষীদের অক্লান্ত পরিশ্রম চেষ্টা সাধনা ও আন্দোলন পরিপূর্ণরূপে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারে নি। সকল প্রকার ফিৎনা ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দূর করে ব্যক্তি, জাতি ও সমাজ গঠন করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে শক্তিশালী করে সকল সম্প্রদায়ের মাঝে সভ্যতা ও সংস্কৃতিক বিভেদ নিরসন ও সমস্যা সমাধানে সফলতা অর্জন করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ

www.pathagar.com

হচ্ছে তাদের সংস্কার আন্দোলনে ইসলামী সংস্কারের মূলমন্ত্রের অভাব ছিল, যার কারণে সফলতার দারপ্রান্তে পৌঁছুতে পারেন নি।

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক, সংস্কারক ও শিক্ষাবিদদের উচিত জাতির এ সকল সমস্যাগুলোর মূল কারণ খোঁজে বের করে আলোচনা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তার সঠিক ও সুচিন্তিত সমাধানের পথ খোঁজে বের করা। যাতে মুসলিম উম্মাহ ও জাতি আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা আর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে তাদের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতে পারে এবং মুসলিম উম্মাহ ও জাতির হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে জাতির পুনর্গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে

আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করতে পারব যে, আমাদের সমাজের শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। এজন্য এ বিষয়টির প্রতি সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন গঠনমূলক কাজ, চিন্তা গবেষণা, সংস্কার-পরিশোধন ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে শিশুরা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা যদি সৎ গুণাবলী সম্পন্ন হয়, চরিত্রবান হয়, যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, তাহলে তারাই জাতির পুনর্গঠন সংস্কার সাধন পরিবর্তন ও জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুই মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজকে সকল প্রতিবন্ধকতা আর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে সঠিকভাবে জাতি ও মুসলিম উম্মাহকে গঠন করতে সক্ষম বটে।

মুসলমানেরা যদি তাদের চিন্তা-গবেষণা পরিশ্রম ও চেষ্টা প্রচেষ্টা শিশু পরিচর্যা, লালন-পালন ও শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে অধিক হারে ব্যয় করত, তাহলে শিশুরাই জাতির পুনর্গঠন, পরিবর্তন, পরিশোধন ও সংস্কারের কাণ্ডারী হতে পারত। মুসলমানেরা যদি শিশুর শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ও জৈবিক বিকাশের দিকগুলো নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা ও পর্যালোচনা করত, তাহলে জাতির বর্তমান চাহিদা কী? অবস্থা কী? দুর্বলতা কোথায়? ইত্যাদি সবকিছু সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারত। আর এটিই হত জাতির মুসলিম উম্মাহর নিয়মতান্ত্রিক স্থায়ী সংশোধন! ইসলামী সংস্কৃতির সঠিক পরিশোধন, এবং ইসলামিক, সামাজিক ও মানবিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঠিক সংস্কার সাধন।

সাধারণ সংস্কৃতি ও বিশেষ সংস্কৃতি : পুনর্গঠনের জন্য মারাত্মক ব্যাধি

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আগেকার যুগে শিশু শিক্ষা ও তারনিম তারবিয়াত পদ্ধতি দু'টি বিপরীত ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি, আরেকটি হচ্ছে সাধারণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি।

www.pathagar.com

বিশেষ ব্যবস্থা বলতে সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় সম্ভ্রান্ত, উচ্চ, সম্মানী, সম্পদশালী, ক্ষমতাবান, রাজা, বাদশা, ও মন্ত্রি-মিনিস্টারদের পরিবার থেকে আগত সন্তানদেরকে বোঝায়! এদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল নিজ ঘর ও পরিবার কেন্দ্রিক, এদের সাথে অত্যন্ত নম্র ভদ্র ও মার্জিত আচরণ করা হতো, এদের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ছিল সে ধরনের। এদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির তত্ত্বাবধায়ন করতেন মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান, হাজ্জাজ সাক্বাফী, হারুন অর রশীদসহ নেতৃত্বস্থানীয় লোকেরা। এ সকল শিশুদের পিছনে অনেক শিক্ষক লাগানো থাকতো, যারা অত্যন্ত আদর যত্ন ও আদব-শিষ্টাচারের ভেতর দিয়ে ওদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা ও তারনিম তারবিয়াও দিতেন, যাতে ওরাই পরবর্তীতে শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতি, বিচার-আদালত ও প্রশাসনসহ সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়।

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি বলতে নিম্নশ্রেণী, স্বল্প আয়, দিনমজুর, অভাবী ও দরিদ্র পরিবার থেকে আগত সন্তানদেরকে বোঝায়। যাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মক্তব ও পাঠশালা কেন্দ্রিক। যেখানে তারা শুধুমাত্র কুরআন তেলাওয়াত ও সাধারণ জীবন চলার যৎসামান্য অন্যান্য শিক্ষা শিক্ষা অর্জন করত। সেখানকার মক্তব ও পাঠশালাগুলোর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শিক্ষকগণ অযোগ্য অভদ্র, পাঠস্থান পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অশালীন আচরণ করা হতো এমনকি দৈহিক শাস্তি প্রদান বেত্রাঘাত ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ সকল মক্তব ও পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করতে হতো সেই দারিদ্র্যসীমার নিজে বসবাসকারী অভিভাবকদের। কিন্তু তারপরও এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠশালার যথাযথ উন্নয়ন ও শিক্ষার মান বৃদ্ধিকরণের ব্যাপারে অল্প কিছু সংখ্যক আলেম উলামা ছাড়া কেউ কর্ণপাত করে নি।

ইমাম গাজ্জালী ও আল্লামা ইবনে খালদুন এ বিষয়টি নিয়ে অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছেন। সে সকল মক্তব ও পাঠশালার বাস্তব চিত্র জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষা পদ্ধতির অবনতির কারণ উদঘাটন করে তা প্রতিকারের পন্থা ও পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। এমনকি তারা অনেক পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সে বিষয় সম্পর্কে সুপরামর্শ দিয়েছেন। যাতে তারা সে বিষয়ে সচেতন হয়ে তাদের সন্তানদের এ ধরনের মক্তব ও পাঠশালাতে না পাঠায়। কারণ, এ সকল মক্তব ও পাঠশালার শিক্ষকদের যেমনি ছিল না শিক্ষাগত যোগ্যতা, তেমনি ছিল না সঠিক আকিদা ; অনেকেই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট আকিদার বিশ্বাসী ছিলেন। যার ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-দীক্ষায় তালিম তারবিয়াত সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঈমান আকিদাসহ সর্বক্ষেত্রে অকল্পনীয় অবনতি ও বিপর্যয় নেমে আসে। দেখা দেয় সামাজিক সমস্যা। দুর্বল হয়ে পড়ে মুসলিম উম্মাহ।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত দু'টি পদ্ধতির শিশু শিক্ষার সাথে জড়িত ছিল তৃতীয় আরেকটি শক্তি বা দল, যাদের লক্ষ্য ছিল, এ দু'প্রকারের পদ্ধতির দায়িত্বশীলদের সার্বিকভাবে প্রস্তুত করা ও দেখাশোনা করা। তারা এ লক্ষ্যে কিছু প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করে এবং কতিপয় যুবকের হাতে সে দায়িত্ব ন্যস্ত করে। সে যুবকেরা সুষ্ঠু, সুন্দর নির্ভেজাল অভিনব শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে এবং শিক্ষা-দীক্ষা, লেখনী, রচনাসহ নানা ধরনের খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকে। সমাজে ইনসাফ-আদালত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এমন কি যে সকল প্রতিষ্ঠান এ লক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল, সেগুলো ধর্মীয়, আদর, শিষ্টাচার ও ভাষা শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ দিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে। বিশেষ করে ইলমে ফিক্হ, উসুলে ফিকহ, ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অবদান রাখে, যার ফলে তখনকার সময়ের বিচারক, মুফতি, হাকিমরা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এমনি দিন মুসলিম জাতির শিক্ষা দীক্ষায় তালিম তারবিয়াতের ব্যবস্থা, যা আজও পৃথিবীর অনেক দেশে প্রচলিত। বর্তমানে যদিও শিক্ষার পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক পরিবর্তন আসছে কিন্তু সাধারণ শিক্ষার মান আশানুরূপ উন্নয়ন হচ্ছে না শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ও যোগ্য লোক তৈরি হচ্ছে না। কারণ, সাধারণ পরিবারের শিক্ষার্থীদের অবস্থা এখনো অনুন্নত ও দুর্দশাগ্রস্ত। অথচ আজও উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা দেশের সেরা প্রতিষ্ঠান ও বিদেশের খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের অভিভাকদের খরচে বিশেষ ব্যবস্থায় লেখা পড়া করছে। যেখানে রয়েছে অত্যাধুনিক শিক্ষার সরঞ্জাম ও উপকরণাদী, যার কিঞ্চিত পরিমাণ সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নেই। যার কারণে আজও সাধারণ ও উচ্চ শ্রেণীর পরিবারের সন্তানদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। দুর্বল হয়ে পড়েছে জাতির মেধা, বিবেক অনুভূতি, শক্তি ও সাহসিকতা। দরিদ্রতা আর দুর্ভিক্ষ, আর বৈদেশিক চাপের মুখে জাতি আজ অসহায়। নেতৃত্ব আর কর্তৃত্বে যোগ্যতা হারিয়ে জাতির হৃদয়ে সভ্যতার গ্লানি আর সংস্কৃতির দূষণের ব্যধি স্থান সরে বসেছে। অগ্রগতি ও উন্নতির পথ হারিয়ে পশ্চাদপদতা আর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের অবশ্যই উচিত, শিক্ষার বৈষম্যতা দূর করে শিশু-শিক্ষার যথাযথ অগ্রগতি ও উন্নতির মাধ্যমে জাতির পুনর্গঠনের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যাতে মুসলিম উম্মাহ ও জাতি দরিদ্রতা, অক্ষমতা, পরনির্ভরশীলতা ও বিদেশীদের তাবেদারী থেকে মুক্ত হয়ে আবারো সেই সম্মান মর্যাদা আর গৌরবের আমলে সমাসীন হতে পারে।

আজ ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে মুসলিম শিশুরা শূন্য চাকার ন্যায় অসার হয়ে পড়েছে। শিশুদের অগ্রগতি উন্নতি ও পরিচর্যার ব্যাপারে মুসলিম দেশগুলোতে কোন ভূমিকা ও পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। অথচ একথা সকলের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, একমাত্র শিশুদের যথাযথ তালিম তারবিয়াত, শিক্ষা

www.pathagar.com

দীক্ষা ও পরিচর্যার মাধ্যমে তাদেরকে মানসিক ও বৈষয়িকভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারলে সকল প্রতিবন্ধকতার আর প্রতিরোধের মোকাবেলা করে জাতির পুনর্গঠন সম্ভব হত।

পরিচর্যামূলক সচেতনতা ও শিক্ষার পরিশোধনই সংস্কারের মূল ভিত্তি

শিশুরা সাধারণতঃ সঠিক পরিচর্যা, উপদেশ নসিহত ও দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে, চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান এবং আত্মিক ও মানসিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে বেড়ে উঠে। সঠিকভাবে তালিম তারাবিয়াত ও পরিচর্যা পেলে শিশুর আত্মিক মানসিক ও চারিত্রিক বিকৃতি হতে পারে না। এজন্য সকলেরই উচিত, আমরা যেন শিশু-পরিচর্যার বিষয়গুলোর প্রতি যত্ন ও মনোনিবেশ প্রদান করি। শিশুর আত্মিক, মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশ ও সংশোধনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সবগুলো বিষয়ে সদা সতর্কও সচেতন থাকি। যাতে সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধসহ সর্ববিষয়ে শিশুর মধ্যে লুকিয়ে থাকা স্পৃহা ও অনুভূতির বাতাবরণ সৃষ্টি হয় এবং জাতির পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হচ্ছে যে আমরা শিশু শিক্ষা ও তালিম তারবিয়াত এবং শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশের বিষয়াবলী তথা সঠিক চরিত্র গঠনের উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে অবহেলা করি। শিশুর সময়-উপযোগী পরিচর্যার গুরুত্ব প্রদান করি না। যার কারণে শিশুর আত্মিক মানসিক ও জৈবিক বিকাশ এবং শিষ্টাচার, আদব ও সৎ চরিত্রবান হওয়া তো দূরের কথা শিশু তখন আত্মিক, মানসিক ও চারিত্রিক বিকৃতি ঘটে রুক্ষ ও কর্কষ মেজাজের হয়ে গড়ে ওঠে। তার জীবনে নেমে আসে অক্ষমতা, দুর্বলতা, বিভ্রান্তি, আর বিপদগামিতা। তখন ঐ শিশুকে বড় হওয়ার পরে কোন ধরনের ঔষধ উপদেশ নসিহত আর সৎপথের আহ্বান কোন কাজে আসে না।

প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে হাজার বৌদ্ধিক স্পৃহা জাগানোর মাধ্যমে তার চেতনা ও অনুভূতিকে আন্দোলিত করা যায় না। অনেক বীর লোক রয়েছে, যাদের বীরত্ব কবিতা আর ছন্দে প্রকাশ পেলেও বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে না। অনেক ডাক্তার রয়েছে ধূমপানের ক্ষতিকারক দিক জানা সত্ত্বেও বিরত থাকতে পারে না। কারণ, তাদের শিশু বয়সে যে তারবিয়াত প্রদান করা হয় নি।

আমাদের সমাজে অনেক মুসলমান সন্তানদেরকে আফসোস করতে দেখি, যারা অত্যন্ত ভদ্র, সৎ ও নম্র স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে সঠিক তালিম তারবিয়াত আর শিষ্টাচারের অভাবে তাদের জীবনে নেমে এসেছে অবক্ষয় অবনতি। যদিও তাদের সাধারণ চলাফেরা লেনদেন, আচার-আচরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের এ অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না বা অল্প স্বল্প প্রকাশ পায়। কারণ, প্রকৃত পক্ষে যে ছিল একজন

www.pathagar.com

মুসলমানের সন্তান, তাকে সহজে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, খেলাধূলা, রেডিও-টেলিভিশন, আর বাদ্যযন্ত্র বিকৃত করতে পারে নাই, তবুও তার মধ্যে লুকায়িত স্পৃহার জাগরণ ঘটাতেও পারছে না।

বর্তমানে আমাদের কাছে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সবচেয়ে বড় যে রোগটি ধরা পড়ে তা হচ্ছে, মুসলিম জাতি আজ ব্যক্তির চরিত্র গঠনের বিষয়টিকে অবহেলা করছে। বিশেষ করে আজকের এ আধুনিক যুগে তারা সে বিষয়টিকে ভুলেই গেছে। তাদের বক্তব্য সভা, সেমিনার, ওয়াজ, নসিহত সবই শুধুমাত্র বয়স্কদেরকে লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে অনুভূতি ও স্পৃহা জাগানোর চেষ্টা সাধন করা হচ্ছে। শিশুদের গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি গঠন ও সমাজ গঠনের বিষয়টি ভুলেও তাদের বক্তব্যে উচ্চারণ হয় না। অথচ তাদের এ বক্তব্য ও চেষ্টা প্রচেষ্টা কোন কাজে আসেনি, আসবেও না, যতক্ষণ পর্যন্ত শিশু বয়সে সে বীজ ঢুকিয়ে না দেয়া হবে।

এর একটি বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে : যদি একজন লোক প্রাথমিকভাবে একটি ভাষা শিখে থাকে যে ভাষাটি তার দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। এতে সে এ ভাষার শব্দ এবং বাক্য যেভাবেই ব্যবহার করুক না কেন সকলের কাছে বোধগম্য হবে। তারপর সে অন্য আরেকটি ভাষা শেখে। এ ভাষা অনুবাদ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিখেছে, যে ভাষা তার দৈনন্দিন কাজকর্ম, লেনদেন, চলাফেরা ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না, যতই ভাল করে সে তার শব্দ ও বাক্যগুলো ব্যবহার করুক না কেন সহজে তা অন্যের কাছে বোধগম্য হয় না। এমনকি এ অর্জিত ভাষাটি যে শিখেছে তাকেও সহজে প্রভাবিত করতে পারে না। তেমনিভাবে একটি মানব সন্তানের বাল্য বয়সে তার হৃদয়ে যে বিষয়গুলোর বীজ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, সেগুলো তাকে যেভাবে আন্দোলিত করতে পারবে ; যৌবন বয়সে ওয়াজ নসিহত আর বক্তব্যের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেয়া বিষয়গুলো সেভাবে আন্দোলিত করতে পারবে না। সুতরাং একটি মানব সন্তানকে শিশু বয়সেই তার আত্মিক ও মানসিক বিকাশের জন্য তার যথাযথ তালিম তারবিয়াত ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে।

মূসা (عليه السلام) এর শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন

পবিত্র আল-কুরআনে হযরত মূসা (عليه السلام) এর যে ঘটনাটি বনী ইসরাঈলদের সংশোধনের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী রয়েছে। বনী ইসরাইলরা মিশরের মাটিতে ফেরাউন-কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে তার দাসত্বের শিকার হয়েছিল এবং দুর্বল ও পরনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাদের সংশোধনের জন্য মূসা (عليه السلام) কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ফেরাউনের দাসত্ব যুলুম, নির্যাতন থেকে মুক্ত করে সার্বিকভাবে তাদেরকে সংশোধন করলেন। মূসা (عليه السلام) তাদেরকে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি 'সিনা' বা 'তীহ' নামক স্থানে নিয়ে গেলেন, যাতে সেখানে তারা তাদের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের হারানো নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা দিতে পারে।

কিন্তু সে সম্প্রদায়টি যেহেতু ফেরাউনের দাসত্বের ভিত্তিতে লালিত-পালিত হয়েছিল তাই তারা আল্লাহর পথে জেহাদ ও কঠোর পরিশ্রম করতে পারেনি, পারেনি শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে, বরং তারা শেষ পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল মূসা (عليه السلام) কে ভয়ভীতি আর পশ্চাদপসরণের সুরে উত্তর দিতে লাগলো।

এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন;

﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তোমরা পিছপা হয়ে পলায়ন করো না। যদি পলায়ন কর, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তখন তারা বলল, হে মুসা (عليه السلام) এ ভূমিতে রয়েছে ক্ষমতাবান শক্তিশালী সম্প্রদায়, তারা এখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। যদি তারা বের হয়, তাহলে আমরা প্রবেশ করব। (সূরা আল-মায়েদা : ৫/২১-২২)

তারা তখন নেতিবাচক আচরণ করে তাদের দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানালো, তাদের দায়-দায়িত্ব সবই মূসা (عليه السلام) এর উপর চাপিয়ে দিল। মূসা (عليه السلام) ছিলেন আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা ও রাসূল। তিনি আল্লাহর আদেশে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করে সেখানকার ঐক্য ফ্রন্টের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে আল্লাহর আদেশ পালন করলেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন;

﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾

"তারা বলে হে মূসা! যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করবে, কোন অবস্থাতেই আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। তুমি এবং তোমার প্রভু সেখানে যাও, তাদের সাথে যুদ্ধ কর আমরা এখানেই বসে থাকব। (সূরা মায়েদা : ৫/২৪)

www.pathagar.com

মূসা (আঃ) যখন বুঝতে পারলেন যে কোন ধরনের নসিহত, উপদেশ, ও তিরস্কার তাদের দাসত্বের চিরাচরিত অভ্যাসের কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না। তারা তাদের শক্তি সামর্থ যোগ্যতা ও বীরত্ব আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না। তখন মূসা (আঃ) তাদের নতুন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের চেষ্টা চালালেন। তিনি অত্যন্ত নম্র ভদ্র ও কোমলতার সাথে তাদের হৃদয়ে সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে সকল প্রকার চ্যালেঞ্জ ও প্রতিরোধের মোকাবেলা করে ব্যক্তি, জাতি ও সমাজ বিনির্মাণের মৌলিক গুণাবলীর বীজ পর্যায়ক্রমে ঢুকাতে থাকলেন।

এখানে আমাদেরকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। তা হচ্ছে মানুষের অনুভূতি ও ব্যক্তির ক্ষমতা এবং মানুষের অনুভূতি গঠনের স্বভাব ও ব্যক্তির ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। মানুষের অনুভূতি ও ব্যক্তির ক্ষমতা পরিবর্তন পরিবর্ধনের অবকাশ রাখে। যার ফলে কাফির ব্যক্তি মুমিন হতে পারে। মুমিন ব্যক্তি কাফির হতে পারে। সীমালঙ্গনকারী ও পথভ্রষ্ট লোক হেদায়াত ও আলোর দিশা পেতে পারে। অপরদিকে মানুষের অনুভূতি গঠনের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। যার ফলে বাহাদুর ব্যক্তি কাপুরুষ হতে পারে না। দানশীল ব্যক্তি কৃপণ হতে পারে না। ভদ্র ও শিষ্টাচারী ব্যক্তি অভদ্র ও চরিত্রহীন হতে পারে না।

এজন্য উত্তম সৈন্যবাহিনীর সেনাগণ এবং অপরাধ-প্রবণ সেনা সদস্যবৃন্দ দুটি গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে বীরত্ব ও বাহাদুরি, আরেকটি হচ্ছে মিত্রতা ও বিশ্বস্ত তা। কিন্তু অন্যদিক বিবেচনায় ভিন্ন স্বভাবের হতে পারে। যেমন : উত্তম দলের সেনা সদস্যগণ ভাল ও কল্যাণকামী হয়ে দেশ ও জাতির সেবার আত্ম নিয়োগ করে থাকে। আর অপরাধ-প্রবণ সেনা সদস্যরা সাধারণত খারাপ ও অন্যদের কষ্ট সাধনে নিয়োজিত থাকে। আবার কখনো খারাপ দলের সেনা সদস্যরা খারাপ পথ পরিহার করে উত্তম পথের পথিকও হতে পারে। আর ভাল দলের সদস্যরা ও ভাল পথ পরিহার করে খারাপ পথের পথিক হতে পারে। যেমন দু'দলের দু'জন বীর বাহাদুর ছিলেন, একজন ছিলেন খেতাব প্রাপ্ত বীর সেনানী ইসলামের সৈনিক উমর ইবনুল খাত্তাব। আর আরেকজন ছিলেন অন্ধকারে নিমজ্জিত, কুফরি ও অজ্ঞতার বীর সেনানী আবু জেহেল আমর ইবনে হিশাম।

এজন্য হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশের উপর অবিচল ছিলেন। কারণ, আল্লাহ মানুষের স্বভাব সম্পর্কে যেমনি অবগত তেমনি সমাজের ব্যক্তি গঠনের অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত। তাই হযরত মূসা (আঃ) জাতির পরিবর্তন, পরিশোধন ও পুনর্গঠনের জন্য মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি মনোনিবেশ প্রদান করেন। শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা, তালিম, তারবিয়াত ও পরিচর্যার প্রতি অভিনব পদ্ধতিতে তার চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে

www.pathagar.com

থাকেন। যাতে শিশুর আত্মিক মানসিক ও জৈবিক বিকাশের মাধ্যমে জাতির এমন পরিবর্তন সাধন করেন, যে পরিবর্তন স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ এরশাদ করেন :

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾

"আমি তার জন্য তখতের মধ্যে সকল বস্তুর বিস্তারিত আলোচনা ও উপদেশ লিপিবদ্ধ করেছি। অতএব তুমি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও, যেন তারাও সুন্দরভাবে তা আঁকড়ে ধরে।" (সূরা আল-আরাফ-৭/১৪৫)।

আল্লাহ মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়কে সীনাই ময়দানে ৪০ বছর অবরুদ্ধ রাখলেন। সেখানে তারা নানা ধরনের দুঃখ ক্রোধ ও কষ্ট ভোগ করল।

আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন;

﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

"তিনি বললেন, এ পবিত্র নগরী তাদের জন্য ৪০ বছর পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হলো, তারা হতাশগ্রস্ত হয়ে জমিনে বসবাস করল। অতএব পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোন আফসোস নেই।" (সূরা আল-মায়েদা : ৫/২৬)

আর তাদের শেষ ফলাফল ছিল স্বাধীন প্রজন্ম গঠন করা।

আল্লাহ এরশাদ করেন;

﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"যাদের বিশ্বাস ছিল যে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারা বলল, কতই না ছোট দল বড় দলের উপর বিজয়ী হয় আল্লাহর মহিমায়। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন। (সূরা বাকারা : ২/২৪৯)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾

www.pathagar.com

"অতএব তাদেরকে পরাস্ত করে আল্লাহর নির্দেশে এবং হজরত দাউদ (আ.) জালুত কে হত্যা করলেন। আল্লাহ তাকে রাজত্ব, প্রজ্ঞা, কৌশল দিয়েছিলেন। যাই ইচ্ছা তা শেখালেন। যদি আল্লাহ মানুষের এক দল দ্বারা অন্যদলকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।"

(সূরা আল-বাকারা : ২/২৫১)

আল্লাহ প্রদত্ত এ সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, উপদেশ, নসীহত ঐ সকল লোকদের জন্য, যারা মানব স্বভাব অনুধাবন করতে সক্ষম এবং ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

সুতরাং জাতির সংশোধন ও মুসলিম উম্মাহর পরিবর্তন সাধন করতে হলে শিশু-শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শুধুমাত্র বক্তব্য আর নসীহতের উপর সীমিত থাকা যথেষ্ট হবে না। বরং বাস্তবমুখী কর্মদ্যোগ নিতে হবে। কারণ, শিক্ষা-গবেষণা, যুক্তি-নিরীক্ষা ইত্যাদি বিষয় থেকে বিরত থাকার ফলে এ সকল সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। তাই আমাদের অবশ্যই উচিত, এ কর্তব্যকে বর্তমান অমনোযোগী অবস্থার অবসান ঘটিয়ে ইসলামের বক্তব্য ও বাণীকে মানব সমাজের সামনে পরিষ্কার করে তোলে ধরা। সংশোধন ও পরিবর্তনের দাওয়াত ব্যাপকহারে চালিয়ে যাওয়ার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রয়োজনে আমাদের পূর্বপুরুষদের মত আমাদেরও ত্যাগ তিতিক্ষা, উৎসর্গ ও জানমালের কুরবানী করা।

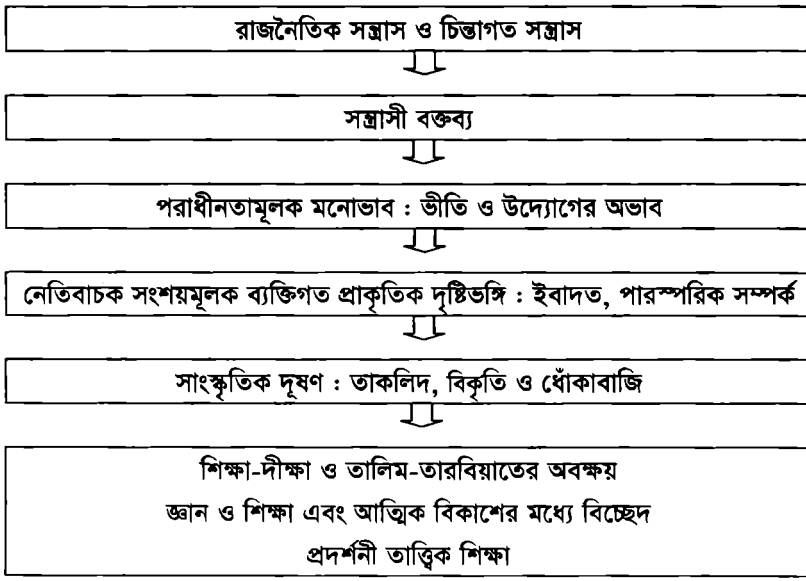

www.pathagar.com

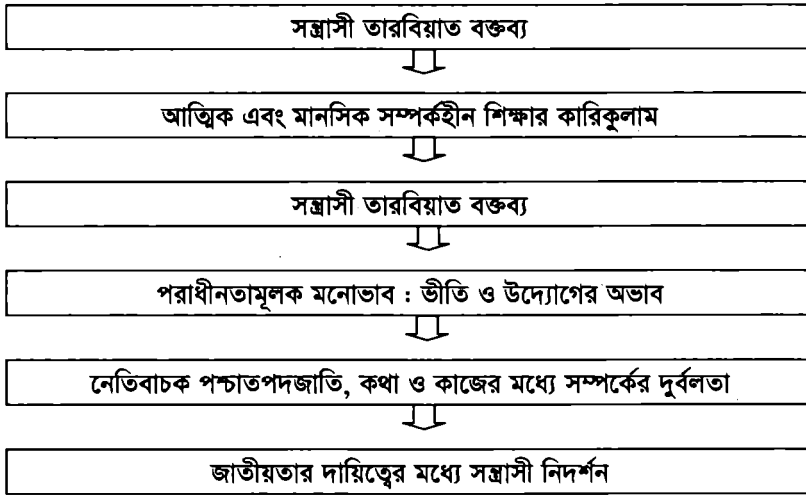

চিন্তা জগৎই জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা

মুসলিম উম্মাহ ও জাতি আজ নানা কারণে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি হচ্ছে, তাহলো চিন্তাগত জগতের সমস্যা, মুসলিম উম্মাহ্‌র চিন্তাজগতের পরিধি অত্যন্ত সীমিত। এ চিন্তাগত সমস্যার কারণে নানা সমস্যার উদ্ভব ঘটছে। তাই আমাদের সর্বপ্রথম এ সমস্যাটির কারণ চিহ্নিত করে যথাযথ সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে অন্যান্য সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব হবে না।

এ কথা সকলের কাছে স্পষ্ট যে, আজকের পৃথিবী পরিধি অত্যন্ত বিশাল। মানব, জীব ও জড় পদার্থে আজকে পৃথিবী পরিপূর্ণ, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতির শিকড় উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর, মৌলিকতা আর মূল্যবোধের প্রতি রয়েছে অঙ্গীকার। এতকিছু সত্ত্বেও আজ বিশ্ব পিছিয়ে পড়ছে বিচ্ছিন্নতা আর বিভ্রান্তির ভয়ঙ্কর অবস্থায় পৌঁছেছে। যার কারণে আজ অশান্তি বিশৃংখলা, অনৈক্য ও যুলুম-নির্যাতনের সয়লাব।

ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন আর একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালনের অনুভূতি আজ রাষ্ট্র ও জাতি-গোষ্ঠী থেকে হারিয়ে গেছে। যার বাস্তব চিত্র অনেক কবি সাহিত্যিকদের তথ্যবহুল লিখনী আর রচনাবলীর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে উঠেছে। বিশ্বের এ নাজুক পরিস্থিতির বাস্তব একটি উদাহরণ হচ্ছে; 'একজন বেদুঈন লোক আরেকজন অপরিচিত লোককে জিজ্ঞাস করল, তুমি কি আমাকে ভালবাস? উত্তরে সে লোকটি বলল, হ্যাঁ আমি তোমাকে ভালবাসি। লোকটি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, সে তো তার প্রতিবেশীও নয়, আত্মীয়ও নয়

www.pathagar.com

তবুও সে তাকে ভালবাসে।' আজ জাতির অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভালবাসা আর সুসম্পর্ক তো দূরের কথা, হিংসা হানাহানি, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা আর বিভ্রান্তি সর্বত্র বিরাজমান, নিজের আত্মীয়দের সাথে পর্যন্ত সুসম্পর্কের বদলে সুসম্পর্ক আর শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে উঠছে। অথচ ইসলামের মূল বাণী ছিল। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই, একজন অন্য জনের উপর যুলুম করতে পারে না, বিপদে ছেড়ে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাবে। একজন মুমিন অন্য আরেক মুমিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়। যার এক অংশ আরেক অংশের সাথে মজবুত করে আঁকড়ে ধরে আছে। 'পরস্পর দয়া অনুগ্রহ, সহমর্মিতা আর ভালবাসার ক্ষেত্রে মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে একটি শরীরের ন্যায়। শরীরের কোন একটি অঙ্গ পীড়িত হলে, সারা শরীর তার এ ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, সর্বাঙ্গে জ্বর চলে আসে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো তার বিপরীত। আমরা পরস্পর বিরোধী, বিচ্ছিন্ন। ভেবে পাই না, কেমন করে মুসলিম উম্মাহ্‌র অধঃপতন ও খারাপ অবস্থান বর্ণনা দেব। কোন ভাষায় ও কোন বুদ্ধি ও পদ্ধতিতে এ সবের বর্ণনা দিলে বিশ্বাসযোগ্য হবে। অবশ্যই আমাদের এ বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে।

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পিছিয়ে পড়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, দুর্বলতা, দারিদ্র্যতা, ফিতনা, ফাসাদ ইত্যাদি। অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী যেখানে অগ্রগতির সুউচ্চ শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে, পাড়ি দিচ্ছে সাগর, মহাসাগর, ঘাটে ঘাটে তাদের গতির তরী ভিড়াতে সক্ষম হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার নানা ধরনের জাতি গোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলছে। সেখানে মুসলিম উম্মাহ তুচ্ছ আর অপমানের জীবন-যাপন করছে। পরনির্ভরশীলতা আর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে। অথচ সে জাতি শ্রেষ্ঠ, সম্পদশালী, সম্মানী ও গৌরবের অধিকারী। সভ্যতা-সংস্কৃতি আর মূল্যবোধের ধারক বাহক।

আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন;

﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর অঙ্গীকার তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন।" (সূরা আননূর : ২৪/৫৫)

www.pathagar.com

অন্যত্র আল্লাহ্ এরশাদ করেন;

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾

"তোমরা হলে উন্নত জাতি, জনগণের কল্যাণের জন্য তোমাদের আগমন ঘটেছে। তোমরা লোকজনদের সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। এবং তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করবে।"

(সূরা আল-ইমরান-৩/১১০)

পৃথিবী এখনো পূর্বের মতই, জাতিও ঠিক পূর্বের মতই। অথচ মুসলিম উম্মাহ পিছিয়ে পড়েছে আর অন্যান্যরা এগিয়ে চলেছে। মুসলমান দুর্বল হচ্ছে আর শত্রুরা শক্তিশালী হচ্ছে।

আমাদেরকে এ বাস্তব অবস্থা বুঝতে ও অনুধাবন করতে হবে যদিও ভিন্নমত ও ভিন্ন পথ রয়েছে। তথাপি আমাদেরকে অবশ্যই এ বাস্তবতার আলোকে গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে মূল কারণ নির্ণয় করতে হবে। সাধারণ বিষয় নিয়ে চিন্তায় বসে থাকলে চলবে না। বরং গভীর ও মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে গভীর চিন্তা করে জাতির অধঃপতনের মূল শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। তাহলেই মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড় করানো সম্ভব হবে।

ইসলামই জাতির অবশিষ্ট কল্যাণের মূল উৎস

পশ্চিমা বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, যারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে ইতিহাস রচনা করেছে, তাদের প্রতি প্রথম কথা হচ্ছে, তারা যে ইসলাম ধর্মকে নানা ধরনের অপবাদ দিয়ে থাকে তা হচ্ছে তাদের অজ্ঞতার প্রমাণ। তাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা আর হঠকারিতার কারণে ইসলামকে অনৈক্য ও বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাদের মতে মুসলিম দেশগুলোতে বিভেদ, বিচ্ছেদ-বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ ইত্যাদি ইসলামের কারণেই আসছে। অথচ ইসলাম এ সকল অপবাদ ও অভিযোগ থেকে পূত পবিত্র। সঠিক ইতিহাস তাই প্রমাণ করে।

প্রকৃতপক্ষে ঐক্য, সংহতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইলামের ভূমিকা ইতিবাচক। ইসলাম মুসলমানদেরকে একতা ও সহযোগিতার প্রতি আহ্বান করে। বিভিন্ন দল-উপদল ও জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টিকারি বিষয়াবলী পরিহার করার প্রতি নির্দেশ প্রদান করে।

www.pathagar.com

সাম্য, ভ্রাতৃত্ব সহযোগিতা সহমর্মিতা ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। পৃথিবীর সকল মানুষ একই আদরের সন্তান, একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি, নানা, দল-উপদল, জাতি-গোষ্ঠী রয়েছে শুধুমাত্র পরিচিতির জন্য। মানুষের ভাষা ও রঙে ভিন্নতা আল্লাহর নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ। এগুলো কোনটি অহংকার আর গৌরবের বিষয় নয়।

আল্লাহর কাছে তাক্বওয়ার মূল্য সবচেয়ে বেশি। যে মুত্তাকি, খোদা ভীরু, কল্যাণকামী সেই আল্লাহর কাছে প্রিয় ও অধিক সম্মানী। সমাজের উচু নিচু ধনী-গরিব সবাই শরিয়তের দৃষ্টিতে একই ও সমমর্যাদার অধিকারী। তাকওয়াই হচ্ছে প্রাধান্য পাওয়ার ও অধিক সম্মান লাভের উপকরণ।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন;

﴿فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾

"তোমরা ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর, সমতা বজায় রাখ, যদিও নিকটতর আত্মীয় হয়।" (সূরা আন আনআম : ৬/১৫২)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন;

﴿بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ﴾

"কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা পোষণ ও বাড়াবাড়ি তোমাদেরকে ন্যায় পরায়ণতা থেকে যেন বিরত না রাখে। তোমরা ন্যায় পরায়ণতা বজায় রাখ। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।" (সূরা আল মায়েদা : ৫/৮)

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

"তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর, এবং বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ো না। আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন, ফলে তোমরা তারই করুণায় ভাই ভাই হয়ে গেলে।

(সূরা আলে ইমরান : ৩/৩)

﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"তোমরা এ সমস্ত লোকদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কাছে অকাট্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও মতানৈক্য করছে, এদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" (সূরা আন ইমরান : ৩/১০৫)

www.pathagar.com

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ ভাই ভাই।" (সূরা হুজুরাত : ৪৯/১০)

সুতরাং যদি কোন মানুষ জানতে চায় যে, ঐক্য সংহতি, সহমর্মিতা সহযোগিতার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী? এবং অনেক্য ঝগড়া বিবাদ ফিৎনা ফাসাদ ইত্যাদি কারণ সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে, তাহলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে কুরআন, সুন্নাহ, ইসলাম তথা রাসূলের যুগের ন্যায়-নীতি, ঐক্য-সংহতি, সহযোগিতা-সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের কোন তুলনা হতে পারে না। একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে এ ধরনের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলাম সব সময় সর্বাবস্থায় ঐক্য-সংহতি সহযোগিতা আর সহমর্মিতার প্রতি আহ্বান করে।

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন;

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾

"যদি মুমিনদের দুটি সম্প্রদায় ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়। তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে সুরাহা করে দাও ইনসাফের ভিত্তিতে। যদি একজন অপরজনের উপর সীমালঙ্ঘন করে তাহলে সীমালঙ্ঘনকারীকে প্রতিহত কর, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ পালনে ফিরে না আসে। যদি ফিরে আসে তাহলে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে সমস্যা নিরসন করে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন। নিশ্চয় মুমিনগণ ভাই ভাই, অতএব তাদের মধ্যখানে সুরাহা করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তোমাদের করুণা করবেন। হে মুমিনগণ! এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করো না, হয়তো অপর সম্প্রদায় তোমাদের থেকে উত্তম হতে পারে। একজন মহিলা যেন অন্য মহিলাকে নিয়ে বিদ্রূপ না করে, হয়তো অপরজন তার থেকে উত্তম হতে পারে।" (আল-হুজরাত : ৪৯/৯-১১)

www.pathagar.com

তাই বলা যায় যে ইসলাম ধর্মে মতানৈক্যের কোন সুযোগ নেই। বরং ইসলামই হচ্ছে ঐক্য ও একত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতার আহবায়ক। ইসলামে ঝগড়া ফাসাদ হিংসা হানাহানির কোন স্থান নেই।

উপনিবেশই জটিলতা ও অভিশাপ

আমরা যদিও জানি যে, উপনিবেশ ও তার রাজনীতি, ষড়যন্ত্র শত্রুতা ও চক্রান্ত অতীতে ছিল বর্তমানেও আছে। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব উপনিবেশবাদী রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে উপনিবেশ ও উপনিবেশবাদী রাজনীতি মুসলিম উম্মাহ ও জাতির জন্য একটি মারাত্মক জটিলতা ও অভিশাপের আকার ধারণ করছে এবং আরও অন্যান্য জটিলতা ও সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মধ্যেকার বিবাদ-বিচ্ছেদ চিরতরে বন্ধ করা। দেশ, জাতি, গোত্র এবং দল উপদলকে বিবাদ বিচ্ছেদ, লড়াই, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি থেকে বিরত রাখা। যদিও এ বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। কিন্তু তারপরও যদি এ বিষয়ে সফলতা অর্জন করা যায়, তাহলে উপনিবেশ ও উপনিবেশবাদী রাজনীতি, ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং জাতিকে এ দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা যাবে। উপনিবেশ ও উপনিবেশবাদী রাজনীতির ফলে যে সকল ঘটনাবলী ঘটে গেছে, তা কীভাবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতি সহ্য করল তা ভাবতেও অবাক লাগে এবং এটি অবশ্যই একটি চিন্তার বিষয়। এজন্য উপনিবেশ ও উপনিবেশবাদী রাজনীতি ষড়যন্ত্র ও তীক্ষ্ণতাকে অনুধাবন করে তার প্রতিরোধ ও মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে কিছু উপমার প্রয়োজন। আমাদের সামনে চীন, ভারত ও ইউরোপের কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে, যাতে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামী ঐক্য বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা : চীন, ভারত, ইউরোপ

চীন : আমরা প্রথমেই চীনের আলোচনায় যাবো। কারণ, চীনের ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিকাশ-বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনেকটা মুসলিম বিশ্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুসলিম বিশ্বের মত চীন দেশটি তার অঙ্গরাজ্যের সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সেখানে বাস করে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ মানুষ। চীনের আয়তন ব্যাপক ও বিস্তৃত। চীনের বিশাল আয়তন জুড়ে রয়েছে শীতল বরফে ঢাকা। অপরদিকে রয়েছে দীর্ঘ ঘন বনভূমি। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী বসবাস। তাদের রয়েছে আবার অনেক দল-উপদল ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। তবে তাদের প্রতিটি গোত্রের ভাষার কঠিন শব্দ সাধারণ শব্দার্থে প্রায় মিল এবং লিখিত ভাষা থাকার কারণে সাধারণ মানুষ ও ছেলেমেয়েরা একে অন্যকে সহজেই বুঝতে পারত। তবে চীনা ভাষাই তাদের অফিস আদালতের স্বীকৃত ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত।

www.pathagar.com

চীনের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, যেখানে অনেক রাজা-বাদশা ও জাতি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। অনেক যুদ্ধবিগ্রহ সংগঠিত হয়েছে। যুলুম, নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে চীনের মানুষ, এমনকি উপনিবেশন থেকেও মুক্তি পায়নি বিশাল চীন সাম্রাজ্য। যেমনিভাবে মুসলিম বিশ্বের শাসনব্যবস্থা, রাজনীতিতে উপনিবেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনি চীনেও তার রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অবশেষে চীন তার সভ্যতা-সংস্কৃতি মূল্যবোধসহ সার্বিকভাবে তার চেতনা, শক্তি, অনুভূতি দিয়ে ঐক্য-সম্প্রীতি ও সহানভূতির ভিত্তিতে বিশাল চীন সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে যে সংঘাত চলছে তা তাইওয়ান চীন থেকে আলাদা বা পৃথক হওয়ার অথবা বিবাধ সৃষ্টি করার জন্য নয়, বরং উভয়ের কিছু চাওয়া-পাওয়া ও অধিকার আদায় করাই এর মূল লক্ষ্য। বাহ্যিকভাবে তাইওয়ান চীন থেকে আলাদা হওয়ার যে স্লোগান শোনা যায়, তা চীনকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেয়ার জন্য বহিরাগত পরাশক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র মাত্র।

ভারত : দ্বিতীয় উপমাটি ভারত উপমহাদেশ থেকে। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত উপমহাদেশ যেখানে উল্লেখযোগ্য ৫টি জাতিসহ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠীর বসবাস। তাদের রয়েছে আবার নানা ধরনের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। ভারত উপমহাদেশের অবস্থা, মুসলিম বিশ্ব ও চীনের সাথে মিল রয়েছে। এক সময় ভারতবর্ষও জালেমদের যুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অনেক, রাজা-বাদশাহ, জাতি-গোষ্ঠী ও সম্রাটগণ শাসন করেছেন, পুরা ভারত বর্ষ ইতিহাসের এক ক্রান্তিমান অতিক্রম করে এসেছে।

ভারত উপমহাদেশে রয়েছে পাকিস্তান নামক একটি মুসলিম দেশ, যা ভারত বর্ষের সাথেই যুক্ত ছিল এবং একই শাসনের অধীনে ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান নামক যে দেশটি ভারত উপমহাদেশ থেকে আলাদা হয়েছিল তাও পরবর্তীতে, জাতিগত, বংশগত ও ভাষাগত দাঙ্গার কারণে বিভক্ত হয়ে পড়ে, জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ড। পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায় নতুন পতাকার। অথচ ভারত বর্ষ বা ভারত নামক ভূখণ্ডটি পাকিস্তানের তুলনায় জাতিগত বংশগত, ভাষাগত ও সমাজগত দাঙ্গামা অধিক থাকার পরেও একই সরকারের অধীনে রয়েছে। বিভক্ত ও খণ্ড বিখণ্ড হয় নি। অথচ পাকিস্তানের ঐক্য আজও হুমকির সম্মুখীন।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ থেকে আজও মনে হয় যে, রাজনীতিবিদদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায় ও তাদের সংস্কৃতি দমন করে সেখানে পৃথক পৃথক ভূখণ্ড তৈরি করা।

ইউরোপ : তৃতীয় উদাহরণ হচ্ছে ইউরোপের অর্থনীতি, প্রশাসন ও রাজনৈতিক ঐক্য ও সম্পর্ক ইত্যাদি। আমরা সবাই ইউরোপের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী দেশ-প্রদেশ, ও সামরিক-বেসামরিক লোকদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ ফিৎনা ফাসাদসহ ইউরোপের

www.pathagar.com

ইতিহাস সম্পর্কে অবগত। সেখানে কীভাবে সাধারণ যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিশ্ব যুদ্ধের রূপ লাভ করেছিল। মিলিয়ন মিলিয়ন লোকদের প্রাণহানি ঘটেছিল, যা কারো অজানা নেই। ইউরোপ মহাদেশ সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যেখানে বিভিন্ন দল উপদল, জাতি-গোষ্ঠী ও ভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ থাকা সত্ত্বেও অবশেষে ইউরোপীয়ানরা যুদ্ধ বিগ্রহ পরিহার করে সহনশীলতা, সহযোগিতা আর সহমর্মিতার ভিত্তিতে নিজেদের পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। যার লক্ষ্য ছিল সংহতি আর ঐক্যের ভিত্তিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন। প্রয়োজনের আলোকে ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে তারা বণ্টন করে নিয়েছিল যুদ্ধলব্ধ মাল, হাঠবাজার ও পানির ঘাট, বন্দর ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত তারা একতা আর সাম্যের ভিত্তিতে গঠন করল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউরোপীয় মুদ্রা তাদেরই বিনিময় প্রতীক।

বাস্তবিক পক্ষেই তারা বিশ্বের দরবারে খ্যাতি লাভ করে যুক্তরাজ্য হিসেবে । আন্ত র্জাতিকভাবে বিশ্ববাজারে ডলারের বিনিময়ে লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলা সত্ত্বেও ইউরোর বিনিময়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো-সহ বিভিন্ন দেশে লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত হয়। এমনকি ইউরোর বিনিময়ে লেনদেন অনেকটা সহজ হওয়ার কারণে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশেও ইউরোর বিনিময়ে লেনদেন প্রচলিত হয়। যার ফলে ইউরোপীয়দের শত্রু-মিত্রসহ সকলেই অনেকটা কাছাকাছি ও ঐক্যের দিকে ফিরে আসে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেটওয়ার্ক ও সম্পর্ক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তারা সুখে-দুঃখে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। যার ফলে তাদের মধ্যকার হিংসা বিদ্বেষ, শত্রুতা ভুলে গিয়ে ঐক্যের প্রাচীর তৈরি করে সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে তারা। বিশ্বায়নের বিরাট কর্মসূচীতে প্রভাব ফেলেছে তাদের এ ঐক্য ও সহযোগিতা। যার বিস্তারিত বিবরণ ও চিত্র তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, চেতনা-অনুভূতি ও মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে।

অপরদিকে যেখানে চীন, ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে ঐক্যের চুক্তি হচ্ছে সেখানে আফ্রিকা ও মুসলিম বিশ্ব অনৈক্য ও দুর্বলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আফ্রিকার জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্য, ঝগড়া-ফাসাদ ও বিবাদের কারণে তারা ধ্বংস হচ্ছে দিন দিন।

বর্তমান মুসলিম বিশ্ব ও আফ্রিকার দেশসমূহের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও আফসোসের বিষয় যে, যেখানে সারা বিশ্ব ঐক্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সেখানে তারা মনন ও মানবতা বিধ্বংসী অনৈক্য আর হিংসা হানাহানির দিকে এগুচ্ছে। মুসলিম দেশ তথা মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বের শক্তিশালী মুসলিম দেশগুলোকে যুদ্ধের দিকে অনুপ্রাণিত করছে। অথচ মুসলিম বিশ্ব ও আফ্রিকার

www.pathagar.com

দেশ-সমূহের উচিত ছিল, বর্তমান চ্যালেঞ্জের সামনে মানব ও মানবতা বিধ্বংসী হিংস্র থাবার মোকাবেলায় একটি বৃহৎ শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্ব ও আফ্রিকান দেশসমূহের মধ্যে একটি ঐক্য ও শান্তি চুক্তি স্থাপন করা। যাতে সারা বিশ্বকে যুদ্ধবিগ্রহ আর বিপর্যয় থেকে হেফাযত করতে পারে।

আমাদের পূর্ব আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য বিচ্ছিন্নতা ও পরস্পর হিংসা হানাহানি ও বিভেদের মূল কারণ হচ্ছে, শত্রু পক্ষ আজ মুসলিম বিশ্বে তথা মুসলিম উম্মাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করে সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে। সুতরাং আমাদের শুধুমাত্র আমাদের অনৈক্য আর বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করলে চলবে না। অবশ্যই আমাদের মূল কারণ সম্পর্কে তত্ত্ব-তালাশ করতে হবে এবং চিরতরে তার মূল উৎপাটনের ব্যবস্থা নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলিম বিশ্ব তথা মুসলিম উম্মাহ তাদের নিজের মধ্যকার বিবাদ-বিচ্ছেদ ভুলে গিয়ে শত্রু পক্ষের এ শক্ত শিকড় উপড়ে ফেলতে সক্ষম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের দুর্বলতা কেটে ওঠা সম্ভব হবে না।

অবশ্যই আরব বিশ্বের সেই ক্ষমতা আর নেই যে, তারা মুসলিম বিশ্বের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করবে। অথচ আরব বিশ্ব ছিল মুসলিম বিশ্ব তথা মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রাণ ও মেরুদণ্ড, সারা মুসলিম বিশ্বের সাথে তাদের ছিল যোগসূত্র। কিন্তু আফসোস আজ সেই আরব বিশ্ব তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া-ঝাটি আর হানাহানির কারণে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তাদের ঐতিহ্য গৌরব ও মূল্যবোধ হারিয়ে দুর্বল ও অসুস্থ্য বিশ্বে পরিণত হয়েছে। এ সুযোগে তার ঘাড়ে চেপে বসেছে শত্রুপক্ষ, যা আজও বিদ্যমান। তাদের এ অনৈক্য আর দুর্বলতার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আরব বিশ্বের সাথে বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে শুল্কমুক্ত পণ্য আমদানি ও রপ্তানির চুক্তি করে আরব বিশ্বকে তাদের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করছে। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের লেনদেন, বাজার ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কল-কারখানা ইউরোপিয়ানদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। যার কারণে আরবের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ঐক্য-সংহতি, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সুযোগ হারাচ্ছে। ঝগড়া ঝাটি আর বিবাদের নতুন নতুন রূপ প্রকাশ পাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আরব বিশ্বের সাথে মুসলিম বিশ্ব তথা মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য-সংহতি আর সম্পর্কের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ধর্ম বিবেক ও স্বার্থ সবই ঐক্যের আহবায়ক

ধর্ম যেমন আমাদেরকে ঝগড়া-বিবাদ অনৈক্য বিচ্ছিন্নতার নির্দেশ না দিয়ে ঐক্য ভ্রাতৃত্ব সহানুভূতি ও সহমর্মিতার নির্দেশ প্রদান করে, তেমনি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি স্বার্থ

www.pathagar.com

আমাদেরকে সেই ঐক্য ভ্রাতৃত্ব সহানুভূতি ও সহমর্মিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাহলে কেনই বা আমরা বিবেক-বুদ্ধি-ধর্ম ও জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করব? এ বিষয়ে আমাদেরকে অবশ্যই গভীর ও তাত্ত্বিকভাবে গবেষণা করতে হবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ এরশাদ করেন;

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করে না যতক্ষণ না সে জাতি স্বয়ং নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন না করে।"

(সূরা আর রায়াদ : ১১)

ঝগড়া-বিবাদ বিচ্ছিন্নতা হিংসা হানাহানি হচ্ছে সামাজিক রোগ, তেমনি মুসলিম মনীষী সম্পর্কে কুৎসা রটনা, কুমন্ত্রণা ইত্যাদি সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। তাই আমাদের উচিত এ সকল বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে কারণ উদঘাটন করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

আমরা সবাই জানি যে, সম্মিলিত সমাজ ব্যবস্থার জন্য একতা, সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণ হয়, ব্যক্তি সমাজের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্যতা বজায় থাকে। অতএব ব্যক্তি ও সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য এ বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানবজগত মূলত মানুষের চরিত্র ও অভ্যাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। একজন ব্যক্তির কাজ তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। আর দায়িত্ব পালন তার সামাজিক অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক গঠনের উপর নির্ভর করে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি। মোটকথা মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সমাজ গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। যার শুরু হয় বাবা-মা বা পরিবার থেকে আর শেষ হয় সমাজ গঠনের মাধ্যমে। সমাজই হচ্ছে মানুষের জীবন-যাপন ও স্থায়িত্বের মাধ্যম। সমাজ এবং তৎসম্পর্কীয় বিষয়াবলী মানবিক করণীয় গুণাবলীর বিশেষ একটি অংশ, যা সমাজের সদস্যদের মধ্যে উন্নতি, অগ্রগতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। অতএব সমাজ ছাড়া মানব জগত ও তার প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ অর্জন হয় না। প্রতিটি মানব সন্তান তার জীবনের দীর্ঘ একটি সময় শৈশবের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করে, আর এ সমাজ তাকে সহযোগিতার মাধ্যমে উপযুক্ত অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয়।

মানুষের ব্যক্তি জীবনে অনুভূতি, মূল্যবোধ ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় ইত্যাদি অমূল্য সম্পদ, মানুষের বাস্তব ও কর্মজীবনে এগুলো হচ্ছে হারানো মানিকের ন্যায়। সমাজে কোন ধরনের দান খয়রাত, কল্যাণ, ভালবাসা দয়া অনুগ্রহ, ন্যায়-ইনসাফ ইত্যাদির কোন মূল্য নেই যদি মানুষের চরিত্র ভাল না থাকে। সামাজিক কাজ কর্মগুলো যৌথভাবেই হয়ে

www.pathagar.com

থাকে। সমাজ ছাড়া কোন মানুষই প্রকৃত মানুষ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। সমাজের মাধ্যমেই মানুষ তার সকল অধিকারপ্রাপ্ত হয়। সমাজ ছাড়া একাকী জীবনের কোন মূল্য নেই।

মুসলিম উম্মাহ্‌র সংস্কৃতিতে যৌথ প্রয়াসের সংকট, হারানো বস্তু কিছুই দিতে পারে না

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনের যৌথ ও সম্মিলিত প্রয়াসের দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠছে। ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি দায়িত্ব কর্তব্য পালনে আত্মিক বা বাহ্যিক যে কোনভাবেই হোক এ সমস্যা নিরসন করতে হবে। এজন্য সম্মিলিত প্রয়াসের দিকটির সীমারেখা নির্ধারণ করা ব্যক্তিক ও সামাজিক কর্তব্য। মুসলিম উম্মাহ- জাতির প্রতিটি সদস্য ও তাদের সন্ত ানদেরকে উন্নতি অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ সীমারেখা নির্ধারণ যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারবে। আমরা যখনই সমাজের সদস্যদের সম্মিলিত দায়িত্ব পালনে ত্রুটি দেখতে পাব এবং সমাজে একে অপরের সাথে সম্পর্কের বিচ্যুতি দেখতে পাব, তখনই আমাদেরকে সমাজ ও সমাজের সংস্কৃতি, শিষ্টাচারের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে। কারণ, সমাজে সাংস্কৃতিক, শিষ্টাচারিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সঠিক ও সুশীল সমাজ ব্যবস্থাপনায় হতাশা সৃষ্টি করে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে থাকে। যে সমাজেই এ ত্রুটিগুলো দেখা দেয় সেই সমাজই পর্যায়ক্রমে নিম্ন ও অধঃপতনের দিকে চলে যায়। আমরা জানি যে, একটি মানব শিশু তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের চিন্ত া-চেতনা, অনুভূতি ইত্যাদি দু'টি মৌলিক উপাদান থেকে সংগ্রহ করে। একটি হচ্ছে স্বভাব, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার প্রয়োজনের অনুভূতি ও বিবেকভিত্তিক অনুভূতির মাধ্যমে। আরেকটি হচ্ছে সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি।

আত্মিক ও অনুভূতিগত বিষয়টি শিশুকাল থেকেই মানবিক ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর বাহ্যিক বিষয়গুলো আত্মিক অনুভূতির একটি মাধ্যম মাত্র। কারণ, শিশুকাল ব্যতীত ব্যক্তি গঠন ও কার্যকরী অনুভূতি- শক্তি পরিপূর্ণভাবে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, ব্যক্তি গঠন শিশুকাল থেকে শুরু হয়, মানব জীবনের শেষ মুহূর্তে পূর্ণতা লাভ করে।

পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্যই সভ্যতা সংস্কৃতি, পরিচর্যার রীতি-নীতির ক্ষেত্রে আত্মিক ও অনুভূতির দিকটি বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশগত যে সকল সংস্কৃতি শিশুদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তা ব্যক্তি গঠন ও তার অনুভূতি সৃষ্টির সর্বপ্রথম উপাদান, শিশুদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের জন্য পরিবেশগত বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখতে হবে। পরিবেশ যত বেশি

www.pathagar.com

শক্তিশালী ও শিক্ষণীয় হবে, শিশুদের তত বেশি মনমানসিকতা ও অনুভূতি শক্তির উন্নতি হবে। তাই সমাজের শিশুদের উন্নতি সাধনের জন্য শৈশব থেকেই তাদের অনুভূতির দিকটি বিচার বিশ্লেষণ করে কার্যপদ্ধতি তৈরি করতে হবে। যাতে এটি তার ভবিষ্যৎ পথ চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে তাকে সক্ষম করে। এজন্য সমাজের ব্যক্তি গঠনের কাজ শিশুকাল থেকে শুরু করা বাঞ্ছনীয়, তাহলেই যথাযথ ফলাফল উপভোগ করা সম্ভব।

ইসলামী গবেষণায় যৌথ প্রয়াস

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির চিন্তা, গবেষণার ইতিহাসের দিকে অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে হতাশা, নিরাশা, অধৈর্য ইত্যাদির চিত্র ভেসে ওঠে। সমাজের ইতিবাচক নেতিবাচক সর্বক্ষেত্রে অসংখ্য অগণিত সমস্যা আর সংকট। সমাজের সদস্যবৃন্দ তাদের দায়-দায়িত্ব সঠিক ও যৌথভাবে পালন করছে না। অথচ মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য যৌথ ও সম্মিলিতভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন অতীব প্রয়োজন। রাসূলের যুগে তাই ছিল, সম্মিলিত কার্যাবলীর ধারা সমুন্নত ছিল। সমাজের সদস্যদের অনুভূতি-উপলব্ধির উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছিল।

আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন;

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভাল বাসে। মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না। এবং নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর : ৯)

যৌথভাবে কোন কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাধারণত ত্রুটি বিচ্যুতি ও স্বল্পতা থাকে না, এজন্য সমাজের সকল স্তরের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ অপরিহার্য। আর জাতির মূল অধিবাসীদের মধ্যে সেই যৌথ উদ্যোগটিই প্রচলিত ছিল। কোন ধরনের যুলুম, নির্যাতন, বিরোধ ও প্রতিরোধ তাদের এ যৌথ উদ্যোগ থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তারা রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর তাদের এ যৌথ উদ্যোগ আরো উন্নত হয়, সমাদৃত হয় সর্বমহলে। এতে একত্ববাদের বিশ্বাস খুবই সহজভাবে তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। প্রতিষ্ঠা হয় পরস্পর সহযোগিতা, সহমর্মিতা আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। ন্যায়

www.pathagar.com

ইনসাফের ভিত্তিতে চলতে থাকে সমাজের সকল কার্যক্রম। রাসূল ﷺ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিধান রচনা করেন। সমাজের শিশুদের অধিকার রক্ষা করেন। সমাজের মুসলিম-অমুসলিম সকলের সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার বুঝিয়ে দিলেন। অনেক দায়-দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে গেলেন। সমাজে এসব কিছু প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের সদস্যদেরকে যৌথ ও সম্মিলিতভাবে কার্যসম্পাদনের প্রতি উৎসাহিত করা। এমনকি রাসূল ﷺ কোন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তার ঋণ আদায়ে যথেষ্ট না হলে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঋণ দাতাকে তার প্রাপ্য পরিশোধ করতেন। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন : "যে ব্যক্তি ধন সম্পদ রেখে মারা গেল, তার ধন-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য আর যে সম্পদহীন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, তার দায়িত্ব আমার উপরে" অর্থাৎ আমিই তা পরিশোধ করব। এজন্য রাসূলের যুগে মুসলমানরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের জান-মাল উৎসর্গ করেছিল এবং অন্যকে উৎসাহিত করেছিল। নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়েছিল। রাসূল ﷺ মুসলমানদের কোন প্রয়োজন ধন-সম্পদের সাদকা বা আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গের আহ্বান করলে সাহাবিগণ সাথে সাথে প্রিয়বস্তু পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিতেন। যেমন উৎসর্গ করেছিলেন আবু বকর (রা.) তার সমস্ত সম্পত্তি। অথচ আবু বকরের ছিল অভাবী সংসার। রাসূল ﷺ আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর! তোমার সন্তানাদির জন্য কী রেখে এসেছ? আবু বকর উত্তরে বলেন; আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে রেখে এসেছি। কারণ, আবু বকর (রা) ছিলেন জ্ঞানী বুদ্ধিমান, মেধাবী, উদার ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। সেজন্য তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আবু বকরের (রা) এই বিচক্ষণতার ভেতর দিয়ে শুধুমাত্র তার গভীর ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি, বরং তার সামাজিক নিয়ম-নীতি, আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কীয় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে; যার জন্য আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সাহাবাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। আবু বকর (রা.) এর মাহাত্ম ও বিচক্ষণতা তারাই বুঝতে পারবে, যারা যৌথ ও সম্মিলিত উদ্যোগের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত। যৌথ, সম্মিলিত, সহমর্মিতা, সহযোগিতার সমাজে দারিদ্র্যতার কোন স্থান নাই। একজন সম্পদের পাহাড় জমাবে, আরেকজন না খেয়ে থাকবে, এটা যৌথ সমাজ হতে পারে না। যৌথ সমাজে সকলেই একে অপরের সহযোগী। তারা সবাই ভ্রাতৃত্বঘন পরিবেশে জীবন-যাপন করে। রাসূল ﷺ-এর শাসনামলের সমাজ-ব্যবস্থা, অনুভূতি, দায়িত্ব পালন এবং জালিম ও জাহিলী যুগের বাদশাহের শাসনামলের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। জাহেলী জালেম বাদশাহদের আমলে সমাজ-ব্যবস্থায় সম্মিলিত ও যৌথ প্রয়াসের কোন উদ্দ্যোগ ছিলই না। অপরদিকে বিচার-ব্যবস্থা, চিন্তা-গবেষণা ইত্যাদি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। কারণ, তারা আল্লাহর বাণী ও তার বিধান থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। রাসূল ﷺ এরশাদ

www.pathagar.com

করেন : "যে ব্যক্তি কোন ঘটনা সচক্ষে দেখে, আর যে শুধু শুনে তারা সমান নয়। তাদের কোন দলিল ও অভিজ্ঞতাও ছিল না। আর অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় প্রমাণ ও দলিল রাষ্ট্র পরিচালনা ও সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হতে পারে না।

এজন্য চিন্তাবিদ গবেষককদের মতে রাসূলের প্রশ্নের উত্তরে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর ঈমান, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর উপর গভীর ভরসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। হজরত আবু বকর (রা.) এর মত হৃদয়বান ব্যক্তিত্বের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, যারা তাদের সর্বস্ব আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিতে পারে। আবু বকরের (রা.) ছোট একটি উত্তরের ভেতর দিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সেটি হচ্ছে তিনি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, সেই পরিবেশের চিত্র। আবু বকর (রা.) সেই পরিবেশকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রেখেছিলেন। তার ভূমিকাগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী, প্রাঞ্জল, সুচিন্তিত, সুবিবেচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। যার কারণে তাকে কখনো সামাজিকভাবে লজ্জিত হতে হয় নি। বরং তিনি যৌথ ও সম্মিলিত কার্যকলাপগুলো অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দারিদ্র্যতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণায়, উপহাসের কোন ভয় ভীতি তার ছিল না। শুধু তাই নয়, তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা ও মানুষের অধিকার রক্ষা ও প্রয়োজন মেটাতে অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল-সম্পন্ন ছিলেন।

তিনি তার প্রয়োজনে অতিরিক্ত কোন কিছু জমা করে রাখতেন না। মানুষের প্রয়োজনে সবকিছু বিলিয়ে দিলেন। কারণ, রাসূল ﷺ এর বাণী হচ্ছে, ইসলামী হুকুমতের প্রধান বিষয় হচ্ছে জনগণের দায়িত্ব, অধিকার পালন ও রক্ষা করা, অভাব অনটন হলে তা উত্তরণের ব্যবস্থা করা। বিপদগ্রস্ত হলে সার্বিকভাবে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। আর সমাজ ব্যবস্থা ছিল, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা। অভাবী, গরিব-দুঃখীদের সহায়তা করা, মৃত্যুর পর আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সহমর্মিতার প্রতি উৎসাহিত করা। কারণ, রাসূলের বাণী, যে ব্যক্তি ধনসম্পদ রেখে মারা যায় তার পরিত্যক্ত সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য, আর যে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় যারা গেল তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর। এজন্য হজরত আবু বকর (রা) এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে কোন সময় যে কোন সমস্যা ও অভাবে তিনি রাসূল ﷺ ও তার সমাজকে তার সাথেই পাবেন। এজন্য তার ধন-সম্পদ দুঃসময়ের জন্য জমা রাখার কোন প্রয়োজন নেই। যাদের একটু বিবেক আছে, অনুভূতি আছে, তারা অনায়াসে অনুধাবন করতে পারবে যে, হজরত আবু বকর (রা.) এর ভালবাসা ও সুসম্পর্ক রাসূল ﷺ এর প্রতি কী ধরনের ছিল। যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রাসূল ﷺ এর প্রদর্শিত রীতি-নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হত।

www.pathagar.com

কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। সামাজিক অধিকার আদায়ের প্রতি কোন খেয়াল নেই। সবাই আজ সম্পদ পুঞ্জিভূত ও জমা করার প্রতি ব্যস্ত। দান-সদকা ইত্যাদি করা হচ্ছে লোক দেখানোর জন্য, গৌরব অর্জনের জন্য। দরিদ্র দিনমজুরদেরকে তাদের অনুগত আর বশ করার জন্য। আজকের সমাজে প্রকৃত মুমিন ও মানবতার খুবই অভাব। নেই তাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও যৌথ-প্রয়াস। সে সমাজের উপর নির্ভরশীল নয়, সমাজও তার উপর নির্ভরশীল নয়। সমাজের যুবক ছেলেরা স্বেচ্ছায় সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সামাজিক সংগঠনগুলো তাদের সামনেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের সমাজের প্রতি একটুকুও খেয়াল নেই।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াসের দুর্বলতার ভয়াবহ প্রভাব

বর্তমানে যৌথ প্রয়াসের অধঃপতন ও অবনতির কারণে মুসলিম উম্মাহ ও জাতি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্বলতা অনুভব করছে। পৃথিবীতে যখন যুলুম-নির্যাতন, ফিৎনা ফাসাদ ও কৃপণতা পরিলক্ষিত হয়, তখন সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, সামাজিক সংগঠন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ঝগড়া-বিবাদের আগুন জলে ওঠা হতবাক হওয়ার কোন বিষয় নয়। মুসলিম ব্যক্তির মাঝে সামাজিক দায়িত্ব পালন ও অধিকার আদায়ের দুর্বলতার কারণে সামাজিক সংগঠনগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ, আজকে ঐক্য-অনৈক্যের ধারা বদলে গেছে। দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষ দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকছে, অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। ব্যক্তি তার নিজ ও নিজের সন্তানাদির অধিকার ও চাহিদা পূরণে ব্যস্ত। অসহায়, দরিদ্র ও সমাজের জন্য কিছুই করছে না। সে মনে করে সমাজের প্রতি তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। অথচ এ সমস্ত বিষয় মোটেও উচিত নয়। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, "যে অন্যের প্রতি দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হয় না।"

আজকে অধঃপতনের যুগে মুসলিম সন্তানাদির ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া ও পরিচর্যার ব্যবস্থা আশ্চর্যের কোন বিষয় নয়। বরং মুসলিম সন্তানদের স্তর উন্নত করতে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা ও দুরাবস্থার পরিবর্তন করে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এটিই ইসলামের চাহিদা। একটি সমাজ যদি তার রীতি-নীতি অনুযায়ী গরিব-দুঃখি ও অভাবী লোকদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিয়ে তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তাহলে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি তাকবে না, তাদের সন্তানেরা অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হবে না। এ ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করলে সমাজে সকলের মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। সমাজের যৌথ ও সম্মিলিত প্রয়াস

www.pathagar.com

দুর্বল হয়ে পড়লেও ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারলে সমাজের ফিতনা ফাসাদ যুলুম নির্যাতন দূর হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ করবে না। এ সকল গুণাবলী একমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাতেই পাওয়া যায়। সমাজ ব্যবস্থা সুস্থ ও সঠিক না হলে সমাজে অন্যায়, অবিচার, যুলুম-নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। ঝগড়া-বিবাদ, ফিৎনা-ফাসাদ ইত্যাদির মাধ্যমে ঐক্যের ফাটল সৃষ্টি হয়, মান-সম্মান ও ইজ্জতের হানি হয়।

রাসূল ﷺ এর যুগে ব্যক্তি গঠনের ব্যাপারে ছিল যৌথ ও সম্মিলিত উদ্যোগ, যার কারণে অতি অল্প দিনেই সমাজের প্রতিটি সদস্যই অধিকার সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছিল। দান খয়রাত, পরস্পর সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বে ইসলামের যে অবদান রয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। খেলাফতের রাজনীতি ও খুলাফায়ে রাশেদার পতনের পর জাহেলী স্বৈরশাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে, ন্যায়-ইনসাফ, সত্য-নিষ্ঠা, ও সংশোধন, পরিশোধনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতার ফলে পশুত্বের চরিত্রের বিকাশ ঘটে, জাতির ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়। গোত্র-গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক শাসনের ফলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহ ও সমাজ ব্যবস্থা অবহেলা ও অপমানের পাত্রে পরিণত হয়। তখন কিছু কিছু লোক জাতির এ মুমূর্ষু পরিস্থিতিতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক ফিতনা, ফাসাদ থেকে দূরে সরে গিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদির দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর খেসারত ও সর্বনাশ তাদেরকেও ছেড়ে দেয়নি, জাতির সকল আলেম উলামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ জনগণকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সংশোধন ও পরিশোধনের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে যে, তখন মুসলমানদের প্রতিরোধেরও কোন ক্ষমতা ছিল না। সঠিক পথের পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা জাতির কাছে ছিল না। ছিল না সমাজ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য চিন্তা করার মত কোন সুযোগ, বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সামাজিক সংগঠনসমূহ। শিশুদের আত্মিক মানসিক ও জৈবিক বিকাশের কোন পথ খোলা ছিল না। সাধারণ মানুষ তখন সংশয় আর সন্দেহের মাঝে ডুবে গিয়েছিল, বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা। জাতি তথা মুসলিম উম্মাহর এ সকল সমস্যা ও সংকট নিরসনের জন্য প্রশাসনিক লোক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক-সহ সচেতন কেউই কোন ভূমিকা রাখে নি। জাতির পরিশোধনের কোন চিন্তা করে নি। অথচ তাদেরই দায়িত্ব ছিল চিন্তা গবেষণার মধ্য দিয়ে জাতির সমস্যা নিরসনের পথ খোঁজে বের করা। যদি তারা তাদের দায়িত্ব আদায় করত তাহলে ইসলামী ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠত। সকল সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসত। তারা যদি শুধুমাত্র ধর্মীয় পর্যায়ে সীমিত না রেখে বাল্য বয়সে শিশুদের যথাযথ

www.pathagar.com

তালিম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করত, তাহলে শিশুরাই জাতির পরিবর্তনের ও পরিশোধনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করত। আর জাতির পরিশোধনে সফলতা আসত। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির এ দীর্ঘ মেয়াদী ঝগড়া-বিবাদ আর করুণ পরিস্থিতির সময় সকল দল গ্রুপ তাদের নিজেদের অবস্থানে থেকে শক্তি সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। কেউ কেউ আলাদাভাবে অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় মগ্ন ছিল। যাতে এ সকল সমস্যা মোকাবেলায় যতটুকু সম্ভব কার্যকরী ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। এবং সাধারণ মানুষ যাতে যুলুম নির্যাতন, অভাব অনটন ও দরিদ্রতার শিকার না হয়ে, সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে।

সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণে যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা

মুসলিম উম্মাহ্‌র বিপর্যয় এবং চিন্তা ও গবেষণা জগতের অবক্ষয়ের শিকড় যখন মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, আমি তখন ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর প্রতি মনোনিবেশ করি, যাতে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা ও যৌথ প্রয়াসের যে অবক্ষয় হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। সামাজিক জীবন থেকে একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতা নির্মূল করা যায়।

মুসলিম উম্মাহ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ইহকালীন জীবনকে প্রাধান্য না দিয়ে আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। ইহকালীন জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেনসহ সর্ব বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ একটি নীতির ভেতরে চলে আসে। দুনিয়াবী জীবনের অস্থায়ী শান্তির জন্য ধন-সম্পদ আর অট্টালিকার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের চেষ্টা করে।

সাধারণ সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা এবং বিশেষ সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যম হচ্ছে ইসলামী ফিকহ-শাস্ত্র। অর্থাৎ ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্র মুসলিম উম্মাহর আত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং বুদ্ধি ও চিন্তা জগতের উন্নয়ন সাধনের মাইল ফলকে পরিণত হয়ে সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করেছিল। মুসলিম উম্মাহর সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তাজগতে ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু সেই ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র যৌথ উদ্যোগ ও সম্মিলিত প্রয়াসকে উপেক্ষা করে বাল্য বয়সে আত্মিক ও মানসিক বিকাশের বিষয়াবলীকে গুরুত্ব না দিয়ে এবং ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের উপর আরোপিত সমস্যাবলীর সমাধান ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধুমাত্র আমল, যিকির আর ইবাদত কেন্দ্রিক হয়ে পড়ল। মানুষের বাস্তব জীবনের সাধারণ কার্যাবলী ও সমস্যাবলীর সমাধানে ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র সংকোচিত হয়ে পড়ল। এভাবে ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র সংকোচিত আর

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে এক পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহর পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংস্কার ও পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। হারাতে থাকে মুসলিম উম্মাহ ও জাতি তার পুনর্গঠনের চাবিকাঠি ও অস্তিত্ব।

এজন্য ইসলাম সামাজিক ঐক্য-সংহতি ও যৌথ প্রয়াসের ক্ষেত্রে বাল্যকালকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। গোত্র-বংশ, জাতি-গোষ্ঠী ও উম্মাহর সকল ত্রুটি বিচ্যুতির সমাধান ও সংশোধন করে সঠিক সমাজগঠনের জন্য বাল্যকালই হচ্ছে একমাত্র উপযুক্ত সময়। তাই শিশুদেরকে তাদের বাল্য বয়সেই জাতির সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য ইসলামী শিষ্টাচার আদব-কায়দা নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিতে হবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি তাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার মূল ভিত্তি শিশু বয়সেই স্থাপন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যাত্রাপথের সঠিক সফলতা অর্জন করতে পারবে না। জাতির যাত্রাপথের মূল ভিত্তিকে সংশোধনের মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজ গঠন সম্ভব এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের মাধ্যমেই জাতির সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব।

তেমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইলমে ফিকহ ও ইসলামী তালিম-তারবিয়াতের বই পুস্তকের সংশোধন ও সংস্কার সাধন করে সেই পরিশোধিত বই পুস্ত কগুলোকে জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জাগরণ সৃষ্টি হবে না।

মোটকথা, মুসলিম উম্মাহকে ব্যক্তি ও সামাজিকভাবে আত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করার মাধ্যমে জাতির জাগরণ সৃষ্টি করতে হলে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, তালিম তারবিয়াত ও ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের বই পুস্তকের সংস্কারের মাধ্যমে বাল্যবয়সেই জাতির শিশুদের হৃদয়ে সংস্কারের বীজ বপন করতে হবে।

সামাজিক পরিবর্তন ও প্রশিক্ষণমূলক বক্তব্য

আমরা যদিও স্বীকার করে নিলাম যে, জাতি আজ বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত। তেমনিভাবে আমরা এও স্বীকার করে নিলাম যে জাতি আজ আত্মিক মানবিক ও বৈষয়িক মূল্যবোধের প্রতি অমুখাপেক্ষী। কিন্তু আমরা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতির অবনতি, অবক্ষয়, দুর্বলতা, বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অপরাগতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আমাদেরকে স্বীকার করতেই হয় যে, তার মূল কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক ও চিন্ত াগবেষণামূলক মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা। যার প্রভাব শেষ পর্যন্ত শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ জীবন যাপনের সর্বক্ষেত্রে প্রকটভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

www.pathagar.com

সুতরাং আমরা যখন দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলিম উম্মাহ ও জাতির এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করছি এবং তাও লক্ষ্য করছি যে, দীর্ঘকাল থেকে জাতির পরিবর্তন, পরিশোধন ও সংস্কার সাধনের যথেষ্ট চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয় নি, এবং সফলতা অর্জন করাও যায় নি। তাই অনায়াসে প্রশ্ন জাগে যে তাহলে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার পন্থা কি? কীভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে আবার শক্তি সঞ্চার করা যাবে? এবং কোন পথ ও পন্থা অবলম্বন করলে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পরিশোধন, পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা যাবে? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উদ্ভাবন হয়ে থাকে, যেগুলোর উত্তর খুঁজতে মুসলিম উম্মাহ আজ পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে নি।

এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রথম থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ্‌র চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা ও সকল প্রকার সমস্যার মূল কারণ উদ্‌ঘাটন করে সংস্কারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মুসলিম উম্মাহর ও জাতির সবচেয়ে মারাত্মক ও বৃহৎ সমস্যা হচ্ছে, সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনের সমস্যা, উদ্ভাবন ও আবিস্কারের সমস্যা, মানবিক মর্যাদা ও সাহসিকতার সমস্যা, সহযোগিতা, সহমর্মিতার সমস্যা ইত্যাদি। এ ধরনের সমস্যার জবাবে বলা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে অবশ্যই তাদের ব্যক্তি গঠনের ক্ষেত্রে আত্মিক, মানসিক ও বৈষয়িক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। একত্ববাদ ও প্রতিনিধিত্বমূলক মূলনীতির ভিত্তিতে ইতিবাচক উদ্ভাবনী শক্তিতে শক্তিশালী করে মুসলিম উম্মাহকে গঠন করতে হবে।

আর মানুষের আত্মিক ও মানসিক এবং বুদ্ধিগত মৌলিক পরিবর্তন সাধন একমাত্র বাল্য বয়সেই সঠিক তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমেই সম্ভব।

আত্মিক, মানসিক ও বৈষয়িক বিকাশের মাধ্যমে জাতির সামাজিক পরিবর্তন সাধন করতে হলে অবশ্যই শিশু বয়সেই সঠিকভাবে তালিম তারবিয়াত ও লালন পালনের জন্য ইতিবাচক ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কাঠ বা লাকড়ি যখন শুকিয়ে বাঁকা হয়ে যায়, সেই বাঁকা কাঠকে যেমন সোজা করা যায় না, তেমনিভাবে শিশুদেরকে তাদের বাল্য বয়সে শিক্ষা-দীক্ষা, তালিম তারবিয়াতেরও সঠিকভাবে লালন-পালন না করলে ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে কখনো ভাল কিছুর আশা করা যায় না। ব্যক্তি তখন জাতির চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ও মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিবর্তনের আহ্বানে সাড়া দেবে না। জাতি তখন আত্মিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। চিন্তা-চেতনা, দান-খয়রাত, আবেগ-অনুভূতি, ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে অবনতি আর দুর্বলতা দেখা দেবে। মুসলিম উম্মাহর পরিবর্তন, সংশোধন আর সংস্কার সাধনের চেষ্টা প্রচেষ্টা পানিতে নকশা আঁকার ন্যায় অস্থায়ী ও অনর্থক হয়ে যাবে। জাতির আর্ত চিৎকারে কেউ তখন সাড়া দেবে না, এগিয়ে আসবে না জাতির মহা সংকট ও বিপদে। তখন মুসলিম হারিয়ে

www.pathagar.com

ফেলবে আর্থিক ও মানসিক মনোবল। শেষ হয়ে যাবে জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা।

তাই আজ মুসলিম উম্মাহ্‌র উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ- ও সফলতার জন্য সৎ ইচ্ছা ও দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। কারণ, সদিচ্ছা আর দৃঢ় সংকল্পই অনুভূতির জন্মদাতা। এ দু'টি ছাড়া সঠিক অনুভূতি জাগ্রত হয় না। এজন্য শিশুদের বাল্য বয়সেই শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও তালিম তারবিয়াতের মাধ্যমে অনুভূতি স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে মানব সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বিবেক বুদ্ধির মাধ্যমে তার মধ্যে অনুভূতির সঞ্চার হবে। তার ব্যক্তি সত্তাকে জাতি ও মুসলিম উম্মাহর কাজে নিয়োজিত করতে পারবে। আসলে এ ধারণাটি সঠিক নয়, বরং মারাত্মক ভুল। কারণ, একটি গাছের চারা যেমন ছোট থাকতে সোজা করে না তুললে বড় হলে যেমন সোজা করা সম্ভব হয় না, তেমনিভাবে একটি মানব সন্তানকে বাল্য বয়সে তার মধ্যে অনুভূতি না জাগাতে পারলে প্রাপ্ত বয়সে তার মধ্যে অনুভূতি জাগানো সম্ভব নয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের যতই ওয়াজ নসিহত আর উপদেশ প্রদান করা হোক না কেন তার মধ্যে আশানুরূপ পরিবর্তন সাধন ও অনুভূতির স্পৃহা জাগানো সম্ভব নয়। কারণ, ছোট বেলায় সে এ বিষয়ে অব্যস্ত হয় নি। এজন্য বাল্য বয়সেই মানব-সন্তানের অনুভূতির স্পৃহা জাগাতে হবে।

ইসলামী তারবিয়াতী বক্তব্য অনুধাবনের উপায়

স্থান, কাল, পাত্র, অবস্থা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভেদে রেসালতের যুগে ইসলামী বক্তব্য যদিও ভিন্ন ছিল, তথাপি তখনকার সময়ে ইসলামী বক্তব্য মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তারকারী এবং কার্যকর ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে বক্তাগণ ইসলামী বক্তব্যের স্থানকাল পাত্র ও অবস্থা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি, যার কারণে অনেক সময় তারা ইসলামী বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং অনেক সময় তাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন।

মানবিক শিক্ষার দুর্বলতা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কারণ

বর্তমান যুগে মানবিক শিক্ষার দুর্বলতার কারণে ইসলামী চিন্তা গবেষণায় দুর্বলতা ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। আমি নিজেও অনেক স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় এ ভুলের সন্ধান পেয়েছি। এ বিষয়ে আমার সর্বশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে "ইসলামিক দৃষ্টিতে রাজনৈতিক মতানৈক্য সম্পর্কে" যা প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা থেকে। সেখানে আমি সমাজে প্রচলিত আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও বিরোধ সম্পর্কে

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কার ও সংশোধনের প্রতিবন্ধকতার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সর্বশেষ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়েছে যে ব্যক্তি তার তরবারি সঠিক স্থানে না রেখে অন্য স্থানে রেখেছে এবং বিষয়-বস্তুকে তার সঠিক স্থানে না পৌছিয়ে ভুল স্থানে পৌছিয়ে দিয়েছে।

আমি ইতোপূর্বে ইসলামী চিন্তা-গবেষণা বিষয়ে অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যা 'ইসলামিক অর্থনৈতিক রূপরেখা' নামে কায়রোতে প্রকাশিত হয়েছে, আমি সেখানে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি এবং রাসূল ﷺ এর রাজনৈতিক জীবনে সেই মূলনীতির বাস্তবায়নের রূপরেখা এবং তৎকালীন রাজনীতিতে তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তেমিনভাবে আমাদের রাজনীতিতে তা থেকে কীভাবে উপকৃত হওয়া যার সে সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

অনুরূপভাবে আমি আমার সেই গবেষণায় ইলামী অর্থনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভ্রান্তির যে সকল কারণ রয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। আর তা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির নিয়ম-নীতি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নিয়ম-নীতির মধ্যে সংমিশ্রণ। এজন্য এটা অসম্ভব নয় যে, বর্তমানে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে ইবনে হাজম আন্দোলুসীর দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ তিনি ফতোয়া দিতেন যে, রাসূল ﷺ খায়বারের ইয়াহুদীদেরকে অর্ধেক ফলনের শর্তে জমি চাষাবাদ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা মদিনায় হারাম চাষাবাদ সংক্রান্ত সকল হাদিস এবং সুদ (রিবা) সংক্রান্ত সকল হাদিসকে রহিত করে ফেলেছে। কারণ, চাষাবাদ সম্পর্কে খায়বারের জমি সংক্রান্ত ইয়াহুদীদের সাথে চাষাবাদের হাদিস সর্বশেষ হাদিস। কিন্তু ইবনে হাজাম আন্দোলুসী আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সংমিশ্রণ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেন নি। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিয়ম নীতি আর আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নিয়ম নীতি এক নয়। তাই উভয় নীতির সংমিশ্রণ ভুল সিদ্ধান্ত ও চিন্তা-ভাবনার সৃষ্টি করে। সাধারণ পাঠক ও অনভিজ্ঞ সমাজ সহজে উভয় নীতির সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ পার্থক্যগুলো নির্ণয় করতে পারে না।

শ্রোতার ভিন্নতা অনুযায়ী বক্তব্যের ভিন্নতা

আমরা মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে দেখতে পাব যে, ওহির বক্তব্য ও সম্বোধন শ্রোতার ভিন্নতা, অবস্থার ভিন্নতা এবং প্রয়োজনের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। এতে রয়েছে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বক্তব্য, স্থায়ী জগত ও অস্থায়ী জগত সম্পর্কে বক্তব্য, স্থানকাল অনুযায়ী বক্তব্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চিন্তা গবেষণামূলক বক্তব্য, মুমিন-মুসলিমের জন্য আত্মিক ও মানসিক উপদেশমূলক বক্তব্য, অহঙ্কারী ফাসেক ও পাপিষ্ঠদের জন্য শাস্তি ও ভয়-ভীতিমূলক বক্তব্য, সমাজকর্মী ও পথ-প্রদর্শনকারীদের

www.pathagar.com

জন্য বক্তব্য, শিশু-কিশোর লালন-পালন সংক্রান্ত বক্তব্য, আইন প্রশাসন ও বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানমূলক বক্তব্য, বিচারক ও নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের জন্য বক্তব্য, সাধারণ মানুষের জন্য বক্তব্য, নবুওয়াত ও রেসালাত সংক্রান্ত বক্তব্য। এভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের রয়েছে আলাদা আলাদা বক্তব্য এবং আলাদা আলাদা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তেমনিভাবে রয়েছে এখানে সত্য মিথ্যার ব্যাপার, নাসিখ (ناسخ) মনসুখ (منسوخ) অর্থাৎ রহিতকারী ও রহিত বিষয় ইত্যাদির ব্যাপার। এ সকল বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রোতার ভিন্নতা, অবস্থানের ভিন্নতা ও প্রয়োজনের ভিন্নতার কারণে ইলমে ওহির ভিন্নতা চিন্তা-গবেষণা দাবি করে।

এজন্য সভ্যতা ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণার বিষয়ে যে সমস্যাটি হচ্ছে, সেটি হচ্ছে সমাজ গঠন ও চিন্তা-গবেষণা নানা বিষয়ের সমীকরণ। সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি যে, সেখানে রয়েছে একটি বক্তব্যে নানা ধরনের বিষয়ের সংমিশ্রণ, শান্তি ও ভয়ভীতির বক্তব্যে উৎসাহ ও উপদেশমূলক বক্তব্যের সংমিশ্রণ, কাফেরদের জন্য প্রদত্ত বক্তব্যে মুমিনদের বক্তব্যের সংমিশ্রণ, নবুওয়ত ও রেসালতের বক্তব্যে রাজনীতি ও প্রশাসনিক বক্তব্যের সংমিশ্রণ, নেতৃবর্গ ও প্রজ্ঞাবানদের বক্তব্যে গ্রাম্য ও অশিক্ষিত লোকদের বক্তব্যের সংমিশ্রণ, শিশু-কিশোরদের লালন পালন ও পরিচর্যামূলক বক্তব্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের দায়দায়িত্বমূলক বক্তব্যের সংমিশ্রণ, কিন্তু প্রেক্ষিতের ভিন্নতায় বক্তব্যের ভিন্নতা বিবেচিত না হওয়ায় গবেষণাগত ইসলামী বক্তব্য দুর্বল হয়ে পড়েছে। যার প্রভাব জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়ম নীতির উপরও প্রবলভাবে পড়েছে।

বক্তব্যের স্বচ্ছতা বিনষ্টকারী নিদর্শন : পরাধীনতামূলক মনোভাব

বক্তব্যের সংমিশ্রণ ও তার পবিত্রতা বিনষ্টের ফলে সন্ত্রাসী চিন্তা চেতনামূলক বক্তব্য নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছে। যার প্রভাব সাধারণ গবেষণা ও মনমানসিকতায় প্রকট আকারে পড়েছে। যার কারণে উপনিবেশবাদী রাজনীতি ও তার অগ্রাসন এ সকল বক্তব্য থেকে ফায়দা লুটছে, আর বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়ে সমাজে নানা ধরনের যুলুম-নির্যাতন আর ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করছে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, সারা বিশ্ব যেন তাদের কাছে দাসত্ব স্বীকার করে নেয়, যাতে তাদের নেতৃত্ব প্রদানে কোন ধরনের বাধা বিপত্তি না থাকে। এজন্য তারা নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাধারীদেরকে বিপর্যয়ে ফেলে দিয়েছিল। যার কারণেই আমরা দেখতে পেয়েছি যে উপনিবেশবাদের পতনের পর কেউ তাদের নেতৃত্বের জন্য কোন ধরনের আক্ষেপ পর্যন্ত করে নি। যখন উপনিবেশবাদের যুগ খতম হয়ে গেল, তখন অনেক দল উপদল ও সাধারণ মানুষ তাদের সমর্থন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এমনকি তাদের নেতাদের

www.pathagar.com

মৃত্যুতে কেউ অশ্রু ঝরানো তো দূরের কথা, তাদের সমাধিতে পর্যন্ত উপস্থিত হয় নি। তাদের পতনে কেউ শোকাহত হয় নি। বরং তাদের ধ্বংসযজ্ঞে ও যুলুম নির্যাতনের উপর সবাই আক্ষেপ করেছিল। তাদের আত্মিক ও মানসিক সন্ত্রাসীমূলক বক্তব্য, চিন্তা-চেতনার স্থবিরতা, কল্যাণের অস্বীকৃতি, বাহ্যিকভাবে কল্যাণকর মনে হলেও বাস্তবে তা সঠিক বক্তব্যের ধ্বংসকারী, মন মানসিকতা ও চিন্তা গবেষণার স্থবিরতা দানকারী, মানবতা বিধ্বংসীকারী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিনষ্টকারী ও মানুষের হৃদয়কে দাসত্বে রূপান্ত রকারী। তারা মানবাত্মাকে যাদুমন্ত্রে বশ করে মানুষ ও মানবতার অবস্থানকে চরম অবনতির দ্বার প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল।

এ জন্য বিপর্যয় ও সন্ত্রাসের মোকাবেলায় ইসলামের সঠিক বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে হবে, যাতে মুসলিম উম্মাহ ও জাতি অযথা হয়রানি এবং ইসলাম সম্পর্কীয় ভুল ধারণা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। বড়দের সামনে তাদের সম্পর্কীয় বার্তা ও বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, তেমনি শিশু ও ছোটদের সম্পর্কীয় বার্তা ও বক্তব্যকে তাদের সামনে সুন্দর করে শুরু থেকেই উপস্থাপন করতে হবে। অনুরূপভাবে কাফের সম্পর্কীয় বক্তব্য ও মুসলিমদের সম্পর্কীয় বক্তব্য এবং ইসলামের স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল বক্তব্যগুলো সুচারুরূপে তুলে ধরতে হবে। যাতে মুমিন তার সম্মান, মর্যাদা, বীরত্ব গৌরব ইত্যাদি অনুধাবন করে তার জন্য উপকারী ও অপকারী দিক সম্পর্কীয় বক্তব্যগুলো মাথা পেতে মেনে নেয়।

তেমনিভাবে রাসূল ﷺ এর বক্তব্যগুলোর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, বিশেষ করে শিশুদের বেলায় রাসূলের বক্তব্যকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কারণ, শিশুরাই অধিক হারে প্রভাবিত হয়ে থাকে। রাসূলের বক্তব্যের আলোকে শিশুদের ঈমান আকিদা, বীরত্ব, চরিত্র, জেহাদী চেতনা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে। তাই শিশুদের আত্মিক ও মানসিক পরিশুদ্ধির জন্য যিকির, ফিকির ও যুদ্ধ সম্পর্কীয় রাসূলের চরিত্র ও জীবনীকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

বিধি-বিধান ও প্রশিক্ষণমূলক বক্তব্য : উপমাস্বরূপ শাস্তির বিধান

ইসলামী বিধি বিধান ও প্রশিক্ষণমূলক বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনায় উদাহরণ স্বরূপ ইসলামী শাস্তির বিধান সম্পর্কীয় আলোচনা তুলে ধরছি। মানুষের জীবনে নানান কিছু সংঘটিত হয়, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ভিন্ন রকম হয়, ঘটনা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামের বক্তব্য ও বার্তা ও ভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

মানুষ তার ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনে ইতিবাচক কল্যাণকর, শান্তি, প্রশান্তি, উন্নত-অগ্রগতি, দান খয়রাত, ওয়াদা-চুক্তি, সম্মান-মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে নানা পরিস্থিতির

www.pathagar.com

মুখোমুখি হয়ে থাকে। এ সকল বিষয়ে ইসলামের বার্তা শত্রু-মিত্র, ধনী-গরিব সকলের জন্য উপকারী ও উপযোগী। কিন্তু শরিয়ত এ শরিয়তের দলিল প্রমাণ আইন-কানুন, বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা সকলের সমান নয়। কারণ, মানুষ বলতেই তার বুঝ শক্তি মেধা বিবেক ইত্যাদিতে পার্থক্য রয়েছে। এজন্য যারা মানুষের আত্মিক ও মানসিক বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং ইসলামী শরিয়তের বিধি-বিধান গবেষণা পর্যালোচনা করে, তারাই শুধু ইসলামী শরিয়তের বার্তা ও বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ কি? কত প্রকার কী কী? প্রত্যেক প্রকারের লক্ষ্য কি? উদ্দেশ্য কী? ইত্যাদি জানতে ও অনুধাবন করতে পারে। ইসলামী বক্তব্য শান্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও শালীনতার বক্তব্য। এখানে যুলুম-নির্যাতন, সন্ত্রাস-আগ্রাসন ও উষ্কানিমূলক বক্তব্যের কোন স্থান নেই। ভুল-ভ্রান্তি আর ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বের করার কোন নেই।

ইসলাম তার বক্তব্যের মাধ্যমে দাসপ্রথা চিরতরে রহিত করেছে। সন্ত্রাস ও সীমালঙ্ঘনকে নিষিদ্ধ করেছে, অনর্থক বিষয়াবলীকে অবমূল্যায়ন করেছে। শুধু তাই নয় বরং ইসলাম ন্যায় নীতি আত্মার প্রশান্তি ও মানবিক নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। শান্তির বিধানের ক্ষেত্রে ইসলাম সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম শাস্তির বিধানকে কাউকে অবমূল্যায়ন, অপমান ও বিব্রত করার জন্য করে নি। বরং তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ ও গোটা জাতিকে দোষ-ত্রুটি ও ঘৃণিত পাপাচারমূলক কাজ থেকে বিরত রাখা, যেন মানুষের লোভ-লালসা, কাম-বাসনা সংযত রাখে। একজন ব্যক্তি সমাজে যেন অন্যায়, গর্হিত কাজে লিপ্ত না হয়ে শিষ্টাচার ও সৎ চরিত্রে প্রত্যাবর্তন করে। সেই তাগিদে ইসলাম শাস্তির বিধানের নিয়ম করেছে।

যেমনিভাবে আজকে শিশু সম্পর্কীয় ইসলামী বার্তা ও বক্তব্যসমূহকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে না, তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহর সমকালীন ঘটনাবলী ও চাল-চলন ও বিপর্যয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করা হচ্ছে না। যার কারণে আজকে ইসলামী বক্তব্যগুলোতে ভ্রান্তি আর ভুল চিন্তা ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিশুরা আজকে অনায়াসে অন্যায়, অবিচার ও সীমালঙ্ঘন করে যাচ্ছে অথচ তারা বুঝতেই পারছে না তারা কী করছে। কারণ, ইসলামী বার্তা, শিষ্টাচার ও নিয়মনীতি তাদের কাছে পৌছানো হয় নি। তাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার অগ্রগতির ও পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয় নি। শিশু পরিচর্যা ও তালিকা তারবিয়াতের সম্পর্কে নবী-রাসূলের পদ্ধতি কী ছিল? তা তারা জানতে পারে নি।

শিশুদের সামনে শান্তি ও ভয়ভীতি এবং আগ্রাসী ও সন্ত্রাসী বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং তাদেরকে আজ অন্যায় অত্যাচার যুলুম-নির্যাতন আর অপারগতা ও অক্ষমতার প্রতি টেনে নেয়া হচ্ছে। অল্প কিছু সংখ্যক শিশু ছাড়া আজকে সকল শিশুই এ রোগে আক্রান্ত। শিশুদের বেলায় যে কোন পদক্ষেপ নেয়া আজকে কঠিন হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

দশ বছর হয়ে গেলে তাদেরকে কোন শাস্তি প্রদান না করে বরং উৎসাহ উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে তাদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সঠিক হোক আর বেঠিক হোক, সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক কোন কথা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ ইসলাম তাদের সাত বছর বয়সে নামাজ শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন; "সাত বছর বয়সে শিশুদেরকে নামাজ শিক্ষা দাও। নামাজ না পড়লে দশ বছর বয়সে প্রয়োজনে বেত্রাঘাত কর। রাসূলের এ হাদিসটি স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, কোন শিশুকে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের শারীরিক শাস্তি প্রদান করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভাল মন্দ কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনা করার বয়সে উপণীত হয়। যখনই সে এ বয়সে উপণীত হয়ে যাবে তখন তাকে শারীরিক প্রহার করলে হিতে বিপরীত না হয়ে সে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে সক্ষম হবে।

অপরদিকে রাসূলের উক্ত হাদিসটিতে নামাজের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে জেনে বুঝে কেউ নামাজের প্রতি অবহেলা করতে পারবে না। নামাজের প্রতি অভ্যস্ত ও মনোযোগ প্রদান করার লক্ষ্যে ইসলাম শিশু বয়সে নামাজের প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। এজন্য বলা যায় যে শিশুকালই হচ্ছে সঠিকভাবে তালিম তারবিয়াতের উপযুক্ত বয়স। শিশু বয়সেই ধর্ম, আক্বিদা ও বিশ্বাসের বীজ বপন করতে হবে। বড়দের অনুকরণে ৭ বছর বয়স থেকে নামাজে অভ্যস্থ করতে হবে। তিন বছর থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত দৈনিক পাঁচবার করে নামাজের তাগিদ এ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাতে একটি মানব সন্তান আর কখনো নামাজ পরিত্যাগ করতে না পারে। তারপরও যদি একটি মুসলিম মানব সন্তান নামাজে অভ্যস্ত ও আগ্রহী না হয়, নামাজ পড়তে অবহেলা করে তাহলে অনায়াসে নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করতে হবে।

ইসলামী শরিয়তী শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে রাসূলের এ হাদিস তথা ইসলামী শরিয়তের এ দলিলের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। তা হচ্ছে ইসলামী শরিয়তে সাধারণ আদব-শিষ্টচারের বেলায় স্বাভাবিক শাস্তি প্রদানের বিষয়ে মূল সূত্র ও দলিল হিসেবে এ হাদিসটি উপস্থাপন করা যায়। এবং তার মাধ্যমেই বাল্য বয়সে অধিক শিক্ষা-দীক্ষা ও তালিম তারবিয়াতের মাধ্যমে সঠিক জাতি গঠন সম্ভব। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় তাদের সাথে নম্র ও ভদ্র আচরণ করতে হবে। শিশুদের সাথে যদি রূঢ় ও কঠোর আচরণ এবং আগ্রাসন ও সন্ত্রাসীমূলক ব্যবহার করা হয়, তাহলে হিতে বিপরীত হয়ে বিপথগামী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এজন্য শিশুদের সাথে অমায়িক ও আদরের ব্যবহার করাই উচিত। পবিত্র আল কুরআন শিশুদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল ﷺ শুধুমাত্র শিশুদের পিতা ছিলেন না বরং দাদা ও মুরাব্বীও ছিলেন। কিন্তু তার জীবদ্দশায় কোন দিন কোন শিশুকে প্রহার করেন নি। তিনি ছিলেন সকল শিশুদের প্রতি দয়াবান ও স্নেহশীল। তিনি শিশুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন, তাদের

www.pathagar.com

প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতেন। তাদের বয়স ও বিবেক অনুযায়ী আচরণ করতেন এবং কথাবার্তা বলতেন, শিশুদের ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমা-ধৈর্য ও স্নেহ-ভালবাসার পরিচয় দিতেন। কারণ, তিনি শিশুদের স্বভাব সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত ছিলেন।

ইসলাম কখনো মানুষের হৃদয়ে ভয়-ভীতি সঞ্চারের নির্দেশ দেয় নি। তাদেরকে দাস হিসেবে রাখার বা জীবন যাপনের আদেশ প্রদান করে নি। ইসলামী শরিয়তে শাস্তি প্রদানের বিধান মানুষের অন্তরে ভয়-ভীতি আর ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়। বরং তাদের নিরাপত্তা আর শান্তি স্থাপন অধিকার সংরক্ষণ করা, কল্যাণ কামনা করা এবং মুসলিম উম্মাহ ও গোটা জাতিকে খারাপ ও পাপাচার থেকে বিরত রাখাই উদ্দেশ্য।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে এরশাদ হচ্ছে;

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

"আর তোমরা যেনার নিকটবর্তী হইও না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৩২)

আল্লাহ আরও এরশাদ করেন;

﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"যে ব্যক্তি হেতু ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল।" (সূরা আল-মায়েদা : ৩২)

এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ পাপিষ্ঠদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। ভাল ও সৎ মানুষদের ভীতি প্রদর্শন করেননি, এটিই হচ্ছে সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করার সর্বশেষ ঔষধ ও পরিশোধনের ব্যবস্থা।

এজন্য মন্দের কারণে হুদুদ (নির্ধারিত শাস্তি) রহিত হয়ে যায়। কারণ হুদুদের আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে পাপাচার থেকে বিরত রাখা, সমাজকে অপরাধ মুক্ত করা। মৌলিকভাবে মানুষকে ভীতি সঞ্চার অপমান ও বিব্রত করা নয়। তাই যে সকল বিষয়ে ও অপরাধে শাস্তি প্রয়োগ ছাড়া এ অপরাধ দমন করা যায় সে সকল বিষয়ে শাস্তি প্রয়োগ ও কায়েম না করাই উত্তম। এ জন্যই ইসলাম হত্যার বিনিময়ে ফিদিয়া প্রদান (মুক্তিপণ) এবং বন্দি মুক্তির ক্ষেত্রে ক্ষমা করার প্রতি উৎসাহিত করেছে। ফিদিয়া ও ক্ষমা প্রদর্শনে মানুষের আনুগত্যের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিশোধমূলক মনোভাব হ্রাস পায়। নবী-রাসূল তথা খুলাফায়ে রাশেদার যুগের ইতিহাস তারই প্রমাণ বহন করে।

এতে শরিয়তের কোন ধরনের অপমান বা হেয় প্রতিপন্ন করা নয় বরং এতে রয়েছে ইসলামী শরিয়ত মানুষের জীবন সংরক্ষণ। তবে এর উপর ভিত্তি করে নামাজ, রোজ ও

www.pathagar.com

আল্লাহর কাজসমূহ কিয়াস (তুলনা) করা যাবে না। কারণ, এগুলো বান্দাদের কাছ থেকে আল্লাহর সর্বোচ্চ চাওয়া পাওয়ার এ নির্দেশ, তাই যে ব্যক্তির নামাজ আদায়ের ও ফরজ কাজগুলো করার ক্ষমতা রয়েছে, তাকে অবশ্যই নামাজ আদায় ও ফরজ কাজগুলো করতেই হবে। এতে কোন ধরনের ছাড় দেয়া যাবে না। আর হুদুদ (নির্ধারিত শাস্তি) হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান। যখন এ ধরনের শাস্তি প্রদান ছাড়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব নয় তখনই এ শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

উপমা স্বরূপ প্রশিক্ষণমূলক রাসূলের বক্তব্য

আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, রাসূল ﷺ তার আদরের নাতী হজরত হুসাইন ইবনে আলী (রা) এর সাথে কী ব্যবহার করেছেন। রাসূল ﷺ যখন মসজিদে যেতেন ছোট শিশু হুসাইনকে তিনি সাথে নিয়ে যেতেন, রাসূল যখন সাহাবাদের নিয়ে নামাজের ইমামতি করতে দাঁড়াতেন, হুসাইন সাথে থাকতেন, রাসূল যখন সিজদার মস্ত ক অবনত করতেন আদরের হুসাইন তখন রাসূলের পিঠের উপর ছওয়ার হয়ে যেতেন, রাসূলের পিঠে খেলা করতেন। হুসাইন রাসূলের পিঠ থেকে না নামা পর্যন্ত রাসূল সিজদায় পড়ে থাকতেন, অনেক সময় রাসূলের সিজদা দীর্ঘ হয়ে যেত। সাহাবারা সিজদা দীর্ঘ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাসূল সংক্ষেপে উত্তর দিতেন যে, হুসাইন আমার পিঠে ছওয়ার হয়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ সে ইচ্ছা করে না নামে, আমি তাকে তাড়াহুড়া করে নামিয়ে দিতে পছন্দ করি না। হুসাইনের সাথে রাসূলের এ ধরনের আচরণের ভেতর দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা অর্জন হয়। সেটি হচ্ছে শিশুদের স্বাধীনতা প্রদান, তাদের ইচ্ছামতো উন্মুক্ত জীবন-যাপন করতে দেয়া, আনন্দ ফুরতি আর উল্লাসে ব্যস্ত রাখা। শিশুদের কল্যাণের প্রতি সদা সচেষ্ট ও সতর্ক থাকা।

হজরত হুসাইন (রা) এর সাথে রাসূলের (ﷺ) এ ধরনের আচরণের দৃশ্য শুধুমাত্র শিশুদের সাথে দয়া আর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ নয়। বরং রয়েছে আরও শিক্ষা। রাসূলের পিছনে নামাজরত অবস্থায় রাসূলের সাহাবায়ে কেরাম থাকা সত্ত্বেও রাসূলের স্নেহের নাতি হুসাইন (রা)-কে নিজ পিঠে খেলতে দিতে গিয়ে সিজদা পর্যন্ত দীর্ঘ করা জনসম্মুখে রাসূলের নাতির প্রতি আন্তরিক মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ নিজ সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনী ও আপন জনের সাথে বিশেষ মহব্বতের পরিচয়। সমাজের প্রতিটি মানুষের তার সন্তানের প্রতি এ ধরনের ভালবাসা ও মহব্বত থাকাটাই উচিত ও কাম্য। রাসূল ﷺ এর শিশুদের প্রতি যে ভালবাসা, শিষ্টাচার, তারবিয়াত কী ধরনের ছিল ভালভাবে ওরাই অনুধাবন করতে পারবে যারা সরাসরি হুসাইন এর সাথে রাসূলের ﷺ ব্যবহারের দৃশ্যটি অবলোকন করতে পেরেছে। নাতি তার নানাজানের পিঠের

www.pathagar.com

উপরে সওয়ার হয়েছে, কেমন নানাজান? যিনি হচ্ছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তাও আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ সাহাবাদের ইমামতীতে সিজদারত অবস্থায়। দৃশ্যটি কতই না চমৎকার? কিন্তু আদরের নাতি শিশুটি কিছুই বুঝতে পারেনি সে কার উপর আরোহণ করেছে। কি অবস্থায় সে আরোহন করেছে। কোন কিছুই অনুধাবন করার ক্ষমতা তার নেই। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূল ﷺ তার সাথে কী চমৎকার আচরণ করেছেন! তিনি তার পিঠ মোবারক নাতির খেলার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কষ্ট সহ্য করেছেন, সিজদা দীর্ঘ করেছেন আহ! কী চমৎকার!! তাতে কী শিক্ষা রয়েছে সকলেই সহজেই অনুধাবন করতে পারে।

এখানে রাসূল ﷺ এর আরেকটি প্রজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। সেটি হচ্ছে, শিশু কিশোরদের স্বভাব ও অনুভূতি সম্পর্কে অনুধাবন। তিনি হুসাইন (রা) এর সাথে এ আচরণের মধ্য দিয়ে সাহাবায়ে কেরামদেরকে তথা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানব সন্তানদেরকে শিশুদের সাথে কী ধরনের আচরণ ও ব্যবহার করতে হবে তাই শিক্ষা দিয়েছেন। শিশুদের স্বভাব চরিত্র কী, তারা কী চায়– সবকিছুই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ তার নাতিকে সরিয়ে দেন নি, ভীতি প্রদর্শন করেন নি, তিনি সিজদা দীর্ঘ করে তৃপ্তি সহকারে তার পিঠে খেলার সুযোগ দিয়েছেন, যাতে শিশুটি কোন ধরনের ভয়ভীতি আর হতাশার স্বীকার না হয়, এ হচ্ছে নবীর শিক্ষা, রাসূলের আদর্শ।

রাসূল ﷺ তার আদরের নাতি হুসাইন (রা) কে চুম্বন করতে দেখে আকরা বিন হারিস বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমার দশজন সন্তান রয়েছে। আমি তাদের কাউকে এ ধরনের চুম্বন করি নি। রাসূল ﷺ তখন এরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করে না তার প্রতিও দয়া অনুগ্রহ করা হয় না। রাসূলের ﷺ এ হাদিস থেকে অনুধাবন করা যায়, ছোট শিশুদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ এ ভালবাসা প্রদান না করে কঠোরতা পোষণের মাধ্যমে বড় হলে তাদের অন্তর শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ঐ সন্তান বড় হয়ে তার শ্রদ্ধাভাজনদের দয়া-অনুগ্রহ আর অনুকম্পা করবে না। অর্থাৎ শ্রদ্ধাভাজনরা বৃদ্ধ বয়সে ঐ সন্তানের দয়া-অনুগ্রহ পাবে না। শিশুর বাল্য বয়সে মেধা ও বুঝ-শক্তি দুর্বল থাকে বিধায় নবী ও গুরুজনের শিক্ষা ও উপদেশ অনুধাবন ও গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য বাল্য বয়সে শিশুদের সাথে ভাল ও উত্তম সুন্দর আচরণের মাধ্যমে স্নেহ, ভালবাসা, দয়া অনুকম্পার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দীক্ষা তালিম তারবিয়াত প্রদান করতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে ইতিবাচক অনুভূতি, শিষ্টাচার, ভদ্রতা, আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় ও গড়ে উঠে।

রাসূল ﷺ তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এর সাথে যে অমায়িক আচরণ করেছেন, তাতে রয়েছে আমাদের জন্য তথা মুসলিম উম্মাহর জন্য অমায়িক শিক্ষা।

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কে বললেন, হে বালক আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য শিখাবো।

আল্লাহর আদেশ পালন করবে, তিনি তোমাকে হেদায়াত করবেন। আল্লাহর অধিকার সংরক্ষণ করবে, তাকে তোমাদের সামনে পাবে। যখন কোন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর কাছে চাইবে। যখন কোন বিষয়ে সাহায্য কামনা করবে তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। জেনে রাখবে, যদি দুনিয়ার সকল মানুষ তোমার কোন কল্যাণের বিষয়ে একমত হয়, তাহলে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তার চেয়ে একটুকুও বেশি কল্যাণ সাধন করতে পারবে না। তেমনিভাবে সারা জাতি যদি তোমার অকল্যাণ বা ক্ষতি সাধনে একমত হয়, তাহলে আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার চেয়ে একটু বেশিও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। জেনে রেখো 'কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে লিখিত বাণী শুকিয়ে গিয়েছে।" সুতরাং যা হওয়ার তাই হবে, কোন পরিবর্তন হবে না।

রাসূলের এ বাণী এ আচরণ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? এখান থেকে আমরা দু'টি মৌলিক শিক্ষা অর্জন করতে পারি। একটি হচ্ছে, বান্দা ও তার প্রভূর মধ্যকার ভালবাসা মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তোলা যা একজন মুমিন বান্দাকে হেফাজত ও সংরক্ষণ করে পরকালীন জীবনের উন্নতির শিখরে পৌছে দেয়। আরেকটি হচ্ছে মুমিন ব্যক্তির মধ্যে বীরত্ব ও অগ্রগতির প্রাণ সঞ্চার করা। যা মুমিনের হৃদয়ে অনুভূতি-পরিতৃপ্তি আর দায়িত্ববোধের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা)কে সম্বোধন করে বলেছিলেন; পূণ্য হচ্ছে যা তোমার অন্তরকে প্রশস্ত করে, আর অপরাধ হচ্ছে যা তোমার অন্তরকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলে দেয় যদিও তোমার কাছে লোকজন নানা বিষয়ে সমাধানের জন্য জিজ্ঞেস করে।

এখানে রাসূল ﷺ এর বক্তব্য যারা শিশুকাল অতিক্রম করে ফেলেছে এবং শিশুদের ক্ষেত্রে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছে তাদের প্রয়োজন নেই। বরং এখানে রাসূল ﷺ শিশুদের পরিচর্যার বিষয়কে মূল লক্ষ্য হিসেবে এ বক্তব্য প্রদান করেছেন। যাতে শিশুরা স্নেহ ভালবাসা মহব্বত আর আন্তরিকতার ভেতর দিয়ে বীরত্ব, সাহসিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, মানসিকভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে বেড়ে ওঠে। তার মানে এটা নয় যে, তাদের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া। বরং দায়িত্বশীলতা আর আত্ম-নির্ভরশীলতা প্রাপ্ত বয়স্কদের থেকেই কাম্য, শিশুদের থেকে নয়। এজন্য রাসূল ﷺ যখন শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন তখন তিনি আগে সালাম দিতেন। তার মানে শিশুদেরকে এ কথা বুঝানো- আজকে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক আছে, তাঁরাও এক সময় ওদের মতো শিশু ছিল, নম্রতা, ভদ্রতা ও সম্মানের পাত্র ছিল, আজও তারা সম্মানীত হয়েছে, এজন্য শিশুরা যদি

www.pathagar.com

প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে সম্মানের অধিকারী হতে চায় তাহলে তাদেরকে নম্র, ভদ্র, শিষ্টাচার ও আত্মমর্যাদার বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হতে হবে।

এজন্য শিশুদেরকে বাল্যবয়সেই সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দিতে হবে। সকল কুচিন্তা আর দুঃশ্চরিত্রের অভ্যাস পরিহার করে সুচিন্তা ও সৎচরিত্রের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যাতে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে বিপদগামী না হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখী ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পাবে। কারণ, বাল্যবয়সে বিপদগামী হয়ে গেলে সঠিক পথে ফিরে আসা বা ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই তো রাসূল ﷺ যুবকদেরকে সতর্ক করে এরশাদ করেছেন; যারা বিবাহের পর স্ত্রীর ভরণ পোষণের প্রদানের ক্ষমতা ও সামর্থ না রাখে তারা যেন রোজা রাখে। কারণ, তা সংযমী হতে সাহায্য করে। আর যার ক্ষমতা ও সামর্থ আছে সে যেন দ্রুত বিবাহের কাজ সম্পাদন করে। যাতে তার মনের কষ্ট তাড়াতাড়ি দূর হয় আর সে মানসিকভাবে প্রশান্তি লাভ করে।

এ হচ্ছে শিশুদের প্রতি রাসূল ﷺ এর শিক্ষা ও বক্তব্য। রাসূল ﷺ শিশুদের সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। ভালবাসা, দয়া, অনুগ্রহ, আর উৎসাহ, উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তাদেরকে লালন পালন ও পরিচর্যার তাগিদ দিয়েছেন। যাতে শিশু আত্মিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে বেড়ে ওঠে এবং প্রাপ্ত বয়সে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তেমনিভাবে রাসূল ﷺ শিশুদের সঠিক যত্নের জন্য এবং উত্তম রূপে লালন-পালন ও পরিচর্যার জন্য শিশুর জন্মের পূর্ব থেকেই বাবা-মাকে সতর্ক হতে ঘোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি শিশুর সুষ্ঠু ও সঠিক পরিচর্যার জন্য বাবা মায়ের চরিত্রের দিকে নজর দিয়ে দাম্পত্য জীবন গঠন করার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন; "তোমরা তোমাদের নুতফা (বীজ)কে উত্তম স্থানে সংরক্ষণ কর। এবং 'সমতা (কুফু) বজায় রেখে বিবাহ কর। এবং 'অধিক সন্তান প্রসবকারী মেয়েদেরকে বিবাহ কর।

কিন্তু আজ মুসলিম উম্মাহ ও জাতি শিশুদের বিষয়ে রাসূলের ﷺ বক্তব্য ও দিকনির্দেশনাকে ভুলে গেছে। অবক্ষয় ও অপমানের বক্তব্য ও দিকনির্দেশনাকে গ্রহণ করেছে। আজ শিশুদের যথাযথ লালন-পালন পরিচর্যা এবং তাদের আত্মিক, মানসিক, বৈষয়িক ও শারীরিক উন্নতি অগ্রগতির জন্য কোন উদ্যোগ নেই। জাতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিশোধন এবং ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি করণের কোন দায়িত্ববোধ নেই। বর্তমানে সকল দল-উপদল, জাতি-গোষ্ঠী, দেশ-প্রদেশ, শত্রু-মিত্র সবাই তাদের নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত। জাতির বিবেক ও ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিশুদের অগ্রগতি ও উন্নতির কোন ব্যবস্থাপনা নেই

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মৌলিক সমাধান : বাল্যকাল গঠন

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, বড় ধরনের যে কোন ঘটনা বা সমস্যা ঘটে যাওয়ার পিছনে নানা ধরনের কারণ থাকতে পারে। তেমিনভাবে তার সমস্যা সমাধানে পথ ও পন্থা একাধিক হতে পারে। তাই প্রতিটি ঘটনা ও সমস্যার মূল্যায়ন তৎসম্পর্কীয় অভিযোগ, কারণ চ্যালেঞ্জ ও ঘটনার যোগসূত্র এবং অবস্থার আলোকেই করা হয়। এ জন্য ইসলামী সংস্কার ও পরিশোধনের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই নিজের রায় বা নিজের মত ও পথের অনুপ্রবেশের কোন সুযোগ নেই। কারণ, ইসলামী সংস্কার ও পরিশোধনের ক্ষেত্রে রায়ের অনুপ্রবেশ সংস্কারের আসল উপাদানসমূহের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। সংস্কার ও পরিশোধনের কার্যপদ্ধতিকে অকেজো করে ফেলে। জাতির পরিশোধনের দায়িত্ব পালনে অবহেলা আর ত্রুটি বিচ্যুতির অবকাশ সৃষ্টি করে। যদিও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনের কোন ধরনের অবহেলার সৃষ্টি করে না।

এখানে এ সম্পর্কীয় আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা-সংস্কৃতি, তালিম-তাবরিয়াত, চিন্তা-গবেষণা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পর্কীয় উপকরণাদির পরিপূর্ণতা সাধন। যাতে মুসলিম উম্মাহ ও জাতি তাদের অবস্থার আলোকে সংকট নিরসন, সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সঠিকভাবে পুনরায় শক্তি সঞ্চার করতে পারে। কারণ, কোন কোন সময় অবস্থা ও উপাদানের ত্রুটির কারণে মিষ্টি জিনিসের স্বাদ তিক্ত হয়ে যেতে পারে।

এ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, শৈশব কাল। ইসলামী গবেষণায় শৈশবকাল সর্বাবস্থায় গুরুত্বের দাবিদার। কারণ, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। কিন্তু রাসূলে ﷺ এর পরবর্তী যুগসমূহে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শৈশব কালকে যথাযথ মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। সে যুগে শিশুদের ভূমিকা সম্পর্কীয় আলোচনার অনুপস্থিতিই মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সামাজিক অবক্ষয় ও পতনের সবচেয়ে বড় কারণ। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য-সংহতি, সহযোগিতা সহমর্মিতা বিনষ্ট হয়েছে। ঝগড়া বিবাদ আর ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছে, জাতি তার আত্মিক ও মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটেছে, সংস্কার ও পরিশোধনের চেষ্টা দুর্বল হয়ে পড়েছে। মুসলিম উম্মাহর সে অবক্ষয় ও পতনের প্রভাব আজও সমাজে বিরাজমান।

আমরা বিগত কয়েক পৃষ্ঠায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও গবেষণামূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এসেছি। এখন আমরা বাল্যকাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে

www.pathagar.com

যাব। একদিকে যেমন সামাজিক পরিবর্তনে বাল্যকালে ভূমিকা কী ছিল, অপরদিকে সভ্যতার পুনঃবিকাশ এবং সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের মধ্যে সম্পর্ক কী ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করব। ইসলামী গবেষণায় বাল্যকালের গুরুত্ব কেন দুর্বল হল, রাজনৈতিক বিষয় এবং বিশেষ গবেষণার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হল। প্রমাণ সাপেক্ষ সারগর্ভ গবেষণার ক্ষেত্রে অক্ষমতা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতি প্রকাশ পেল, শিক্ষা-দীক্ষা আদব-শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ আর শিথিলতা আসল, শাসন ব্যবস্থা ও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যুলুম নির্যাতন আর স্বৈরাচার দেখা দিল। সামাজিক অধিকার আদায়ে অবহেলা আর অবমূল্যায়ন সৃষ্টি হল। ঝগড়া বিবাদ আর অনৈক্য-বিভাজান তৈরি হল, সর্বোপরি সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দিল। ইত্যাদি নানা কারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

চ্যালেঞ্জ সমূহের প্রতিরোধ এবং সংস্কার ও পরিশোধনের পদ্ধতি

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল মূলত জাতিগত, বর্ণগত ও গোষ্ঠীগত বৈষম্যের কারণে। তা পর্যায়ক্রমে সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্ত া-গবেষণার সংকটের রূপ লাভ করে এবং জাতির চিন্তা-চেতনা ও গবেষণা ইত্যাদির স্থবিরতা সৃষ্টি করে। তারপর তা আস্তে আস্তে জাতির শিক্ষা দীক্ষা তালিম তারবিয়াত, এবং আত্মিক ও মানসিক সংকটের রূপ ধারণ করে এবং গোটাজাতিকে নিস্তব্ধ করে দেয়। মুসলিম উম্মাহ ও জাতি তখন প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করে সংস্কার পরিশোধন করে জাতির জাগরণ সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

তাই আজ এ সংকট নিরসনের জন্য সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে জাতিকে সক্ষম করে তোলার জন্য এবং জাতির সঠিক সংস্কার ও জাগরণ সৃষ্টির জন্য আমাদেরকে অবশ্যই জাতির চ্যালেঞ্জ ও সংকট সমূহের মূল কারণ উদঘাটন করতে হবে এবং দায়-দায়িত্ব আদায়ে জাতির অবহেলার কারণগুলো সঠিকভাবে নিরূপণ করতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত সংস্কার ও পরিশোধনের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। জাতির আত্মিক ও মানসিক শক্তি বর্ধনের মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধকতা আর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে জাতি তার দায়িত্ব আদায়ে সচেষ্ট হবে। ন্যায়-ইনসাফ সহযোগিতা, সহমর্মিতাই প্রতিনিধিত্ব, একত্ববাদ, মূল্যবোধ ও শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

জাতির পরিশোধন ও মুসলিম উম্মাহ্‌র সংস্কার-সাধনের চেষ্টা প্রচেষ্টার সঠিক সফলতা অর্জন করতে হলে জাতির উপর অর্পিত চ্যালেঞ্জসমূহের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে। আর এটিই সংস্কার ও পরিশোধনের হাতিয়ার ও সঠিক ফলাফল অর্জনের মডেল। শুধুমাত্র জ্ঞানগত সামর্থ আর তথ্য প্রযুক্তিগত আশা-ভরসা যথেষ্ট নয়, বরং বাস্তবিক শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ ও জাতি সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তা হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ। যে চ্যালেঞ্জ মুসলিম বিশ্বের উচ্চ শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। এ সকল চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে হলে আমাদের অবশ্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে শক্তি সামর্থ অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করতে হবে। না হয় জাতির ঐক্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, সংস্কার ও পরিশোধনের পূর্বশর্ত হচ্ছে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার বিজয়ী হওয়া।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক শক্তি অর্জন এমন একটি বিষয়, যা শুধুমাত্র উপকরণ সংগ্রহ করলে বা যুবকদেরকে এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অনুপ্রাণিত করলে অর্জন হয় না বরং জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নতি ও অগ্রগতি এবং আধুনিক মনমানসিকতার অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে উত্তম রূপে অর্জিত হয়।

শুধু উপকরণ আর হাতিয়ার সংগ্রহ করার মাধ্যমে জাতির অগ্রগতি দূরের কথা, অবনতি ও ধ্বংস অর্জিত হয়। যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাঠশালা আর লাইব্রেরিতে বসে বাহাদুরি দেখাতে চায় বা দেখায়, তাদের অস্তিত্ব অচীরেই বিলীন হয়ে যায় ; তারা স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। বরং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও গবেষণামূলক বিষয়ের মৌলিক সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে বাস্তবেই মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে অবনতি আর বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

যদি কোন জাতি বা গোষ্ঠী মানুষের বিবেক বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল, মানবিক সামাজিক ও বৌদ্ধিক জীবন চেতনার অধিকারী হতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।

সভত্যা-সংস্কৃতি এবং আত্মিক ও মানসিক কল্যাণমূলক জ্ঞানের জন্য সামাজিক বিধি-বিধানের তুলনায় আধুনিক জ্ঞানের অপরিহার্যতা অনেক বেশি। যা আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং সৎ চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। লোভ-লালসা, অহংকার বিপদ-আপদ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাই জাতির চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবেলা করতে হলে তথ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় নিয়ম নীতি ও সমস্যাবলীর সমাধান করতে হবে।

সাংস্কৃতিক অভিযোগ : সংশয়ের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং চিন্তা-চেতনার সঠিককরণ

ইসলাম : বুদ্ধি, বিবেক, তুষ্টি ও জ্ঞানের ধর্ম

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সর্বপ্রথম সমস্যা হচ্ছে সাংস্কৃতিক সমস্যা। সাংস্কৃতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিকৃতি এবং অপসংস্কৃতির কারণে মুসলিম উম্মাহর জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-গবেষণা

www.pathagar.com

ও নিয়ম-নীতির মূল ভিত্তি ও শক্তিকে নড়বড়ে আর দুর্বল করে দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সভ্যতা-সাংস্কৃতিক আত্ম-নির্ভরশীলতা, মূল্যবোধ ও মৌলিকত্বকে ফিরিয়ে আনা একান্ত অপরিহার্য। রাসূলের রেসালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জ্ঞানের সম্মান, পরিতুষ্টি, পরামর্শ ও ঈমানের ভিত্তিতে। রাসূলের রেসালত জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। পরিতৃপ্ত কল্যাণের প্রতি জাতিকে পরিচালিত করে। অজ্ঞতা আর অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। রাসূলের সাহাবা কেরাম রাসূল ﷺ কে জ্ঞানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন অজ্ঞতা মূর্খতা আর অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। তারা জেনে বুঝে রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন। তাদেরকে ভয় দেখিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে জোরপূর্বক ঈমান গ্রহণ করানো হয় নি। তাই তারা তৃপ্তি সহকারে রাসূলের অনুসরণ করেছে। তারাই হচ্ছেন সত্যের পথ প্রদর্শনকারী শক্তিশালী মুজাহিদ।

মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞানের সম্মান, হৃদয়ে লুকায়িত আত্মতৃপ্তি, মানুষের স্বাধীনতা এবং মানুষের হৃদয়ের স্বাধীনতা প্রদানই ইসলাম ধর্ম ও তার বিজয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এরই উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাসূলের রেসালতের যুগ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন :

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ﴾

"হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন সত্য তোমাদের প্রভূর নিকট থেকে এসেছে। যার ইচ্ছা সে ঈমান আনবে। যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করবে। (সূরা কাহাফ : ২৯)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন,

﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾

"তোমাদের কী হল তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর না। অথচ দুর্বল নারী পুরুষ ও শিশুরা ফরিয়াদ করছে। যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক এ জনপদ- যার অধিবাসী জালেম। আমাদের এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাও। তোমার নিকট হতে কাউকে অভিভাবক বানিয়ে দাও। তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় করে দাও। (সূরা আন নিসা : ৭৫)

www.pathagar.com

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর কিন্তু সীমালঙ্ঘন কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারাহ : ১৯০)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

"সুতরাং যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তোমরাও তাদেরকে অনুরূপ আক্রমণ করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। মনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে থাকেন।" (সূরা বাকারাহ : ১৯৪)

মুরতাদদের শাস্তি ঈমান বা আত্মতৃপ্তির সাথে সম্পৃক্ত নয়

রাসূল ﷺ এর যুগে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের যে যে ভয়ানক শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো তাতে কেউই বিচলিত হন নি। কারণ, তারা সবই জানত যে, মুরতাদদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান আসলে ঈমানের সাথে সম্পর্কিত নয়। তেমনিভাবে তারা জানত যে, সঠিক ঈমান, আত্মতুষ্টি আর পরিতৃপ্তি এবং পরিপূর্ণ সম্মতি ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ঈমানের মূলভিত্তি ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিপূর্ণ সম্মতির সাথে ইলাম গ্রহণ করা অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। ঈমান কারো উপর চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়, চাপিয়ে দেয়া যাবেও না। আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আত্মসমর্পণ করবে, ঈমান গ্রহণ করবে, সে কখনো মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে মুরতাদদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ইয়াহুদিদেরকে ভীতি প্রদর্শন করানোর জন্য ধার্য্য করা হয়েছিল। ইয়াহুদিরা মুসলমানদের সাথে গাদ্দারি আর প্রতারণা করত। তারা তাদের অনুসারীদেরকে বলে দিত তোমরা বাহ্যিকভাবে ঈমান গ্রহণ করে ইসলামে প্রবেশ করে নাও। তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। তোমরা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা আর ফাসাদ সৃষ্টি করে প্রয়োজনে বেরিয়ে আসবে। এ ছিল তাদের প্রতারণা ও গাদ্দারি। তারা পরিপূর্ণ সম্মতি আর আত্মতৃপ্তি সহকারে ঈমান গ্রহণ করে নি।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ করেন :

﴿وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

"আহলে কিতাবদের একদল বলল; যারা ঈমান এনেছে, তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তোমরা দিনের প্রারম্ভে বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে প্রত্যাখ্যান করে নাও। হয়তো তারা ফিরে আসবে।" (সূরা আল ইমরান : ৭২)

এজন্য তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হত। যার কারণে কেউ তাদের শাস্তিতে বিচলিতও হয় নি মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবেও আখ্যায়িত করেন নি। কেউ তাদেরকে, আহলে কিতাবদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত করেন নি। তারা নিজেরাই ধোঁকা আর প্রতারণা করার জন্য এ কাজ করেছে। কারণ, যখন কোন ব্যক্তি স্বজ্ঞানে জেনে বুঝে আল্লাহর একত্ববাদ ও কল্যাণকর প্রতিনিধিত্বমূলক ইসলামের ভেতরে ঢুকে যায়, সে কখনো মূর্তিপূজা নাস্তিকতা আর শিরকের দিকে ফিরে যেতে পারে না। যদিও তখনকার আরবের মুর্তিপূজারী অবস্থা সামান্য ভিন্ন, তারা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। সেটা তাদের কাছে বিশ্বাস, ইচ্ছা আর আত্মতৃপ্তির কোন ব্যাপার ছিল না।

আল্লাহ এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেন :

﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾

"কেমন করে থাকবে? তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে কিন্তু তাদের হৃদয় এটা অস্বীকার করে। তারা অধিকাংশই সত্যত্যাগী।" (সূরা আততাওবা : ৮)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

"বেদুইনরা বলেন : আমরা ঈমান আনলাম, বল তোমরা ঈমান আন নি, বরং তোমরা বল আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি।" (সূরা হুজরাত : ১৪)

www.pathagar.com

কিন্তু পরবর্তী যুগে ইসলাম এবং মুসলমানদের থেকে প্রতারণা আর গাদ্দারি প্রতিরোধ করতে মুরতাদদের বা ধর্মত্যাগীদের এ শাস্তি শরিয়তে নির্ধারিত 'হুদ' (নির্ধারিত শাস্তি) হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পর ধর্মত্যাগী হতে পারবে না। তাদের ঈমানের প্রতি বাধ্য করা হতো। যেমনিভাবে রাসূলের বংশের সাথে রক্ত সম্পর্কীয় আরবের বেদুঈনদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হতো। তখনকার আরবের নীতি ছিল 'হয় ইসলাম না হয় যুদ্ধ' আর এ নীতি ছিল তাদের মানবিক সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নীতি। তাদেরকে সভ্যতা সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রতি নিয়ে আসার জন্যই করা হত।

রীতি-নীতিতে নতুন পুরাতন : ধার্মিকতা ও নাগরিকত্ব

রীতি নীতিতে নতুনত্ব পুরাতনত্ব, ধার্মিকত্ব ও নাগরিক ইত্যাদি আমাদের শাখাগত বিভিন্ন সমস্যার দিকে ধাবিত করে। জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মৌলিক নীতিমালা ও তার গতিপথের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি করে জাতি এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যে, এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন জাতি আর কখনো হয় নি। যার প্রভাব জাতির প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। জাতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ধর্মীয় নীতি ও সংস্কৃতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে নানা ধরনের বিরোধ দেখা দিয়েছে।

ধর্মীয় অনেক এমন বিষয় রয়েছে যার উপর ধর্মনিরপেক্ষতার অপসংস্কৃতির প্রভাবের কারণে মানুষের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। তার মূল কারণ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের ধর্মীয় বক্তব্য ও কথা গ্রহণ না করা এবং শহরীয় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির আগ্রাসনে সবকিছু ঘোলাটে হয়ে যাওয়া এ বিরোধের কারণে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা তাদের অজ্ঞতা আর মূর্খতাবশত তাদের ধর্মীয় সভ্যতা-অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে ফেলেছে। তাই তারা বিদেশী আর শত্রুতার জীবন থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার জীবনের দিকে ফিরে আসতে পারছে না। তাদের অনেক বিষয়াবলীকে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, যাতে তারা মানবিক জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে না ফেলে। এজন্য আজকে জাতি দু'টি প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর আরেকটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। উভয় প্রতিষ্ঠানই মৌলিক অনেক বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উভয়ের মধ্যে ভয় ভীতি অক্ষমতা ও অজ্ঞতার বিকাশ ঘটেছে। এ জন্য সকল গবেষক ও চিন্তাবিদকে এ আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তাদের গবেষণা ও চিন্তা-চেতনা অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে হেফাজত করতে হবে। যদি তা করা সম্ভব হয় তাহলে তাদের চিন্তা-চেতনা ও গবেষণা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সফলকাম হবে। সকল চ্যালেঞ্জ আর প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে সচেষ্ট হবে। ইসলামী

www.pathagar.com

সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। সমাজ ন্যায়-নীতি ইনসাফ, শান্তি-নিরাপত্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হবে। আর তাই হচ্ছে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি।

রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নিয়ম-নীতি, আইন-শৃঙ্খলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তি অর্জন করা। আর ইসলাম ধর্মের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সুউচ্চ ইসলামী মূল্যবোধের দিক নির্দেশনা প্রদান করা। কিন্তু ভয়ের মধ্যে সমস্যা তখনই দেখা দেবে, যখন উভয় পক্ষের গবেষণা-বিতর্ক স্বীয় নীতির বাইরে হবে।

এজন্য প্রথমে আমাদেরকে বিতর্কের একটি ভূমিকা নির্ধারণ করতে হবে। তারপর নীতিমালার বিষয়ে ঐক্যমত হতে হবে, এরপর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ঐকমত্যের দিকে যেতে হবে। এরপর উভয় পক্ষই যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হবে, তা শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য এবং মূল বিষয়ের তত্ত্ব-অনুধাবনের পার্থক্যের কারণে হতে পারে। তবে সে সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য উপযুক্ত গ্রহণযোগ্য পথ ও পদ্ধতি বের করতে হবে। আর তখনই বিতর্ক ফলপ্রসূ হবে এবং কল্যাণের ভিত্তিতে পরস্পর সহনশীল হবে ও মানবিক সভ্যতায় ঐকমত্য পোষণ করতে সক্ষম হবে।

সকল মুসলমান ও ধর্মীয় সংস্কৃতির লোক একক স্রষ্টা আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে। সকলেই ইলমে ওহির দিক নির্দেশনা ও তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বিষয়ে একমত। ইলমে ওহির লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায় নীতি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের সম্মান বজায় রাখা, নিয়ম-নীতির অনুস্মরণ করা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কাজের দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা– ইত্যাদি।

সবাই চায় যে ইসলামের খ্যাতি বৃদ্ধি পাক। রাসূলের রেসালতের যুগ আমাদের একমাত্র মডেল– ইত্যাদি একবাক্যে সবাই স্বীকার করে। তাছাড়া আজকে সকলেই একমত যে, মুসলিম উম্মাহ ও জাতি আজ তাদের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, জাতির সংকল্প আর প্রত্যয় দুর্বল হয়ে গেছে। সংগঠনগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট হয়ে গেছে, মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে গেছে। দলীয় বিপর্যয় নেমেছে, সম্মান মর্যাদা হারিয়ে ফেলছে। তেমনিভাবে সকলেই স্বীকার করে যে আমাদেরকে সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তি অর্জনের বিষয়ে ঐকমত্য হতে হবে, আত্মিক ও বাহ্যিক ক্ষমতা-সম্পন্ন হতে হবে, জাতির সংস্কার ও পরিশোধনের জন্য অভিযান চালাতে হবে, সৎচরিত্র ও উত্তমগুণে গুণান্বিত হতে হবে ইত্যাদি।

এসব একতা ঐক্যমত অভিযোগ আর আশা-ভরসা এবং সকল জল্পনা থেকেই যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে বিতর্ক আর গবেষণামূলক কাজে নিয়োগ না করবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করে দক্ষতার সাথে কাজ না চালিয়ে যাবে। এতে

www.pathagar.com

ধর্মীয় বিষয় হোক আর ইতিহাস বা সামাজিক বিষয়ই হোক অথবা চিন্তা-গবেষণা আর নীতিমালার বিষয়ক হোক, কোন কাজে আসবে না। পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থাকবে, আশা আশাই থাকবে।

মুসলিম উম্মাহ ও জাতি ধর্মনিরপেক্ষ শতাব্দীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যারা ধার্মিকত্ব ও নাগরিকত্বকে একই ও সমান করে দিয়েছিল। যার কারণে উভয় পক্ষই একে অপরকে অজ্ঞতার প্রতি ইঙ্গিত করত এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান চিন্তা-গবেষণায়, অজ্ঞমূর্খতা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করত। যার ফলে উভয়ের মধ্যে বিরাট অনৈক্য প্রবল আকার ধারণ করে। এবং জাতির দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

আমরা এখন আলেম ওলামা ও সাংস্কৃতিবিদদের একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি করতে শুরু করব। যারা ইলমে ওহির ধারক বাহক হবে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হবে। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে মানবিক বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে যাদের ধারণা থাকবে। বিজ্ঞ আহলে ইলম ও সংস্কৃতিবদগণ তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে তত্ত্বাবধায়ন করবে। আর তারা জাতির বিভিন্ন ও সংকট বিষয়ে পর্যালোচনা চিন্তা-গবেষণা করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের থিসিস জমা দেবে, বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বরা তাদের থিসিসের মূল্যায়ন করবে এবং তাদের নানা প্রকারের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। তখন মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ের উপরণাদির উন্নতি সাধন হবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার গবেষণা করে জাতির সঠিক চিন্তা চেতনার দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। গোটা মুসলিম-বিশ্ব তখন তাদের চিন্তা-গবেষণা থেকে উপকৃত হবে এবং সকল প্রকার উন্নতি সাধন করতে পারবে।

আমাদের কাম্য হচ্ছে যে, সকল দল উপদল তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার, চিন্তা-গবেষণা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে একস্থানে জমা হবে। আর সকলেই সম্মিলিতভাবে সকল জাতি-গোষ্ঠীর ধর্মীয় মূল্যবোধ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করবে এবং সকলেই জ্ঞান বিজ্ঞানে শক্তি অর্জন ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে। এবং সকলে মিলে কীভাবে জাতির সভ্যতা সংস্কৃতিকে ভুল ভ্রান্তি আর অপসংস্কৃতি থেকে পরিশোধন করতে পারে? জাতির সকল সদস্যদের ব্যক্তিত্ব গঠনে কী কী সমস্যা রয়েছে? তার সমাধানের উপায় কি? কীভাবে তাদের শক্তি সামর্থ ও বীরত্ব ফিরিয়ে আনতে পারবে? জাতির সকল প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা কীভাবে করবে? ইত্যাদি বিষয়াবলী নিয়ে যদি জাতির বিবেকবান, বুদ্ধিজীবী ও গবেষকরা আলোচনা পর্যালোচনা করত। তাহলে তারা সকলের ঐকমত্যে এমন কিছু মূলনীতি উপস্থাপন করতে পারত। যে মূলনীতির মাধ্যমে তারা তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরতে পারত। তখন মুসলিম উম্মাহ ও জাতির চিন্তা-

www.pathagar.com

গবেষণা, সভ্যতা-সংস্কৃতি-সহ সকল বিষয়ের অনেক সমাধান সহজেই হয়ে যেত। নিরসন হয়ে যেত সকল সমস্যা ও সংকটের। গঠন করতে পারত জাতি তার ভবিষ্যৎ জীবন।

নাগরিকদের মনোযোগ ও তাদের নীতিগত মন্তব্য

ধর্ম অনুকরণকারী দল, আর পশ্চিমাদের অনুকরণকারী নাগরিকদের মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, নাগরিক ও জাগতিক জ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বাস্তবমুখী প্রশাসনিক রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন ও আবশ্যকীয় মনে করে। আর তারই সাথে তারা অদৃশ্য জগত অস্বীকার করে এবং এ বিশ্ব জগতে আল্লাহর বিধানানুযায়ী ও তার কৌশল মোতাবেক যে পরিবর্তন সাধন হয়, তাও অস্বীকার করে। তাদের মতে আল্লাহর কৌশল ও বুদ্ধির অনুধাবন জড়নির্ভর মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি মানুষের মুখে বর্ণনা ও সম্ভব নয়। আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টিজগতের এ পরিবর্তন সম্পর্কীয় অস্বীকৃতি দু'টি দিক থেকে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে।

প্রথমত ধারণা : ধর্ম অনুকরণকারী ধার্মিক ব্যক্তিগণ যখন দোয়া কালাম, তাওয়াক্কুল, আনুগত্য এবং প্রজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ সৃষ্টিজগতে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও তার গোপন রহস্য নিয়ে বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপন করেন, তখন তারা তৎসম্পর্কীয় দলিল প্রমাণ সামগ্রিকভাবে বর্ণনা করেন; এতে তারা তার বিস্তারিত আলোচনা করতেন না, এ সৃষ্টি জগতে এর প্রভাব কী, বাস্তবতা কী? ইত্যাদি বিষয়ে তারা বর্ণনা করেন না। ফলে তাদের এ কথা ও বক্তব্যগুলো পশ্চিমা অনুকরণকারী নাগরিকদের কাছে বাস্তব-বিরোধী অনর্থক বক্তব্য হিসেবে মনে হয়।

আবার যখন সেই ধর্মানুকরণকারী ধার্মিক ব্যক্তিগণ জাতির বিভিন্ন দল উপদলের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে আলোচনা ও বক্তব্য প্রদান করেন, তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে জাতির প্রতিবন্ধকতা আর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে উম্মাহ ও জাতির সেবার বক্তব্য প্রদানে মনোনিবেশ করেন, তখন তারা তাদের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করে তাদের শক্তি সামর্থের উর্ধ্বে এমন বক্তব্য প্রদান করেন; যে সার্বিকভাবে তাদের মানসিক অনুভূতিকে ভ্রান্ত করে ফেলে, যার কারণে ওদের প্রতি তাদের হিংসা-বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পায় ; শক্তি সামর্থ, অনুভূতি, চেতনা আরো লোপ পায়। সংস্কার পরিশোধন পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের চেষ্টা প্রচেষ্টা ভেঙ্গে পড়ে।

দ্বিতীয় ধারণা : ধর্ম অনুসারী ধার্মিকদের কাছে ধর্ম নিরপেক্ষ পশ্চিমাদের অনুসারী নাগরিকদের অভিযোগ আসে যে, তাদের বক্তব্যের ও যুগ-জিজ্ঞাসার কারণে

www.pathagar.com

ধর্মপরায়ণদের বক্তব্যের মানহানী ঘটে। তাদের থেকে বিমুখ হওয়ার প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পরদেশী উপনিবেশবাদীদের অনুকরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। এতে মনে হয় যে, তারা ধর্মের পবিত্রতাকে নষ্ট করছে এবং অদৃশ্য জগতকে অস্বীকার করছে, অদৃশ্য জগত সম্পর্কে ধার্মিকরা যে প্রমাণাদি পেশ করেন, তাকে অবমূল্যায়ন ও রহিত করে ফেলছে। আর অদৃশ্য জগতকে অস্বীকার মানে আল্লাহর কুদরতকে অস্বীকার করা।

এখানে যদিও নানা দিক নানা-পথ ও মত রয়েছে। তথাপি মৌলিক বিষয়ে সবাই একমত। তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তারই প্রদত্ত নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান ঈমান আমল আখলাক ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন,

"তোমার জন্য যা কল্যাণকর তা অর্জন করতে চেষ্টা কর, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, অপারগ নিরাশ হয়ো না।" কিন্তু তারপরও উম্মাহ ও জাতির সন্তানদের মধ্যে এ বিভ্রান্তি আর মিশ্রণ কীভাবে হল? একদিকে অদৃশ্যের ধারণা আর অপর দিকে নাস্তিকতা আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ধারণা। কী করে তাদের মধ্যে এ ঝগড়া বিবাদ সংগঠিত হল? কীভাবে তাদের মধ্যকার এ সমস্যার নিরসন করা যাবে?

এ সকল সমস্যা ও সংমিশ্রণের মূল কারণ হচ্ছে সেই ঘটনাবলী ও বিতর্ক, যা রাসূলের রেসালাতের যুগ ও খুলাফায়ে রাশেদা স্বর্ণযুগের পরবর্তী যুগে সংঘটিত হয়েছিল এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত চলছিল। রাসূলের যুগ ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে যে সকল রাবী বা বর্ণনাকারী ছিলেন তাদের মধ্যে আবেগ-অনুভূতি, স্মরণশক্তির ব্যাপক পার্থক্য-তারতম্য এবং তাদের মধ্যেকার নানা ধরনের বিবাদ মনোমালিন্য থাকা সত্ত্বেও তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি এক ও সঠিক ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের মধ্যে সকলেই অভিন্ন ছিলেন। তাদের মধ্যকার যত ধরনের যত কিছুই হোক না কেন, ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। হাদিসের যে বর্ণনাসূত্র তাদের মধ্যে সঠিকভাবে ছিল, তাতে হাদিসের সঠিক ধর্ম উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু যখন রাসূলের রিসালতের যুগ ও খুলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেল। এদিকে ভণ্ড নবীদের আনাগনা শুরু হয়ে গেল। নবুওয়াতের ক্ষেত্রে মিথ্যা দাবি উত্থাপন করতে শুরু করে দিল। রাসূলের হাদিসের মধ্যে বিকৃতি সাধনের চেষ্টা শুরু হয়ে গেল। তখনও হাদিসের সঠিক সংরক্ষণ হয় নি, এমনকি সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে গেল। দৃঢ়ভাবে হাদিস সঠিক বলে দাবি করা কষ্টসাধ্য হয়ে গেল। তখন হাদিসের মধ্যে অনেক মনগড়া কথা ঢুকিয়ে দেয়া শুরু হয়ে গেল। মিথ্যাবাদীরা হাদিস তৈরি করা শুরু করেছিল। হাদিস বর্ণনা করা, শোনা অনুধাবন করা, মুখস্ত করা, ভুলে যাওয়া-সহ নানা ধরনের সমস্যাবলীর কারণে

www.pathagar.com

হাদিস সঠিকভাবে সংরক্ষিত থাকে নি। পরবর্তীতে ধর্মপরায়ণ মুসলমানগণ এসব মিশ্রিত হাদিস দিয়ে নানা বিষয়েও সমস্যার দলিল ও প্রমাণাদী পেশ করেছেন। এতে নানা ধরনের ভুল ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, এ জন্য সাধারণ লোকদের সাথে তাদের চিন্তাধারার বিরোধ ঘটেছে। হাদিসের সঠিক সংরক্ষণ হলে বা অধিকভাবে হাদীসে চিন্তা-ভাবনা করলে এতটুকু বিরোধ পাওয়া যেত না, যা পাওয়া যেত তাও সহজেই নিষ্পত্তি করা যেত।

সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং আহলে ইলিমদেরকে অবশ্যই সঠিক প্রমাণাদি খুঁজতে হবে এবং প্রতিটি দলিল ও প্রমাণাদির মূল উদ্দেশ্য কী? ভাবার্থ কী তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে। বিশেষ করে হাদিস সংক্রান্ত দলিল ও প্রমাণাদির ব্যাপারে সঠিক অবগতি অর্জন করতে হবে। হাদিসের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রেক্ষাপট, চাহিদা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হবে। এবং তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে। শুধুমাত্র ইলমে ফিকহ আর হাদিসের রেওয়াত ও দেরায়তে পারদর্শী হয়ে তার উপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না, বরং তার সাথে আরও দুটি গ্রুপকে সংযুক্ত করতে হবে।

প্রথম গ্রুপ : মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সাধারণ ঐ সমস্ত লোক, যারা সাংস্কৃতিক বিকাশের কারণে জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা রাখে, তারা তার দলিল প্রমাণাদি নিয়ে অনুশীলন করে, বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখাপড়া ও গবেষণাকর্মের গুরুত্ব প্রদান করে। চলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তারা অবদান রাখে।

দ্বিতীয় গ্রুপ : দ্বিতীয় গ্রুপ হচ্ছে যারা, সামাজিক, জাগতিক ও মানসিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রাখে, তারা তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানে এবং প্রশাসনিক কার্যাবলীতে তারা দলিল প্রমাণাদির ব্যবহার করে। তাদের দলিল প্রমাণাদির ব্যবহার ও বিচার বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতিও রয়েছে। তারা দলিল প্রমাণাদীকে শুধুমাত্র সনদ আর মতনের বিশ্লেষণে সীমিত রাখে না, বরং তারা দলিলের যথার্থ ভাবার্থ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে। হাদিসের গোপন রহস্য কি? তাও তারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জমহুর অর্থাৎ যে দিকে অধিক মুজতাহিদদের রায় রয়েছে, তাদের গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে বিচার বিশ্লেষণের বিষয়ে হাদিস বিশারদদের গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কারণ, আজকের সমাজে অবহেলা ও অস্বীকারকারীদের মোকাবেলা আর প্রতিরোধ অযোগ্য লোক দিয়ে আর দুর্বল ইসলামী গবেষণা দিয়ে হবে না। আজকের দিনে গবেষণায় অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার পরিধিও অনেক প্রশস্ত হয়ে গেছে। ইলমে দীনের অনেক শিক্ষার্থী আজও সে বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ এবং গবেষণার মাধ্যম ও পরিধি সম্পর্কে অনবহিত। মানুষের অধিকার রয়েছে তাদের জীবনের বাস্তবতার নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করার।

www.pathagar.com

বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উচিত, তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের কিতাবের প্রতি, ক্লাসের প্রতি, আচার ব্যবহারের প্রতি মনোনিবেশ করানো। তাহলে তাদের চিন্তা-চেতনা গভীর হবে। তাদের চিন্তা-চেতনা ও গবেষণায় ত্রুটির কারণসমূহ জানতে পারবে। সঠিক ধারণার ভিত্তিতে ও বাস্তবতার নিরিখে শরিয়তের লক্ষ্য- উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারবে। মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলে অবদান রাখতে পারবে।

সনদ (বর্ণনাধারা) মতন (মূলপাঠ) এর পর্যালোচনা বিষয়ে আধুনিক ব্যাপক নীতিমালার সম্ভাবনা

যে সকল হাদিস গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার সংখ্যা প্রায় একলক্ষ হবে। আবার অনেক হাদিসে একাধিক বর্ণনাসূত্র, শব্দ ও বাক্যের হ্রাস বৃদ্ধি, তারতম্য ও পার্থক্য বিদ্যমান। আবার কিছু হাদিস রয়েছে বিপরীতমুখী এমনকি কিছু হাদিস রয়েছে মাউদুউ অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত বা তৈরীকৃত হাদিস। আর কিছু হাদিস সহিহ কিছু হাদিস দুর্বল রয়েছে। এজন্য হাদিস বিভাগের ছাত্রদেরকে একটি হাদিসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক মতানৈক্যে পড়তে হয়। তেমনিভাবে হাদিসগ্রন্থসমূহে অনেক হাদিস এমন রয়েছে যা রহিত হয়ে গেছে। হজরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, আমার নিকট প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদিস রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। এর থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। তাও আবার সব হাদিস সহিহ নয়, বরং অধিকাংশই দুর্বল হাদিস। ইলমে হাদিসে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার। এর মাধ্যমে অনেক মিথ্যা ও রহিত এবং রক্ষিত হাদিসের প্রকাশ ঘটেছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। হাদিসের এ বিষয়টিকে আত্মস্থ ও জানার অনেক মাধ্যম রয়েছে। হাদিস বিশারদগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করে গেছেন। এর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে সহজেই দুর্বল হাদিসের পরিচয় পাওয়া যাবে। অনেক সময় বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকার কারণে নিজেদের পক্ষকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে হাদিস তৈরি করে ফেলত। তাদের প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য ইসরাঈলী রেওয়াতের (বর্ণনা) উপস্থাপন করত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অনেক সময় অবৈধ ও খারাপ কাজের সপক্ষে হাদিস উপস্থাপন করা হতো। এমনকি বর্তমান যুগেও আমাদের সমাজে অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায় নিজেদেরকে মানুষের সামনে বড় করে তুলে ধরা ও খ্যাতি অর্জনের জন্য নিজেরা হাদিস গঠন করে বর্ণনা করে ফেলে।

এখানে আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, অধিকাংশ (জামহুর) উলমায়ে কেরামের মতে মাত্র ১০ (দশ)টি হাদিস ব্যতীত মুতাওয়াতির (বর্ণনাকারীদের প্রতিটি স্তরে অধিক

www.pathagar.com

পরিমাণে প্রসিদ্ধ রাবি থাকা) হাদিস পাওয়া যায় না। তার বিপরীতে রয়েছে অসংখ্য হাদীসে আহাদ (বর্ণনাকারী একজন বা একাধিক কিন্তু মুতাওয়াতির এর মত না) যা মুতাওয়াতির এর মত বুঝা এত সহজ নয়। তেমনিভাবে বর্ণনাকারীর স্বভাব-চরিত্র, মেধা-যোগ্যতা ইত্যাদির তারতম্যের কারণে হাদিসের স্তর ও তারতম্যের মধ্যেও তারতম্য ও ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি একই বর্ণনাকারীর দু'টি হাদিসের স্তর পর্যন্ত সমান নয়। এভাবে হাদিসের শব্দগত, বাক্যগত সমস্যা ও তারতম্য-বর্ণনাকারীদের মধ্যে নানাধরনের ব্যবধান ইত্যাদির কারণে হাদিসের অর্থগত যে সমস্যা ও বৈপরিত্য সৃষ্টি হয়েছে, যা মানুষের বিবেক সহজে গ্রহণ করে না ; তার মূল কারণ হচ্ছে, সে যুগে হাদিসের মূল শব্দ এ বাক্যগুলো যথাযথ সংরক্ষণ না করা।

রাসূলের রেসালতের যুগে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই সচেতন ছিলেন। তারা অনায়াসে নির্বিচারে হাদিস বর্ণনা ও প্রচার করাকে অপছন্দ করতেন, তারা হাদিসের যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্মার্থ অনুধাবন ছাড়া হাদিস বর্ণনা করতেন না। কারণ, মানুষ মানুষের মধ্যে পার্থক্য, সমাজের মধ্যে ভিন্নতা এবং স্থানকাল পাত্র-ভেদে হাদিসের মর্মার্থে পার্থক্য হয়ে তাকে। এজন্য তারা হাদিসের যথার্থ কী? লক্ষ্য কী? তারা অনুধাবন করতে পারছেন কি না? ইত্যাদির কারণে তারা রাসূলের হাদিস অত্যন্ত স্বল্প হারে বর্ণনা করতেন। তাদের হাদিস বর্ণনা-ক্ষেত্রে এ ধরনের চরিত্র ও মূল্যায়ন প্রমাণ করে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদিসের যথার্থ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ভাবার্থ ইত্যাদি অনুধাবন করা অপরিহার্য।

মুতাআখখিরীনগণ (পরবর্তী যুগের আলেমগণ) সহিহ ও দুর্বল হাদিস-সহ যথেষ্ট পরিমাণ হাদীসে আহাদ বর্ণনা করেছেন। তার কারণ হচ্ছে তাদের চিন্তা-গবেষণার দুর্বলতা এবং আক্বিদাগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল। পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে হাদিস বিষয়ক চিন্তা গবেষণার স্বল্পতা, অপারগতা দুর্বলতা দেখা দিল, সংস্কার পরিশোধনের স্বল্পতা দেখা দিল, তাকলিদ ও অনুকরণের মাত্রা বেড়ে গেল, তখন তারা তাদের মতের স্বপক্ষে ও চিন্তা গবেষণার সমর্থনে হাদিসে আহাদ, এমনকি দুর্বল, প্রসিদ্ধ হাদিস পর্যন্ত উপস্থাপন করতে শুরু করল। অথচ শরিয়তের কোন ব্যাপারে নিজেদের মতামত ও স্বেচ্ছাচারিতার অনুপ্রবেশের কোন অধিকার নেই।

হাদিস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে মতানৈক্য ছিল যে হাদিস লেখার অনুমতি আছে কি নাই। এটা প্রমাণ বহন করে, স্থানকাল পাত্র ভেদে হাদিসের আধিক্যের ফলে ভুল বুঝা ও অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা ছিল। যার কারণে অনেকেই হাদিস লিপিবদ্ধ করা থেকে দূরে রয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, তারা জানতেন যে হাদিসটি মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য নাকি এখানেই সীমিত।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ করেন :

﴿وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ﴾

"তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত্য কর এবং সতর্ক হও, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।" (সূরা মায়েদা : ৫/৯২)

তেমনিভাবে তারা হাদিসের দিক নির্দেশনাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারের নি, হাদিসটি রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক কার্যাবলীর জন্য নাকি শিক্ষা ও তালিম তারবিয়াত সংক্রান্ত কার্যাবলীর জন্য নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যার জন্য তারা হাদিস লিখেন নি। কারণ, হাদিস মানুষের অবস্থা, চাহিদা, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভিন্ন ধরনের হতে পারে। এজন্য শরিয়তের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি হাদিসকে যথাযথ কাজে লাগাতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ করেন :

﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾

"তোমরা অনুগত্য কর আল্লাহর এবং অনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।" (সূরা আল নিসা : ৪/৫৯)

অথবা হাদিসটি নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের দিক নির্দেশনা দিয়েছে, তার ব্যাখ্যা কুরআন করে নি, রাসূল তার ব্যাখ্যা করেছেন।

যেমন : নামাজ ও যাকাতের ব্যাপারে স্বয়ং কুরআন সুস্পষ্ট করে বলেছে;

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পার।" (সূরা নুর : ২৪/৫৬)

নামাজ এবং যাকাত ইসলামী শরিয়তের তথা ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি রুকন (স্তম্ভ)। কিন্তু কুরআন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেনি বরং রাসূলের উপরে ছেড়ে দিয়েছে। রাসূল তার যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ দুটি বিষয়ে রাসূলের হাদিসই মৌলিক ভিত্তি। অপর দিকে রোজা ও হজ্জের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনই যথার্থ মৌলিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। রাসূলের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় নি। তাই এ হিসেবেই রাসূলের অনুগত হতে হবে। অন্যদিকে একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত এবং সাধারণ

www.pathagar.com

জীবন-যাপন ও জীবিকার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে সেগুলোই রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন একজন মানুষ হিসেবেই। রাসূল হিসেবে নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন। 'আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ।"

এজন্য হাদিসের ব্যাপারে আমাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদা এবং প্রথম শ্রেণীর সাহাবাদের অবস্থাকে অনুসরণ করতে হবে। তারা হাদিসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, ভাবার্থ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিবেচনা ও অনুধাবন করে সাহসিকতার সাথে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রাসূলের হাদিসগুলো বর্ণনা করতেন। এমনকি তারা তাদের সমসাময়িকদের কাছে হাদিস বর্ণনা করার জন্য মদীনায় অবস্থান করতে পছন্দ করতেন।

তেমনিভাবে আমাদেরকে হাদিস লিখনির ব্যাপারে রাসূলের নিষেধ করা এবং অনুমতি প্রদানের কারণ কি, সে সম্পর্কে আমাদের অনুধাবন করতে হবে। রাসূল ﷺ হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সীমিতভাবে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুমতি প্রদান করার কারণ হচ্ছে, যাতে মানুষ সাম্প্রদায়িকতার কারণে নিজের রায়, মাজহাব, ইত্যাদির অন্ধ অনুকরণ না করে চিন্তা-গবেষণা, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারে। তেমনিভাবে অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে দলিলের ভুল ব্যবহার, খারাপ, মিথ্যা, অনর্থক, কামনা- বাসনা ইত্যাদির পক্ষে দলিল উপস্থাপন করে এবং দলিলের অপব্যবহার করে জাতির ও উম্মাহ্‌র অভ্যন্তরে বিপর্যয় সৃষ্টি করা, অনুভূতি ও আবেগের উপর আক্রমণ করা ইত্যাদির সুযোগ যেন না থাকে, যা পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মধ্যে বিবাদের কারণ, ঝগড়া ফাসাদের উৎস বানিয়ে শত্রুরা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে।

হাদিসের মতন (মূল বর্ণনা) বিশ্লেষণে যে দুর্বলতার অভিযোগ উত্তাপন করা হয়, তার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে সেটা হচ্ছে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে। হাদিসের মতনের যাচাই বাছাই ঐ ব্যক্তি করতে পারে যার হাদিস সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়াবলীর অগাধ জ্ঞান রয়েছে, যিনি হাদিস নিয়ে সব সময় অনুশীলন ও গবেষণা করেন। এজন্য হাদিস নিয়ে গবেষণা অনেকে করলেও পূর্ণতা লাভ করতে পারেন নি বা পূর্ণতায় পৌছাতে পারেন নি। কখনো শাব্দিক কখনো আকৃতিগত কখনো নীতিগত বা কখনো অন্য দিক দিয়ে দুর্বলতা থেকেই যায়। এজন্য মুতাআখখিরীন (পরবর্তী যুগের আলেমগণ) এর নিকট একটি কথা খুবই প্রসিদ্ধ যে, 'বক্তৃতার পরিচয় বক্তার দ্বারা হয়ে থাকে।" বক্তার পরিচয় বক্তৃতার দ্বারা হয় না। অর্থাৎ যাচাই বাছাই এর যোগ্যতার দুর্বলতার কারণে হাদিসের মূল বর্ণনার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য শরিয়ত এ বিষয়ে একটি মূলনীতি ও সঠিক পদ্ধতি বলে দিয়েছে। যার মাধ্যমে নিক্তির মত হাদিস যাচাই বাছাই করা যাবে। সেটি হচ্ছে, হাদিসের মূল বর্ণনা যদি কুরআনের সাথে মিল

www.pathagar.com

হয় তাহলে বুঝা যাবে সে হাদিস সঠিক, আর যদি কুরআনের সাথে মিল না হয়ে বিরোধ হয়, যার কোনরূপ মিল সাধন করা সম্ভব হয় না তাহলে সেই হাদিসকে সঠিক বলা কঠিন হবে। কারণ, কুরআন হচ্ছে স্পষ্ট, পরিপূর্ণ মুহকাম ও মুতাওয়াতির। এতে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ করেন;

﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾

"আমি কিতাবে (কুরআন) কোন কিছুই বাদ দেই নি।"

(সূরা আনআম : ৬/৩৮)

আল্লাহ আরও এরশাদ করেন;

﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

"এ কিতাব প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ সর্বজ্ঞের নিকট হতে এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত এবং পরে বিষদভাবে বিবৃত।" (সূরা হদ : ১১/১)

আল্লাহ আরও এরশাদ করেন;

﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"আমি অবশ্যই তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিলাম এমন এক কিতাব, যাকে পূর্ণজ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করে দিলাম এবং যা ছিল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশক ও দয়া।" (সূরা আ'রাফ : ৭/৫২)

এমনিভাবে কুরআন সংক্ষিপ্তাকারে তার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছে। যাতে হেদায়াত ও সকল সমস্যার সমাধানের মৌলিক দিক নির্দেশনা কুরআন থেকেই পাওয়া যায়। এতে স্থান-কাল-পাত্র অবস্থা যতই বেশি ও যতই তারতম্য হোক না কেন, মৌলিক সমাধানে কুরআনের চিন্তার সমতুল্য কিছুই নেই। অপর দিকে হাদীসে অনেক সহিহ এবং দুর্বল হাদিস রয়েছে, স্থানকাল পাত্রভেদে এবং অবস্থার আলোকে হাদিসের ভিন্নতাও রয়েছে। তারপরও আমরা বিচার বিশ্লেষণ ও চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই হাদিস সম্পর্কে নানা হুকুম ও মন্তব্য করে ফেলি। অথচ ইমাম আবু হানীফা নুমান বিন সাবিত কত কষ্ট করে আলোচনা পর্যালোচনা ও চিন্তা-গবেষণা করে হাদিস থেকে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। তাতে এমনও হাদিস ও দলিল প্রমাণ রয়েছে যে বাস্তবে এগুলো অনুধাবন করা, সংরক্ষণ করা, বিচার-বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত কঠিন, এমনকি হাদিস বর্ণণাকারীদের পক্ষে তার হাকীকত জানা ও অনুধাবন করা দুরূহ। আর বর্তমান ফিতনা, ফাসাদ, ঝগড়া, বিবাদ, ও বিভিন্ন দল উপদলে ও জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ার সময় এ দলিল

www.pathagar.com

ও হাদিসগুলো তাদের কাছ থেকে বর্ণিত এতটুকুই শুনা যায়। চিন্তা-গবেষণা এবং বিচার বিশ্লেষণের কোন সুযোগ নেই।

অপরদিকে এমন অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলোর মতন (মূল বর্ণনা) সম্পর্কে অনেক মতানৈক্য রয়েছে, আর এ মতানৈক্য চিরকাল থাকবে। যার কারণে হাদিসে একে অন্যের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। আর আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এবং ইসলাম শরিয়ত, ইলমে লুগাত, সুনান ও তার স্বভাব প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে শরিয়তের নিয়ম-নীতি ও বিধানের প্রতি খেয়াল না করে অনায়াসে হাদিসই বাদ দিয়ে দেই। ওয়াজ নসিহতে ও ফতওয়ার মাধ্যমে একে অন্যের প্রতি আক্রমণাত্মক কথা বলি। যার ফলশ্রুতিতে জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ক্ষতি সাধন হয়। সন্ত্রাস-দুর্নীতি ও অসৎ চরিত্রের বিকাশে সহায়ক হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা গবেষণার অগ্রগতিতে আঘাত হানে, শিক্ষা দীক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতে বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়।

মতন (মূল বর্ণনা) এর পর্যালোচনার নমুনা : অদৃশ্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতির দূষণ

এখানে আমরা ইসলামী চিন্তা-গবেষণা এবং ইসলামী সংস্কৃতি যে সকল সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে আলোচনা করব। আমরা জানি যে একজন মুমিন মুসলমান ব্যক্তি তার বিশ্বাস ও ইমানী শক্তি ও মনোবল নিয়ে তার দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্যাবলী আহার-বিহার ও উপার্জন সম্পাদন করে থাকে। একজন মুমিন ব্যক্তির কাছে ভাগ্যরেখা, গণনাবৃত্তি, জ্যোতির্বিদ্যা বালুতে দাগ কাটা, যাদুটনা, ভেলকিবাজী, অশুভ লক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের কোন স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে হজরত মো'বিয়া ইবনে হিশাম (রা.) হতে বর্ণিত সহিহ মুসলিমে একটি হাদিস রয়েছে, তিনি (মো'বিয়া) বলেন আমি রাসূল ﷺ বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি জাহেলি যুগের নিকটস্ত লোক, অর্থাৎ আমি কিছু দিন পুর্বে মুমিন ছিলাম না। আল্লাহ আমাকে ইসলামের ভেতরে নিয়ে এসেছেন। আমাদের অনেকেই তাদের প্রয়োজনে গণকের কাছে আসা যাওয়া করে। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ওদের কাছে যেও না। আমি বললাম আমাদের অনেকেই অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ বললেন, এটি এমন একটি বিষয়, যার দ্বারা তাদের মনে প্রশান্তি পায়। উহা তাদেরকে অশুভ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আমি বললাম আমাদের অনেকেই দাগ কাটেন। রাসূল ﷺ বললেন অনেক নবীও দাগ কাটতেন। অতএব যে ব্যক্তির দাগ কাটা তৎ-অনুযায়ী হবে তাতে কোন সমস্যা নেই। রাসূল ﷺ

www.pathagar.com

তার এ হাদিসের মাধ্যমে দাগ কাটাকে সমর্থন করে বহাল রেখে দিলেন। এবং প্রশ্নকারী যে উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ তার এ হাদিস দ্বারা এ কথা বুঝাননি যে যে দাগ কাটার মাধ্যমে ইলমে গাইব এর বহিঃপ্রকাশ হয় যাবে যা সরাসরি কুরআন বিরোধী। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন পরিষ্কার বর্ণনা দিচ্ছে।

আল্লাহ এরশাদ করেন;

﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"(হে রাসূল আপনি) বলে দিন, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। তাছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দের উপর ও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা বৈ আর কিছুই নই।"

(সূরা আল আ'রাফ : ৭/১৮৮)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন;

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾

"তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন। (সূরা জিন্ন : ৭২/২৬ - ২৭)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء﴾

"আর অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ অবহিত করার নয়, তবে আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার উপর ঈমান আন।" (সূরা আলে ইমরান : ৩/১৭৯)

www.pathagar.com

উপরিউক্ত দলিল প্রমাণ ও আলোচনার সাথে হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম শরিফের হাদিসের কোন বিরোধ নেই।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَاسٌ عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنْ الْجِنِّيِّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ»

হযরত আয়শা (রা.) বলেন, কয়েকজন লোক রাসূল ﷺ এর কাছে গণক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল রাসূল ﷺ বললেন, এরা সঠিক নয়। তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কোন কোন বিষয়ে, কোন কোন সময়, কোন সংবাদ দিলে তা ঠিক হয়ে যায়। রাসূল ﷺ বললেন, এটা এমন একটি সটিক বাক্য যা জিনরা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে আর তাদের প্রিয় ব্যক্তিদের কাছে কানে কানে পৌছিয়ে দেয়। আর তারা তার হাজারো মিথ্যা একত্রিত করে মানুষের কাছে বলে থাকে। হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত বুখারী শরীফের অন্য আরেকটি হাদীসে রয়েছে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ»

হজরত আয়শা (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে রাসূল ﷺ বলেছেন; ফেরেশতারা মেঘমালার উপরে চলে আসেন এবং আসমানে যে সিদ্ধান্ত হয় তা নিয়ে তারা আলোচনা করেন। আর শয়তান তাদের থেকে কারচুপি করে কিছু শুনে ফেলে এবং তার বন্ধু গণকদের কাছে বলে দেয়। গণকরা তার সাথে হাজারো মিথ্যা একত্র করে মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেয়।

হজরত আয়শা (রা.) হতে রাসূলের এ হাদিসগুলোর অর্থ হচ্ছে যে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ছাড়া অদৃশ্যের খবর কেউই জানে না। গণকরা যে সামান্য গায়েবের যা অদৃশ্যে খবর বলে থাকে, তা শয়তানের সাহায্যে সামান্য অদৃশ্যের সংবাদের সাথে হাজারো মিথ্যার সমাবেশ মাত্র। তাও আবার কুরআন নাজিলের পর এবং শেষ নবী আগমনের পর চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে কারণ শয়তানের কারচুপি করে শোনার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অদৃশ্যের সংবাদ কেউ বলতে পারবে না।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন;

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾

"রাসূল ﷺ আমার প্রতি ওহি প্রেরিত হয়েছে যে জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে যে আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।" (সূরা জিন : ৭২/১)

আল্লাহ আরও এরশাদ করেন;

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا (٩) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾

"আর আমরা চেয়েছিলাম যে আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপনের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। আমরা জানি না জগতবাসীর জন্য অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান।" (সূরা জিন : ৭২/৮ - ১০)

আল্লাহ আরও এরশাদ করেন;

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (٢٨)

"তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না, তার মনোনিত রাসূল ব্যতীত। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন। রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌছিয়ে দিয়েছেন কি-না জানবার জন্য। রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন।"

(সূরা জিন : ৭২/২৬ - ২৮)

আল্লাহ আরও এরশাদ করেন;

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ﴾

www.pathagar.com

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপনের উপকরণ এবং ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (সূরা মুলক : ৬৭/৫)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন,

﴿إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ﴾

"কিন্তু কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ শিখা।" (সূরা হিজর : ১৮)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন;

﴿إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾

"তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।" (সূরা সাফফাত : ১০)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন;

﴿قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

"(হে রাসূল আপনি) বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি নি আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে, আমি অদৃশ্যের খবরও জানি না। আমি তোমাদেরকে বলি নি আমি একজন ফেরেশতা। যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয় আমি তাই অনুসরণ করি।" (সূরা আনআম : ৬/৫০)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন;

﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

"(হে রাসূল) বলুন আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্যের বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। আর তারা জানে না যে, কখন তারা উত্থিত হবে।" (সূরা নমল : ২৭/৬৫)

অতএব কুরআন যা রাসূলের রেসালতের মূলভিত্তি, তা নাযিলের পর মানুষ তার সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়ে গেছে, তার দায়িত্ব-কর্তব্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়ে গেছে। সেই কুরআন আমাদের সুস্পষ্ট করে অদৃশ্য জগত সম্পর্কে বলে দিয়েছে যে অদৃশ্য জগতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে সীমাবদ্ধ। সেটি আল্লাহর কুদরতের

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ দয়া অনুগ্রহ করে কুরআনের মাধ্যমে ও তার দিক নির্দেশনা মানুষ দুনিয়াবী ও ইহকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখতে পেরেছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা কুরআনকে বিশ্বাস করবে, তারা অদৃশ্য জগতকে অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু অদৃশ্য জগতের সম্পর্কে আল্লাহর কিতাৎব ব্যতীত কেউ কিছুই বলতে পারবে না। এ জ্ঞান আল্লাহর নিকট সুরক্ষিত। এমনকি যারা কারচুপি করে আকাশ থেকে অদৃশ্যের খবর জানতে চেয়েছিল, তাদেরকেও তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ এসবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্যই করেছেন। আল্লাহর অদৃশ্যের জ্ঞান তার ফেরেশতারাও পর্যন্ত জানে না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন;

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করেন না। আর যা করতে আদেশ করা হয় তারা তাই করেন।" (সূরা তাহরীম : ৬৫/৬)

রাসূল ﷺ অদৃশ্য সম্পর্কে যে খবর দিয়ে থাকেন, তাও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ অদৃশ্যের জ্ঞান-সম্পর্কে যাকে যা জানিয়ে দেন, তাছাড়া অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে জানার কারো কোন শক্তি নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ করেন;

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾

"তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ তার রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন, রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন কি না জানবার জন্য। রাসূলদের নিকট যা আছে তা তার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সবকিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। (সূরা জিন্ন : ৭২/২৬ - ২৮)

অতএব যদি হাদিস সহিহ হয়ে যাবে তাহলে হাদিস দলিল হিসাবে গ্রহণ করল। অসুবিধা নেই, আর যদি হাদিসের সনদ (বর্ণনা সূত্র) অথবা মতনে (মূল বর্ণনায়) কোন ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে অবস্থার আলোকে আমরা গ্রহণ করব। তেমনিভাবে হাদিসে আহাদকে আমরা অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের আলোকে গ্রহণ করব। ইমাম বুখারী

www.pathagar.com

(রা.) হযরত আলী (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, 'তিনি বলেন, তোমরা মানুষদেরকে সে সমস্ত বিষয় বর্ণনা কর, যেগুলো মানুষ জানে এবং বুঝতে পারে। তোমার কি পছন্দ কর যে মানুষ আল্লাহ ও তার রাসূল অস্বীকার করুক।' তেমনিভাবে ইমাম মুসলিম (রা.) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে হাদিসে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন, তুমি যদি মানুষের কাছে বা কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কথা বর্ণনা কর, যা তাদের বিবেক ও জ্ঞানের পরিধির বাইরে তাহলে তাদের অনেকেই ফিতনার মধ্যে পড়ে যাবে। এজন্য অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে মানুষের জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী কথা বলতে হবে। যাতে মানুষ সহজেই উপস্থাপিত বিষয়কে গ্রহণ করতে পারে। বিভ্রান্তি ও ফিতনা ফাসাদে যেন পতিত না হয়।

তেমনিভাবে আমাদের উচিত ও কর্তব্য যে আমরা শুধুমাত্র হাদিসের সনদ (বর্ণনা সূত্র) নিয়ে ব্যস্ত থাকব না বরং সনদের সাথে সাথে হাদিসের মতন (মূল বর্ণনা) নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করব। তেমনিভাবে আমরা যখন হাদিসের তাবিল, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করব তখন এমনভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব যাতে পবিত্র কুরআনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং ব্যাখ্যার সাথে যেন মিল হয়। পবিত্র কুরআনের সাথে যেন বিরোধ বা সংঘর্ষ না হয়। এবং শরিয়তের মূলনীতি অনুযায়ী হয়। কারণ, শরিয়তের অন্যান্য দলিল প্রমাণ হাদিস, ইজতেহাদ, কিয়াম, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সবকিছুরই বিশুদ্ধের মূলনীতি ও মাপকাঠি হচ্ছে কুরআন। কুরআনের সাথে মিল হলে গ্রহণযোগ্য আর সাংঘর্ষী হলে পরিত্যাজ্য। তেমনিভাবে আমাদেরকে রাসূলের হাদিসের প্রতি যত্নশীল হতে হবে কারণ রাসূলের হাদিস হচ্ছে ইসলামী শরিয়তের অমূল্য সম্পদ। রাসূলের হাদিস তথা সুন্নাতে কম-বেশী, হ্রাস-বৃদ্ধি করার কোন অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই কারণ রাসূলের যথেষ্ট পরিমাণ হাদিস রয়েছে ইসলামী শরিয়ত ও পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তেমিনভাবে রাসূলের হাদিসের সাথে অন্যকিছুর মিশ্রণ ও ভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। রাসূলের হাদিসের সংমিশ্রণ এবং যথাযথ সংরক্ষণের অভাবেই অপসংস্কৃতি, বিপর্যয়, কুচিন্তা, প্রতারণা যাদুবাদী ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। অতএব হাদিস সহিহ হলেই এবং কুরআনের বাণী ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং ইসলামী শরিয়তের মূলনীতির সাথে মিল হলেই হাদিস গ্রহণ করা যাবে।

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে কুসংস্কার যাদুবাজী ভেলকিবাজী এবং প্রতারণামূলক চিন্তা ভাবনা চর্চার কোন সুযোগ নেই। মানুষের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার যাদুবাণী আর ভেলকীবাজার নির্মুলের জন্য পবিত্র কুরআনের (معوذتان) 'মুআওয়াযাতান (সূরা নাস এবং সুরা ফালাক)ই যথেষ্ট। মানুষের মধ্যে

www.pathagar.com

আত্মিক ও মানসিকভাবে তাদের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা, কুচিন্তা, মিথ্যাচার শংশয় আর ভয় ভীতির সৃষ্টিকারী সকল প্রকার বস্তুগত অবস্তুগত যাদুটোনা, ভেলকিবাজী, ধাঁধা লাগানো, বা ধাঁধাবাজ, মিথ্যাবাদী দাজ্জালদের অবাধ বিচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধর্ম, লেখাপড়া, কলম-কাগজের ধর্ম সভ্যতা সংস্কৃতির ধর্ম রাসূলের রেসালত ইসলাম ধর্মের পূর্বেও প্রচলিত ছিল।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন আমাদেরকে বলে দিচ্ছে!

﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾

"তাদের যাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হল তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।" (সূরা তা'হা : ২০/৬৬)

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে আরো জানাচ্ছে;

﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ﴾

"অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তারা যা শিক্ষাগ্রহণ করত তা তাদেরই ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না।" (সূরা বাকারা : ২/১০২)

কুরআন আমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে যে এ সকল, যাদুঘর, দাজ্জাল, ভেলকিবাজী প্রতারকগণ কারো কোন উপকার, সম্পদের উপকার, সন্তানের উপকার আত্মিক ও মানসিক কোন ধরনের উপকার করতে পারবে না। তেমনিভাবে মান-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, আত্মিক ও মানসিক কোন ধরনের ক্ষতি সাধনও করতে পারবে না। তারা শুধু মরীচিকার ন্যায় ধাঁধা লাগানো অস্থায়ী অবাস্তব কিছু দেখতে পারে মাত্র। তাদের কাছে কোন ধরনের সাহায্য অথবা কল্যাণ চাওয়া মানেই হচ্ছে মরীচিকার ন্যায় অবাস্তব কিছুর কামনা করা। তারা যদি তাদের ভেলকী, ভোজ-বাজি, যাদুটোনা আর প্রতারণা দিয়ে কোন উপকার করতে পারত তাহলে সর্বপ্রথমেই তারা নিজেরা তা দ্বারা উপকৃত হত। তেমনিভাবে তাদের যদি কোন অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা থাকত, তাহলে প্রথমে তারা নিজেরাই অনিষ্ট থেকে বেঁচে যেত। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের কোন উপকার ও কল্যাণ সাধন করতে পারে নি। নিজেরাই অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারে নি। অতএব তাদের এসব কিছু অহমিকা আর অবাস্তব ছাড়া কিছুই নয়।

www.pathagar.com

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহর কাছে দোয়া ও প্রার্থনা করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় হচ্ছে معوذتان (মুআওয়াযতান) অর্থাৎ সুরা নাস এবং সুরা ফালাক। এ দুটি সূরার মাধ্যমে বিবেক বুদ্ধি ও অন্তরকে হেদায়ত করা যায়। সকল প্রকার যাদুটোনা ভেলকিবাজি, ধান্দাবাজি, প্রতারণা এবং আত্মিক ও মানসিকভাবে সকল প্রকার প্রতারণা আর কুমন্ত্রণা ও মানসিক সকল প্রকার রোগ বালাই থেকে এ দুটি সূরার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অতএব যান শয়তানি ওয়াসওয়াসা কুমন্ত্রণা, ও অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে معوذتان বা সূরা নাস ও সূরা ফালাক। এটিই হচ্ছে রহমানী সাহায্য পাওয়ার উপায়। এটিই কিন্তু মানুষের ভ্রান্ত-আক্বিদা, বিবেক-বুদ্ধি সংশোধন করার মাধ্যম। ভেলকিবাজী, ধান্দাবাজী চর্চা আর অনুশীলনের মাধ্যম নয়।

অতএব معوذتان সূরা নাস এবং সূরা ফালাকের মধ্যে সূরা নাস হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সেই অংশ বা সূরা যার মাধ্যমে মানুষ এবং জিন জাতীয় শয়তান ও তার অনুসারী উত্তরসুরীদের ওয়াসওয়াসা, কুমন্ত্রণা কুচিন্তা বিবেক বুদ্ধির বক্রতা এবং পাপ কাজের অনুপ্রেরণা ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যম। এর মাধ্যমে আল্লাহ শয়তান ও তার অনুসারী উত্তরসূরীদের কুমন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন।

আর সূরা ফালাক হচ্ছে কুরআনের সেই অংশ বা সূরা যে সূরার মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। এবং মানুষের মধ্যে যারা দুষ্ট নষ্ট পথভ্রষ্ট যাদুঘর, প্রতারক ভেলকিবাজ দাজ্জাল, তাদের অনিষ্ট ও যাদুবাজি এবং প্রতারণা থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। আল্লাহ এ সূরার মাধ্যমে এ সকল যাদুবাজি থেকে ভাল মানুষদেরকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকে।

যাদু হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে দুষ্ট ও যাদুবাজ লোকেরা সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্ধকারের মত ধাঁধা সৃষ্টি করে দেয়। এ যাদুর চর্চা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা, শয়তান ও মুর্তিপূজারীদের থেকে চলে আসছে। তাদের মধ্যে রয়েছে, ফেরাআউনী যাদু চর্চা, বেবিলনীয় যাদু চর্চা, ইউনানি যাদু চর্চা। যা সে সভ্যতার বিশেষ শয়তানরূপী ব্যক্তিবর্গ যাদু শিক্ষা করত অন্যদের শিখাতো, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারত না। তাদের মধ্যে ধাঁধা সৃষ্টি করে দিত। কোন কোন সময় তারা যাদুকে কাজে লাগানোর জন্য বিশেষ জ্ঞান অর্জন করত। সেই প্রাচীন কাল থেকে যাদুর চর্চা আজও চলে। এবং নানা প্রকৃতির দৃশ্য-অদৃশ্য, শ্রুত-অশ্রুত নানা ধরনের যাদুর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ধাঁধা সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের অনিষ্ট এবং আত্মিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করে আসছে। এমনও ক্ষতি সাধন করছে, যার চিকিৎসা প্রদানে মানুষের ব্যর্থতা স্বীকার করছে।

www.pathagar.com

কিছু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে যদিও যাদুবাজরা তারা নিজেরা নিজেদের পর্যন্ত কোন উপকার করতে পারছে না নিজেদেরকে অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারছে না। তারপরও কিছু মানুষ তাদের কাছে নানা ধরনের রোগমুক্তির জন্য, বিভিন্ন ধরনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য অথবা যে কোন ধরনের কল্যাণ কামনার জন্য যাদুবাজদের কাছে আশ্রয় নেয়। অথচ তারা তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের কল্যাণ পাচ্ছে না। তেমনিভাবে তাদের কাছে অনেকেই অন্যের অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধনের জন্য, অন্যের ধ্বংস বয়ে আনার জন্য, সেই যাদুবাজদের কাছে গিয়ে থাকে এবং অনায়াসে অন্যের ক্ষতি সাধন করেই যাচ্ছে।

এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই তাদেরও ক্ষতি সাধন এবং অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে সূরা ফালাকের মাধ্যমে সাহায্য ও আশ্রয় চাইতে হবে। যাতে যাদুবাজ ও তাদের অনুসারী ও উত্তরসূরীদের অনিষ্ট প্রতারণা ও জাদুবাজী থেকে আমাদের মুক্তি দান করেন।

তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ঈমান আনার আমল, ধর্মীয় মূল্যবোধের হেফাজতের জন্য সমাজের নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের উচিত এবং অবশ্য কর্তব্য; সেই জাদুবাজ প্রতারক, দুষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং সাধারণ মানুষগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে সজাগ ও সতর্ক করে তোলা। এবং তাদের কর্মকাণ্ডের এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তাহলে অবশ্যই যাদুবাজদেরকে ধ্বংস এবং সত্যবাদীদের বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ্।

মুহাম্মদী রেসালতের পূর্ববর্তী বিশ্ব এবং পরবর্তী বিশ্ব

রাসূলের রিসালতের পরবর্তীযুগের প্রতি এবং পূর্ববর্তী যুগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই যে, এ দু' যুগের মধ্যে পার্থক্য ও তফাৎ রাসূলের রেসালতের যুগের পূর্ববর্তী যুগের যেমনি ছিল মু'জিযা আর অলৌকিক ঘটনাবলী তেমনি ছিল প্রতারণা ও প্ররোচনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু রাসূলের রেসালতের পরবর্তী যুগ ছিল সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর কুরআন সুন্নাহর দিক নির্দেশনায় পরিপূর্ণ।

এ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন ও উপকারী বলে মনে করি। তখনকার সময়ে সমাজে সাধারণভাবে যাদুর প্রভাব বেশি ছিল। যাদুবিদ্যা নিয়ে যাদুবাজ, প্রতারক ধোঁকাবাজরা ব্যস্ত ছিল। কুরআনের সে ঘটনাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে হজরত সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে। শয়তান হজরত সুলাইমান (আ.) কে প্রতারণা করেছিল। হারুত-মারুত নামে দু'জন ফেরেশতার মাধ্যমে সুলাইমান (আ.)-কে ধোঁকা দিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন;

www.pathagar.com

﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ﴾

"আর সুলাইমানের (আ.) রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। সুলাইমান (আ.) কুফুরি করেন নাই, কিন্তু শয়তানরাই কুফুরি করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাউকে শিক্ষা দিত না, এ কথা না বলে যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফুরি কর না। তারা উভয়ের নিকট হতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিক্ষা করত, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানতো যে, যে কেউ উহা ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছে। হায়! যদি তারা জানত।"

(সূরা আল বাকারা : ২/১০২)

আমরা যদি কুরআনের এ আয়াতের প্রতি চিন্ত করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, কুরআনের এ আয়াতটি রাসূলের রেসালত, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর বুদ্ধিমত্তার ধর্ম কুরআন সুন্নাহর বিধান সম্বলিত বিশ্বমানবতার ধর্ম ইসলামের পূর্ব-যুগের অনেক বিষয় ও ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেছে। রাসূলের রিসালতের পূর্বযুগে সীমিত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত মানবতার প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছিল। তাদের প্রতি ধারাবাহিকভাবে নবীদের মাধ্যমে রিসালতের সাহায্যে দিক-নির্দেশনা দেয়া হত। এভাবে তাদের বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি অগ্রগতি হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে রাসূলের রিসালাত কুরআন ও সুন্নাহের দিক-নির্দেশনায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতির যুগে এসে পৌছায় যার রিস্ত

www.pathagar.com

ারিত আলোচনা সূরা জিনে পাই। তেমনি আমরা বিস্তারিত আলোচনা পাই পূর্বযুগে কি ঘটেছিল এবং বর্তমান রাসূলের রিসালতের জ্ঞান-বিকাশের যুগে কি ঘটছে। সূরায় বাকারার ১০২নং আয়াতে হযরত সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে যে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআনে অন্যান্য স্থানে সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে যে সকল ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শয়তান তাকে প্রতারিত করতে চেয়েছিল। ঘটনাগুলো বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সুলাইমান (আ.) এর অলৌকিক ঘটনাবলী, তার দয়া ও খোদায়ী শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। যা শয়তানী শক্তিতে ঘটে নি। এতে সুলাইমান (আ.) এর ঈমান আক্বিদায় কোন কটাক্ষ করা হয় নি বা ক্ষতি হয় নি।

আর বাবিল শহরে হারূত-মারূত-সম্পর্কীয় কুরআনে বর্ণিত ঘটনা ও রাসূলের রেসালতের পূর্ববর্তী যুগের নবীদের অলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা। মানব সভ্যতার প্রাথমিক যুগের একটি বিষয়। সেখানেও রয়েছে হক-বাতিল এবং সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব। এজন্য সে যুগের ঘটনা দিয়ে কুরআন বুঝা বা অনুধাবন করা উচিত নয়। কারণ, ফেরেশতারা যে মানুষদেরকে যাদু শিখাবে, কুফুরিও খারাপ বিষয় শিক্ষা দিবে, সেটা যেমন বিবেককে সমর্থন করে না তেমনি ফেরেশতাদের স্বভাবের পরিপন্থি। ইসলামও তা সমর্থন করে না। আর এটিই হচ্ছে প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস, ইবনে আবজা ও ইবনে হিব্বানের মত। এজন্য তারা কুরআনে অত্র আয়াত مَلَكَيْنِ (মালিকাইন) শব্দের লাম বর্ণের নিচে যের দিয়ে পড়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, উক্ত শব্দের লাম বর্ণে যের দিয়ে পড়লে তার অর্থ হবে, দু'জন বাদশাহ আর যবর দিয়ে পড়লে তার অর্থ হবে দু'জন ফেরেশতা। এখানে যবর দিয়ে পড়ার কিরাত ও যের দিয়ে পড়ার অবস্থাকে সমর্থ করে। এজন্য তারা এ কিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তখন অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে তারা ছিল গণকদের অনুসারীদের বাদশাহ। তারা ইউনানি সভ্যতার পূর্বে প্রাচীন সভ্যতার যুগে গণকদের অনুসারীদের বাদশাহ ছিল। তারা নিজেদেরকে বিশেষ ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও বিশেষিত করে রাখত, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের সামনে নিজেদের শক্তি সামর্থ পেশ করত। আর এ ধরনেরই ঘটনা ঘটেছিল হযরত মূসা (আ.) এর যুগে ফিরাউনের অনুসারী যাদুবাজরা তাদের যাদুর রশি আর লাঠি মূসা (আ.) এর সামনে ছেড়ে দিয়ে মানুষের চক্ষুতে ধাঁধা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু মূসা (আ.) যখন আল্লাহর নির্দেশে তার হাতের লাঠি ছেড়ে দিলেন, তখন তার লাঠি সাপ হয়ে তাদের যাদুর সবকিছু গ্রাস করে ফেলল। তখন তারা সবাই সঠিকভাবে মুসা (আ.) এর মর্যাদা ও অবস্থা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারেন। প্রাচীন যুগের গণক ও বাদশাহদের অবস্থা ছিল ইউনানি সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রাচীন গণকরা তাদের বিশেষ জ্ঞানকে সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষ থেকে গোপনে রাখত। আর ইউনানি সভ্যতায় তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দিত যাতে সকলেই শিখতে পারে।

আর যখন এ গণক বাদশাহরা তাদের নিকট সংরক্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দিত, তখন ঐ লোকগুলো কোন কোন সময় এ বিশেষ সংরক্ষিত জ্ঞানকে ভুল পথে ব্যবহার করে ফেলত এবং সাধারণ মানুষদের ক্ষতি করে ফেলত। এজন্য এই গণক বাদশাহগণ তাদের ছাত্রদেরকে এই বিশেষ রক্ষিত জ্ঞান সম্পর্কে হুশিয়ার ও সতর্ক করে দিলেন, যাতে তারা এই জ্ঞানকে ভুল পথে ব্যবহার না করে এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতি সাধন করে সমাজে ফিতনা ফাসাদ দৃষ্টি না করে। তারা সাধারণ মানুষদের সত্যপথ থেকে বিচ্যুতি ও গুমরাহ না করে।

তারা এ বিশেষ যাদু জ্ঞানকে যে ভুল পথে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের ক্ষতি সাধন, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে মানুষকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুতি ও গুমরাহ করবে ইত্যাদি দিক তুলে ধরেছে আলকুরআন, যে তাদের এ ধরনের ব্যবহার তাদের বিশেষ জ্ঞান এবং আল্লাহর নিয়ামতের না শুকরিয়া আর অকৃতজ্ঞতার নামান্তর, এতে তাদের কোন উপকার হবে না। আর এ বিষয়টিই বুঝিয়ে দেয়া এবং মানুষদের শিখিয়ে দেয়া এটাই হচ্ছে সৎ ও সত্যবাদী শিক্ষক ফেরেশতাদের কাজ। ফেরেশতারা তাই করেছিল। এটাই হচ্ছে ফেরেশতা ও আম্বিয়াদের কাজ।

এখানে পাঠকদেরকে আরেকটি বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যে, আমরা বাস্তবে অবলোকন করে থাকি যে যাদুতে রশি, লাঠিসহ অন্যান্য জিনিসপত্র নড়াচড়া করে। শব্দ করে অত্যন্ত দ্রুতবেগে পরিবর্তন হয়ে যায়। এক অবস্থা থেকে অন্যাবস্থায় রূপান্তর হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এগুলো কিছুই নয়, এগুলো ছবিমাত্র। যাদুবাজদের হাতের চালাকিতে এগুলো করে থাকে। যার বাস্তব উদাহরণ আমরা নাটক সিনেমায় ও ছবিতে দেখতে পাই, যেখানে টেলিভিশনের পর্দায় মুহূর্তে ছবিগুলো বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করছে, কথা বলছে, নড়াচড়া করছে অথচ বাস্তবে তা ছবিমাত্র।

তেমনিভাবে যাদুবাজ, ধোঁকাবাজ, ভেলকিবাজ, দাজ্জাল তাদের চালাকি এবং বিশেষ জ্ঞানের (যন্ত্র) মাধ্যমে, কোন সময় যাদুর নামে, কোন সময় ধর্মের নামে, কোন সময় ভেলকিবাজের নামে কোন সময় অন্য নামে। তারা তাদের যাদুগুলো যেকোন নামেই করুক না কেন তাদের লক্ষ্য একটাই। সেটা হচ্ছে, সাধারণ মানুষদেরকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়ে ধোঁকা দিয়ে টাকা পয়সা কামাই করা, মানুষের ক্ষতি সাধন করা। কোন মুমিন মুসলমান এ ধরনের যাদুবাজি কাজ করতে পারে না এবং তার ঈমান আখলাক চরিত্র এবং ধর্মকে নষ্ট করতে পারে না।

www.pathagar.com

যাদুবাজ প্রতারক এবং দাজ্জালরা তাদের যাদু ও প্রতারণার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ফেলে, মানুষের অনেক ধরনের ক্ষতি সাধন করে, সমস্যায় ফেলে দেয়। ঈমান আখলাক আকিদা ধ্বংস করে দেয়। এজন্য বিশেষজ্ঞ ও সচেতন ব্যক্তিদের উচিত ও কর্তব্য যে, তারা যেন সাধারণ মানুষদেরকে সচেতন করে তোলে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যাতে সাধারণ মানুষ পবিত্র কুরআনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের ঈমান আখলাক ও আকিদার হেফাজত করতে পারে এবং সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারে।

সাংস্কৃতিক পরিশোধন এবং কারিকুলামের সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা

শরিয়তের অনেক দলিল প্রমাণ এখনও রয়েছে যেগুলো সাধারণত সঠিক হিসেবে পরিগণিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সনদ (বর্ণণাসূত্র) অথবা মতনের (মূল বর্ণনা) ভুলের কারণে সঠিক নয়। অথচ আমরা আমাদের সঠিক কারিকুলামের অভাবে তা অনুধাবন করতে পারছি না। বিশেষ করে মতন মূল বর্ণনার পর্যালোচনা এবং সনদ (বর্ণনাসূত্র) সম্পর্কে যথাযথ অনুশীলন আলোচনা পর্যালোচনার সঠিক কারিকুলাম ও নিয়ম নীতির অভাবের কারণে অনেক সময় দলিল প্রমাণগুলো বুঝতে এবং অনুধাবন করতে সমস্যা হয়ে থাকে। যার কারণে যাদু-প্রতারণা, ভেলকিবাজি, অপসংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির আত্মিক এবং মানসিক প্রতিনিধিত্বমূলক চিন্তা চেতনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এজন্য আমাদেরকে এ পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে হবে। সনদ এবং মতনের (মূল বর্ণনা ও বর্ণনা ধারা) আলোচনা পর্যালোচনার জন্য আমাদের সঠিকভাবে কারিকুলাম তৈরি করতে হবে।

আমি যা আলোচনা করে এসেছি, তার মানে এ নয় যে, আমি এ বিষয়ে চূড়ান্ত একটি সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি। বরং আমার আলোচনার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাতির বিবেকবান, বুদ্ধিজীবী, অনেক-উলামাদের সামনে চিন্তা গবেষণা, আলোচনা-পর্যালোচনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়া। যাতে তারাই সভ্যতা-সংস্কৃতি, নিয়ম-নীতি, কারিকুলাম প্রণালী এবং সমস্যা ও সংকটের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও আলোচনা পর্যালোচনা করে শরিয়তের আলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সকল চ্যালেঞ্জ আর প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

আমাদের বিজ্ঞ সমাজ জাতির বিবেকরাই, আমাদের চিন্তা-গবেষণা কীভাবে চলবে, কোন মাধ্যম অবলম্বন করতে হবে, কোন মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিশোধন করা

www.pathagar.com

যাবে, জাতির অন্তরাত্মাকে রোগমুক্ত করা যাবে, জাতির চিন্তা-চেতনা অনুভূতি ফিরে পাবে, ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও সঠিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারলেই মুসলিম উম্মাহ ও জাতির অবস্থার উন্নতি হবে, সন্ত্রাসী আর উস্কানীকে বক্তব্য পরিহার করা হবে, জাতির আত্মিক ও মানসিক শক্তি ও চেতনা ফিরে পাবে। তখনই জাতির জাগরণ সম্ভব হবে।

তারবিয়াতগত অভিযোগ : পদ্ধতি ও সূচনা

সভ্যতা সংস্কৃতি এবং কারিকুলামগত সমস্যা ও অভিযোগের পর সবচেয়ে বড় সমস্যা ও অভিযোগ হচ্ছে, তারবিয়াত এবং পরিচর্যাগত সমস্যা। তারবিয়াত এবং পরিচর্যাগত সমস্যার কারণে জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি কলুষিত হয়ে পড়ে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার এবং পরিশোধনের মাধ্যমে জাতির জাগরণের শক্তি সঞ্চার করতে হলে তারবিয়াত এবং পরিচর্যাগত অভিযোগ ও সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির অনেক চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিনিময়ে জাতির তারবিয়াত ও শিষ্টাচার বিষয়ক ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে তা থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু তার পরও মুসলিম উম্মাহ ও জাতি তাদের এ মারাত্মক ব্যধি থেকে আশানুরূপ পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভ করতে পারে নি। মনে হয় জাতির সাধারণ বিবেক এ সত্য অনুধাবন এবং আত্মস্থ করতে পারেনি যে, মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সঠিক পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের একমাত্র হাতিয়ার এবং উপায় হচ্ছে শৈশবকালীন যথাযথ তালিম তাবরিয়াত, আদব-শিষ্টাচার এবং পরিচর্যা। কিন্তু আজও শিশু বিষয়ক আদব-শিষ্টাচার, তালিম তারবিয়াত এবং পরিচর্যা অনেক দূরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। যার কারণে জাতির চিন্তা-চেতনা ও উদ্ভাবনী শক্তি স্থবির হয়ে আছে। পিছিয়ে পড়েছে জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি অগ্রগতি।

আজকে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তা গবেষণায় পিছিয়ে পড়া এবং নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টির মূলে রয়েছে তারবিয়াত এবং শিষ্টাচারগত সমস্যা। কারণ, একজন ব্যক্তি তার বাল্য বয়সে তারবিয়াত ও আদব-শিষ্টাচারের শিক্ষা ছাড়া তার ব্যক্তিগত জীবনে পরিবর্তনের ও পরিশোধনের উপায় কী সেটি উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে সে তার ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক নানা ধরনের সমস্যা সংকট ও দুর্ঘটনায় পতিত হয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তখন তার পক্ষে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পরিবর্তন, পরিশোধন এবং

www.pathagar.com

পুনর্গঠনের চিন্তা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে পরিবর্তন পরিশোধন এবং পুনর্গঠন করতে হলে বাল্য বয়সে তালিম তারবিয়াত এবং আদব-শিষ্টাচারের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

তালিম তারবিয়াত এবং আদব-শিষ্টাচারমূলক গবেষণার অভাবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সামাজিক, মানবিক এবং প্রশাসনিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। তারবিয়াতি শিক্ষার অভাবেই উপনিবেশবাদী ব্যাধি সমাজে বিস্তার লাভ করে যা সামাজিক, প্রশাসনিক, মানবিক এবং প্রশিক্ষণমূলক চিন্তা-গবেষণা ধ্বংস করে দেয়।

বিচ্ছিন্নতা, বিপর্যয়, যুলুম, নির্যাতন, সন্ত্রাসী ও পরাধীনতামূলক জীবনের সামনে সামাজিক ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে নি। আজকে সমাজের অধিকাংশই দাসত্ব ও পরাধীনতামূলক জীবনে চলে গেছে। শক্তিশালী প্রভাবশালী ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সামনে তাদের মস্তক অবনত। অনেক দুঃখ-কষ্ট আর অপমানের জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে দাসত্ব আর পরাধীন সমাজের লোকদের মধ্যে কোনো সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও যৌথ প্রয়াসের উদ্দ্যোগ থাকে না। তাদের পক্ষে কোনো ধরনের অন্যায় দুর্নীতি ও যুলুমের প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। সরল সঠিক পথে চলা এবং উম্মাহ ও জাতির অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না।

সাধারণত একাকী, দাসত্ব ও বিচ্ছিন্ন পরিবেশে শিশুর প্রশিক্ষণ ও তালিম তারবিয়াত আদব-শিষ্টাচারের ব্যবস্থা থাকে না। মানুষের মান-মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের ও উন্নতি সাধনের কোনো পথ থাকে না। এসব সমাজে বড়দের আর নেতাদের মন মানসিকতা ও তাদের চাহিদানুযায়ী জীবন-যাপন করতে হয়। সেখানে আত্মীয়তা ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মীতার কোনো বালাই নেই। কোনো ধরনের প্রশ্ন, অভিযোগ এবং আলোচনা পর্যালোচনার সুযোগ নেই। বরং সর্বাবস্থায় আনুগত্য আর চুপ করেই থাকতেই হয়। শিশুদের মতামত ও তাদের চাহিদার কোনো গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। তাদের চাওয়ার কোনো মূল্যবোধ নেই, তাদের অন্ধ অনুকরণ আর নির্দেশ পালন ছাড়া কোনো গতি নেই।

তালিম তারবিয়াত এবং শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রতি যত্নবান হবার প্রয়োজনীয়তা

তালিম তারবিয়াত এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমই হচ্ছে শিশুদের উন্নয়নের মূল বিষয়। শিশুদের তালিম তারবিয়াত ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসেবে রাসূল ﷺ-এর মূল ভিত্তি ছিল মায়া-মহব্বত, দয়া-অনুগ্রহ, আদব-ভালবাসা, আর উৎসাহ উদ্দীপনা।

www.pathagar.com

সামাজিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে তার পরবর্তী পদক্ষেপ। শিশুদের যদি মায়া মহব্বত, আদর-যত্ন এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে তালিম তারবিয়াত এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদান না করা হয় তাহলে তাদের শক্তি সমর্থ বৃদ্ধি হবে না। সভ্যতা-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং সামাজিক পরিবর্তনও সাধন সম্ভব হবে না। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির জাগরণ সৃষ্টিও সম্ভব হবে না।

এজন্য আমাদেরকে শিক্ষা সংস্কৃতি, তালিম তারবিয়াতের উপকরণের সঠিক ব্যবস্থা এবং চিন্তা-জগতের পরিশোধন থেকে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। তাহলেই আমাদের ব্যক্তি গঠন সম্ভব হয়, আর যখন ব্যক্তি গঠন সম্ভব হবে তখন ঐ ব্যক্তিগুলো তাদের দল, উপদল ও সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সে নিজেও জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে এবং জাতির বাগান তৈরি করতে সক্ষম হবে।

শিশুশিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের উপকরণ ও মাধ্যমের যথাযথ সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং পরশোধনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শিশুদের জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি উন্নতি করতে এবং সঠিকভাবে ব্যক্তিত্বগঠন করতে সক্ষম। তাওহিদ, রেসালত, ঈমান-আখলাক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করতে পারব। এজন্য আমাদেরকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পদ্ধতি এবং ইসলামী মূলনীতি সমূহে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং ইসলামী গবেষণার ক্ষেত্র ও পরিধি ব্যাপক করতে হবে। শিশুর শক্তি-সামর্থ বৃদ্ধি, তাদের মধ্যে সৎগুণাবলী তৈরি করতে এবং সঠিক গবেষণার ব্যবস্থা করতে, উপকরণ, মাধ্যম ও সুযোগ-সুবিধার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে আজকের শিশুরা ভবিষ্যতে সকল প্রকার চ্যালেঞ্জ আর প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির আশানুরূপ পরিবর্তন ও পরিশোধন করতে সক্ষম হয়।

নীতিমূলক গবেষণার অবক্ষয়ের কারণে তালিম তারবিয়াতমূলক গবেষণার অবনতি

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির চিন্তা গবেষণার ইতিহাসে তালিম-তারবিয়াত এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অবক্ষয় ও অবনতির কারণ হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ্‌র সামাজিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবক্ষয় ও অবনতি এবং তাদের চিন্তা গবেষণায় রাসূল ﷺ প্রদত্ত বা নবীর শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের নিয়ম-নীতি ও কারিকুলামের অনুপস্থিতি। যার কারণে আজকে মুসলিম উম্মাহ্‌র মক্তব ও পাঠশালা সমূহের এ করুণ অবনতি, এ অবস্থা। মুসলিম

www.pathagar.com

উম্মাহ্‌র মক্তব ও পাঠশালাসমূহ প্রাথমিক কুরআনী শিক্ষা আর যৎ সামান্য হিসাব-নিকাশ শিক্ষা দিয়ে থাকে তাও আবার অভাবী গরীব দিন-মজুর অভিভাবকদের ব্যয়ভার গ্রহণের মাধ্যমে সেখানে রয়েছে অযোগ্যতা, ত্রুটি বিচ্যুতিসহ নানা ধরনের সমস্যা। সেখানে যেমন রয়েছে শিক্ষা প্রশিক্ষণের উপকরণাদির যথেষ্ট অভাব তেমনি রয়েছে কারিকুলাম নীতিমালা, নিয়ম-পদ্ধতি ও যোগ্য শিক্ষক মণ্ডলীর প্রচণ্ড সংকট। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া তারা খুবই কম পেয়ে থাকে।

এজন্য আমাদের মুসলিম উম্মাহ ও জাতির চিন্তাবিদ, গবেষক ও আলেম উলামাদেরকে নিয়ে এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা, আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হবে। মক্তব ও পাঠশালার অবস্থা উন্নয়ন, পাঠদানের পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি, শিক্ষা প্রশিক্ষণের কারিকুলাম, সুযোগ-সুবিধা, উপকরণসহ যোগ্য শিক্ষক ইত্যাদির ব্যবস্থা করে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শিশু কিশোরদের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও তালিম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ নিশ্চুপ থাকলে হবে না, বরং তাদেরকে সচেতনতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে একটি নিয়ম নীতির ভেতর দিয়েই সংস্কার করতে হবে। সাধারণত শিক্ষামূলক সংগঠনসমূহকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে এহেন বিপর্যয় থেকে তুলে আনতে হবে। কারণ, কোন জাতির মধ্যে তালিম তারবিয়ার এবং শিক্ষা-দীক্ষা অবনতি আর অবক্ষয় দেখা দিলে, সেখানে অপসংস্কৃতি, অসভ্যতা, বিশৃঙ্খলা-সহ নানা ধরনের বিপর্যয় দেখা দিয়ে থাকে। জাতির শক্তি সামর্থ ও উদ্ভাবনী শিক্ষাকে ধ্বংস করে ফেলে। এজন্য এ বিষয়কে আমাদের অবশ্যই গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

তালিম-তারবিয়াতের মূলনীতি ও ব্যবস্থাপদ্ধতির অতীত ও বর্তমান তালিম তারবিয়াতে নববী পদ্ধতিই আদর্শ

আমাদের জীবনের সকল ভুলের প্রতি দৃষ্টিগোচর করে ভুলের কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আল কুরআনের নীতিমালা, বিধি-বিধান এবং রাসূলের আদর্শ হচ্ছে আমাদের চিন্তা-গবেষণার মূল ভিত্তি। এজন্য আমাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, তালিম তারবিয়াতে ও চিন্তা-গবেষণায় কুরআনের বিধি বিধান এবং রাসূল ﷺ-এর আদর্শকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। রাসূলের আদর্শ বলতে তার জীবনের কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, সমর্থন, দিক-নির্দেশনা এবং মানুষ ও সমাজের সাথে চাল-চলন, আচার-আচরণ ইত্যাদি। রাসূল

www.pathagar.com

ﷺ'র অনুগ্রহ, আচার-আচরণ, মহব্বত-ভালবাসা ও সৎচরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন :

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

'নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী" (সূরা আল-ক্বালাম : ৬৮/৪)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

(সূরা আম্বিয়া : ২১/১০৭)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। (সূরা আল ইমরান : ১৫৯)

রাসূল ﷺ সম্পর্কে এ হচ্ছে আল কুরআনের বাণী।

অপরদিকে পবিত্র হাদিস শরিফে ইমাম মুসলিম (রা.)ইবনে সা'দ-এর সূত্রে আয়শা (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেন;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ

তিনি (আয়শা) বলেন; 'রাসূল ﷺ কোন দিন তার কোনো স্ত্রীকে অথবা কোনো খাদেমকে প্রহার করে নি। আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ব্যতীত কাউকে কোনদিন আঘাত করেন নি।

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রা.) আনাস (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেন।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ

www.pathagar.com

তিনি (আনাস) (রা.) বলেন, "আমি দশ বছর যাবৎ রাসূল ﷺ এর খেদমত করেছি, রাসূল ﷺ কখনো কোনদিন আমাকে উহ বা উফ শব্দ পর্যন্ত বলেন নি। আমি কোনো কাজ করে ফেললে তিনি বলেন নি যে, আমি সেটা কেন করেছি। অথবা আমি কোনো কাজ না করলে কোনো দিন তিনি বলেন নি, আমি সেটা কেনো করি নি।"

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, "তিনি কোনদিন কখনো আমাকে কোন গালিও দেন নি। প্রহারও করেন নি। ধমকও দেননি, আমার মুখে কোন চড়ও দেন নি। আমাকে কোন নির্দেশ দেয়ার পর নির্দেশ পালনে আলস্য করলেও কোনো ধরনের শাস্তি প্রদান করেন নি। এমন কি পরিবারের কেউ দোষারোপ করলে রাসূল তাকে সতর্ক করে দিতেন এবং বলতেন ওকে দোষারূপ করো না যা হবার তাই হবে।"

ইমাম তিরমিজী (রঃ) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেন;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

তিনি (হজরত আবু হুরায়রা) বলেন, রাসুল ﷺ এরশাদ করেন, 'পরিপূর্ণ ইমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। তোমাদের মধ্যে সেই ভাল, যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল। ইমাম ইবনে মাজাহ এবং ইমাম হাকিম রাসূল ﷺ এর হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি (রাসূল ﷺ এরশাদ করেন; তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম ব্যক্তি, যে তার পরিবারের নিকট ভাল এবং আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চেয়ে ভাল।'

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রা.) হজরত আয়শা (রা) থেকে রাসূল ﷺ এর হাদিস বর্ণনা করেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا

তিনি (হজরত আয়শা) বলেন; রাসূল ﷺ কে যে কোনো দুটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ের অনুমতি প্রদান করা হলে তিনি সহজ বিষয়টি গ্রহণ

www.pathagar.com

করতেন, যদি সেটি কোন ধরনের পাপের বিষয় না হয়। আর যদি সেটি পাপের বিষয় হয়, তাহলে তিনি তা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকতেন। রাসূল ﷺ তার নিজের স্বার্থে কারো থেকে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ঐ ব্যক্তি থেকে, যে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে।

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রা.) হজরত আয়শা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন (হজরত আয়শা), আল্লাহ দয়াবান, তিনি সর্বক্ষেত্রে দয়া ও অনুগ্রহকে পছন্দ করেন। ইমাম তিরমিজী (রঃ) হজরত আবু বকর (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন; তিনি বলেন (হজরত আবু বকর) রাসূল ﷺ এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, (হে রাসূল ﷺ আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূল ﷺ বললেন, যেখানেই তুমি থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর। লোকটি বলল (হে আল্লাহর রাসূল) তার চেয়ে আরো বেশি কিছু নসিহত করুন, রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, তুমি প্রতি খারাপ কাজের পরপরই ভাল কাজ করে ফেলবে, তাহলে ভাল কাজ খারাপ কাজকে মুছে ফেলবে। লোকটি বলল, আরো কিছু উপদেশ দিন। রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন; লোকদেরকে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোল। ইমাম আবু দাউদ (রা.) এবং ইমাম তিরমিজী (রা.) হাদিস বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যারা (মানুষের প্রতি) দয়া করে, আল্লাহ দয়াময়– তিনি তাদের উপর দয়া করেন। যারা পৃথিবীর অধিবাসীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করে আকাশের অধিবাসীরা তোমাদের উপর দয়া অনুগ্রহ করবেন।

ইমাম আহমদ (রঃ) হজরত আবু দারদা (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেন;

তিনি (আবু দারদা) বলেন, যখনই আমি রাসূল ﷺকে কথা বলতে দেখেছি তখনই তাকে হাসি মুখে কথা বলতে দেখেছি। ইমাম আহমেদ, ইমাম বায়হাকী এবং ইমাম হাকিম (রঃ) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন; তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন; অবশ্যই উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

এ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সর্বপ্রথম মুরব্বী ও পথপ্রদর্শক রাসূল ﷺ এর সর্বকালের সর্বস্থানে সকল মানুষের জন্য রেখে যাওয়া সর্বোত্তম আদর্শের নিদর্শন ও নীতিমালা। এটিই অর্থাৎ তার রেখে যাওয়া উত্তম আদর্শই মুসলিম উম্মাহ ও জাতির তালিম-তারবিয়াত, শিক্ষা-দীক্ষাসহ সর্ববিষয়ে দিক- নির্দেশনা প্রদান করে। তার বক্তব্য

www.pathagar.com

ও আদর্শে ছিল দয়া, অনুগ্রহ, ভালবাসা, সহযোগিতা-সহমর্মিতা, আদব-শিষ্টাচার, শালীনতা, ভদ্রতা, সমতা, এহসান- তাকওয়া, আল্লাহভীতি আর সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা। তার বক্তব্যে এবং চরিত্রে ছিল না কোনো ধরনের কঠোরতা, নির্দয়তা, যুলুম, নির্যাতন, স্বৈরাচার, অভদ্রতা, হতাশা ও অস্থিরতা ইত্যাদি।

আহ! রাসূলের চরিত্র ও তার আদর্শ এবং বক্তব্য ছিল কত উত্তম ও সুউচ্চ? তার নিয়ম নীতি ও পদ্ধতি ছিল না কতই চিরস্থায়ী, সুদৃঢ়? আর তার চলার গতি ছিল কত তীক্ষ্ণ ও দূরদর্শী?

তালিম-তারবিয়াতমূলক নবী বক্তব্যের সূচনা ছিল ভালবাসা, তুষ্টি ও বীরত্ব

শিশুদের মনমানসিকতা, অনুভূতি, উপলব্ধি, শক্তি, বীরত্ব এবং আখলাক, চরিত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করণে এবং উন্নতি সাধনের মাধ্যমে শিশুদের সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর বক্তব্য, মূলনীতি ও পদ্ধতির সূচনা ছিল দয়া অনুগ্রহ-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, ও নম্রতা-ভদ্রতা ইত্যাদি। রাসূল ﷺ এর মূলনীতি পদ্ধতি এবং শিশু-গঠনের এ সকল বিষয়াবলীকে সঠিকভাবে আত্মস্থ ও অনুধাবন ব্যতীত মুসলিম উম্মাহ ও জাতির বিচ্যুতির এবং অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। শিশুদেরকে যথাযথভাবে সঠিক তালিম তারবিয়াতের মাধ্যমে তাদের আত্মিক এবং মানসিক বিকাশ সাধন সম্ভব হবে না। তাদের মধ্যে বীরত্ব আর শক্তি সঞ্চারের মাধ্যমে জাতির চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করা যাবে না। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার, পরিবর্তন-পরিশোধন এবং পুনর্গঠনের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও সফলতা অর্জন সম্ভব হবে না।

শিশুদের গঠনের ব্যাপারে আমরা রাসূল (সা) এর আদর্শ দেখতে পাই যে, তিনি ছোট শিশু ইবনে আব্বাসের সাথে কী ধরনের ব্যবহার ও আচরণ করেছেন। কীভাবে তার মধ্যে এবং তার প্রভুর মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে ভালবাসার সু-সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। কীভাবে তার হৃদয়ে বীরত্ব, সাহসিকতা এবং আত্ম নির্ভরশীলতার উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছেন। কীভাবে তিনি নামাজের ভেতর দিয়েও শিশুদের অধিকার ও তার তারবিয়াতের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন, নামাজরত অবস্থায় ছোট শিশু তার পিঠের উপর সওয়ার হত, খেলা করত, বসে থাকত ; তিনি সিজদা দীর্ঘ করে ফেলতেন। কিন্তু শিশুটিকে তাড়িয়ে দিতেন না, বা নামিয়ে দিতেন না, বা নেমে যাওয়ার আদেশ করতেন না। রাসূল ﷺ শিশুদের মন মানসিকতা, তাদের চাহিদা অভ্যাস

www.pathagar.com

ইত্যাদি অনুধাবন করতে পারতেন। তাদের মন-মানসিকতা ও ইচ্ছা ও চাহিদানুযায়ী তাদের আদব-শিষ্টাচার ও তালিম-তারবিয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন।

রাসূল ﷺ শিশুদের সাথে শুধুমাত্র বাবার মত ভালবাসা, দয়া-অনুগ্রহ, আর স্নেহ-মমতাবান ছিলেন না। বরং তার উর্ধ্বে তিনি শিশুদের গঠনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু করেছেন। তিনি শিশুদের অনুভূতি ও উপলব্ধির মূল্যায়ন করেছেন। তাদের মন-মানসিকতা ও চাওয়া-পাওয়া চাহিদার গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি যখন শিশুদের পাশ দিয়ে যেতেন তখন তিনি বড়দের মতো সালাম দিতেন। তাদের অবস্থার খোঁজ খবর নিবেন। তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেন।

রাসূলের মজলিসে কোনো শিশু আসলে বা কোনো শিশুকে পেলে তিনি তাদের সাথে বিরূপ আচরণ ও রূঢ় ব্যবহার করতেন না। তাদেরকে তাড়িয়ে দিতেন না। ধমক দিতেন না। বরং তিনি তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাদেরকে ভালবাসা আর স্নেহ মমতার মধ্য দিয়ে নসিহত করতেন. উপদেশ দিতেন। জনসাধারণকে শিশুদের প্রতি ভালবাসা স্নেহ-মমতা, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রতি উৎসাহিত করতেন।

ভালবাসা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা ইনসাফ, সম্মান ও মর্যাদা ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। আর এটিই হচ্ছে শিশু-শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের নবী-শিক্ষার মূলনীতি ও ভিত্তি। রাসূলের ﷺ এ মূলনীতি দিক-নির্দেশনা শিশুদেরকে যোগ্যতাসম্পন্ন শক্তিশালী করে তাদের ইতিবাচক কার্যাবলী ও বিষয়াবলীকে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করে, সর্বক্ষেত্রে তাদের কার্যকরী ভূমিকা পালনের যোগ্যতা তৈরি করতে সহায়তা করে। রাসূলের শিশু-শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতে ছিল না কোনো ধরনের ভয়-ভীতি, ধমক-প্রহার ও তাড়িয়ে দেয়া। যার কারণে শিশুরা সহজেই রাসূল প্রদত্ত ও প্রদর্শিত আখলাক, চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষা এবং তালিম তারবিয়াতকে আনন্দচিত্তে তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করে নেয়। তাঁদের মনে পরিতুষ্টি সৃষ্টি হয়। তারা বাল্য বয়সেই রাসূলের গুণে অর্থাৎ সর্বপ্রকার উত্তম চরিত্র ও ভালগুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। তাদেরকে যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তারা, তা মেনে নবী শিক্ষার মাধ্যমেই তাদের জীবন সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারে। এটিই হচ্ছে শিশুদের তালিম-তারবিয়াতের জন্য সর্বযোগের সকল মানুষের জন্য রাসূল প্রদর্শিত আদর্শ ও দিক নির্দেশনা। রাসূল কোনোদিন কোনো শিশুকে প্রহারও করেন নি, গালিও দেন নি, কটু কথাও বলেন নি। কটু কথা বলা, গালি দেয়া বা প্রহার করার প্রয়োজন হয় নি। আর তাই হচ্ছে সর্বোত্তম নবী আদর্শ।

www.pathagar.com

যারা শিশুদেরকে মুখ দিয়ে গালি দেয়, কটু কথা বলে ধমক দেয়, হাত দিয়ে প্রহার করে অথবা শিশুদের গালি দেয়া কটুকথা বলা, ধমক দেয়া ও প্রহার করা ইত্যাদি সমর্থন করে, প্রকৃতপক্ষে তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছে। কারণ, শিশুদের গালি-গালাজ করা, কটুকথা বলা, শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দেয়া, প্রহার করা ইত্যাদি বাস্তবিক পক্ষে বাবা-মা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব পালনের দুর্বলতা, ত্রুটি বিচ্যুতির প্রমাণ করে। শিশুদের সম্মান মর্যাদার হানি তার অধিকার দলনের নামান্তর, শিশুদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করার নামান্তর।

কোনো কোনো সম্প্রদায় বা জাতি গোষ্ঠী মনে করে যে, তাদের সন্তান-সন্ততি ও শিশুদের তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন, শারীরিক এবং মানসিক চাপ প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের অধিকার রয়েছে, এবং এটিই হচ্ছে তালিম-তারবিয়াতের নিয়ম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়, বরং তাতে হিতে বিপরীত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সেটি শিশুদের প্রাণ শক্তিকে দুর্বল করার নামান্তর। অভিভাবকদের দায়িত্ব পালনে অপারগতার পরিচয়, চাওয়া পাওয়া ও অধিকার হরণের নামান্তর।

সমাজের কোনো মানুষেরই উচিত নয় যে, সে অন্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। তার স্বাধীনতা হরণ করবে। বরং সমাজের প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সমাজের সকল ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব পালনের প্রতি সচেষ্ট করে গড়ে তোলা। তাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও তালিম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা। শরিয়ত নির্ধারিত স্বাধীনতার অনুশীলন করার সুযোগ করে দেয়া। সামাজিক আইন-কানুন, নিয়ম-নীতির প্রতি বাধ্য থাকার ব্যবস্থা করা। সমাজের সকল সদস্যকে স্বাধীনতার মূল ভিত্তি শক্তি, ক্ষমতা ও সামর্থবান হিসেবে গড়ে তোলা। প্রতিনিধিত্বমূলক মনোভাব নিয়ে সত্যের অন্বেষণে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম ও সচেষ্ট করে গড়ে তোলা। ন্যায়-ইনসাফ, সত্য, দয়া-অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করা। ফিতনা-ফাসাদ, বিপর্যয় যুলুম-নির্যাতন ও অধিকার হরণ ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা। নিয়ম-নীতির অসামান্যতা, অধিকার ও দায়িত্ব পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবহেলা থেকে হেফাযত করা। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ তালিম তারবিয়াত সচেতনতা ও বিচক্ষণতার সাথে স্বাধীনতার। সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অত্যাচার বিচ্ছেদ-বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি দূরীভূত করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করাই হচ্ছে প্রকৃত শরিয়ত।

প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে শায়েস্তা করা, প্রহার করা, শাস্তি দেয়া, ইত্যাদি বিষয়ের যদিও অধিকার রয়েছে তবুও সেটি যেন মানুষের মানবিক সম্মানের হানি না ঘটায়, সেদিকে

www.pathagar.com

লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় তাতে সভ্যতা সংস্কৃতি ও শিষ্ঠাচারের অবনতি হতে পারে। কোনো কোনো সময় হিতে বিপরীতও হতে পারে। এজন্য ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে দাস দাসীকে প্রহার করা বা কষ্ট দেয়া যাবে না। যদি কেউ তার রাগ সামলাতে না পারে এবং প্রহার ও কষ্ট দেয়া থেকে বিরত না রাখতে পারে তবে সে যেন এবং তার দাস বা দাসীকে মুক্ত করে দেয় অথবা বিক্রি করে দেয়। এমন কি অন্যায়ভাবে অপ্রয়োজনে সাধারণ কোনো প্রাণীকে পর্যন্ত কষ্ট দেয়া উচিত নয়। একজন মুসলমান অন্যায়ভাবে অপ্রয়োজনে কোনো প্রাণীকে কষ্ট দিতে পারে না। এটি মুমিন মুসলমানের নীতি নয়, তা মুমিনের চরিত্রের বিপরীত। এ ধরনের বিষয় মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। বরং অকল্যাণ বয়ে আনে। প্রতিশোধ আর হিংসা বিদ্বেষের জন্ম দেয় সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অন্যায়ভাবে রাগের বশবর্তী হয়ে কাউকে কষ্ট দেয়া, বিশেষ করে শিশুদেরকে কষ্ট দেয়া, তাদের ইচ্ছা-চাহিদা ও তাদের মনে আঘাত দেয়া তাদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশের প্রতিরোধ এবং দুর্বলতা ভীরুতা ও হিংসা বিদ্বেষের দিকে টেনে দেয়ার নামান্তর। এজন্য এ সকল অবস্থা ও বিষয় থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে।

ভালবাসাই শক্তি ও অনুপ্রেরণা দানকারী :

প্রভাবশালী ফলপ্রসূ সুসম্পর্ক

ভালবাসা ও সুসম্পর্ক শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের শক্তি সামর্থ সাহসিকতা, আত্মতৃপ্তি ও আত্মবিশ্বাসই জন্মায় না, বরং সঠিক ভালবাসা ও সুসম্পর্কের মাধ্যমে তাদের মাঝে ইতিবাচক ও শ্রদ্ধাভাজন ভীতির সৃষ্টি করে। তারা সার্বক্ষণিকভাবে তাদের শ্রদ্ধাভাজন এবং ভালবাসার ব্যক্তির, শিক্ষকের, পিতা মাতার, অভিভাবকের, তথা নবী-রাসূলের এবং স্বয়ং আল্লাহর রাজি ও সন্তুষ্টি কামনা করে। আল্লাহর ভালবাসা ভয়ভীতি নবী রাসূলের শ্রদ্ধা-ভালবাসা, পিতা-মাতা, অভিভাবক তথা গুরুজনের এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্বের মান-সম্মান ও অধিকারের যথাযথ হেফাজত ও সংরক্ষণের চেষ্টা করে। তাদের সঠিক ভালবাসা দিতে পারলে এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে, তাদের মাঝে অপারগতা আর নেতিবাচক ভীতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাদের থেকে আদল, ইনসাফ, ন্যায়-নীতি লোপ পায় না। ভালবাসা, শ্রদ্ধা, আত্মতৃপ্তি, আত্মবিশ্বাস ও আত্ম নির্ভরশীলতা কোন ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি হয় না।

www.pathagar.com

কিন্তু একদিকে তালিম তারবিয়াত ও শিক্ষা দীক্ষার বিষয়াবলী সম্পর্কে লেখাপড়া না থাকার কারণে অপরদিকে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে তালিম তারবিয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা, ও সামাজিক বিষয়াবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে, আমাদের অধিকাংশ জাতির বাবা-মা, অভিভাবক, মুরব্বী ও শিক্ষকরাই ভালবাসা, স্বাধীনতা, নিয়ম-নীতি, শান্তি-শৃঙ্খলা ইত্যাদি সর্ববিষয়ে সংমিশ্রণ করে ফেলে। তারা একটা আরেকটার সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করেন। অথচ এখানের প্রত্যেকটি বিষয় আরেকটির জন্য সহায়ক ও পরিপূরক।

এখানে ভালবাসা বলতে সার্বক্ষণিকভাবে শিশুকে প্রশ্রয় দেয়া নয়, তাদের ভুল-ভ্রান্তি, সীমালঙ্ঘন ইত্যাদি সবসময়ই ক্ষমার চক্ষে দেখা নয়, সব সময় সর্বাবস্থায় তাদের কথায়, ইচ্ছা ও চাহিদায় ইতিবাচক সাড়া দেয়া নয়। বরং সত্যিকারের সঠিক ভালবাসা হচ্ছে শিশু-কিশোর এবং বাবা-মা, অভিভাবকদের মধ্যে এমন একটা আন্তরিক দেখাশোনা ও তালিম তারবিয়াতের সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তার আরাম-আয়েশ, শান্তি-নিরাপত্তা ও আত্মিক ও মানসিক বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, যাতে ঐ শিশুটি জীবনের চলার পথের সঠিক দিক নির্দেশনা পায় এবং সেই অনুযায়ী তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

এজন্য বাবা-মা ও অভিভাবকদের শালীনতা ও ধৈর্য্যের সাথে শিশুদের আত্মিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বোঝা ও অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে এবং শিশু-কিশোরদেরকে তালিম তারবিয়াত ও লালন পালনের সঠিক পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে জানতে হবে। শিশুদের বয়সের স্তরের অবস্থা বোঝে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে। যাতে বাবা-মা-সহ সকল অভিভাবক ও মুরব্বীগণ তাদের সন্তানদের ভয়, ভীতি, ধমক, কঠোরতা ও অমানবিক আচরণ, ধর্ম সাহসিকতা, শালিনতা ভদ্রতা, আর ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাদের সৎচরিত্র ও উত্তম গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন এবং তাদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারেন।

স্বাধীনতা একটি শক্তি : তার পরিধি ও নিয়ম-নীতি

الحرية বা স্বাধীনতার সঠিক অর্থ অনুধাবন অনেকেই করে থাকেন, কেউ কেউ ভুল করেন তাদের বাবা-মা, অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, আদব-শিষ্টাচার ও তালিম তারবিয়াত সম্পর্কে ভুল বুঝানোর কারণে, আবার কেউ কেউ ভুল করেন তাদের শিক্ষক, চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ ও গবেষকদের দায়িত্ব পালনে ভুল থাকার কারণে বা তাদের ভুল

www.pathagar.com

বুঝানোর কারণে। তারা মনে করেন মানুষের স্বাধীনতা মানেই হচ্ছে, তাদেরকে সকল ধরনের ভয়-ভীতি মন থেকে চলে যাওয়া, ইচ্ছাধীন চলাফেরা করা, উন্মুক্ত জীবন-যাপন করা। কেউ তাদের উপর হস্তক্ষেপ না করা ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এ ধারণাটি ঠিক নয়। যার কারণে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ, উশৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় যুলুম নির্যাতন আর অস্থিরতা বিরাজ করে।

এজন্য মানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিশেষ ও নির্দিষ্ট একটি নিয়ম-নীতি, সীমারেখা-পরিধি ও মৌলিক একটি ভিত্তি থাকার একান্ত প্রয়োজন। আর নিয়ম-নীতি ও পরিধি হবে মানুষের স্বভাব ও সামাজিক চাহিদা ও অবস্থান অনুযায়ী। প্রতিটি মানুষ সেই নিয়ম নীতি ও পরিধিকে বুঝে অনুধাবন করে সমাজে বাস করবে। কারণ, এ পৃথিবীতে মানুষের জন্য যেমন রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা, তেমনি পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকুলের জন্য একটি বিধি-বিধান ও পরিচালনা পদ্ধতি। আবার মানুষের সমাজের জন্য রয়েছে নানা ধরনের বিধি-বিধান নিয়ম-নীতি ও পরিচালনা-পদ্ধতি। সমাজের সকল মানুষকেই সেই নিয়ম নীতি ও পরিচালনা পদ্ধতিকে মান্য করে চলতে হবে। অন্যথায় মানুষের সমাজ ও সৃষ্টিকুলের অন্যান্য সমাজের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য থাকবে না, সবকিছু সমান হয়ে যাবে। অপরদিকে রয়েছে মানুষের সমাজের প্রতিটি সদস্যের নির্দিষ্ট স্বাধীনতা, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা। যে ইচ্ছা ও স্বাধীনতারও রয়েছে একটি নিয়ম-নীতি ও সীমারেখা। যে নিয়ম-নীতি ও সীমারেখা হবে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী। এটিই হচ্ছে মানুষের মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা। মানুষকে তার বাস্তব জীবনে এসব নিয়ম-নীতি ও পরিধির ভেতর দিয়েই তার দায়িত্ব পালন ও জীবন-যাপন করা উচিত।

অতএব এ হিসেবে সমাজের কোনো মানুষই বা কোনো সদস্যই সমাজের অন্য সদস্যকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। তার স্বাধীনতার অধিকার হরণ করতে পারে না। বরং সমাজের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের প্রতিটি সদস্যকে তার যোগ্যতানুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্যস্থলে বসিয়ে দেয়া এবং তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের জন্য তাদের সামনে স্বাধীনতার পথ প্রশস্থ করে দেয়া। যাতে সে স্বাধীনভাবে সমাজে নির্ধারিত এবং শরিয়ত প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন বিধি-বিধান, সীমা-পরিধি ইত্যাদি বিষয়ে অনুশীলন করতে পারে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির কল্যাণে শুরাভিত্তিক নিয়ম-নীতি অনুযায়ী তার দায়িত্বের আঞ্জাম দিতে পারে। কারণ, স্বাধীনতা হচ্ছে এমন একটি শক্তি, যে শক্তির মাধ্যমে বিনা বাধায় ও বিনা প্রতিরোধে সমাজের

www.pathagar.com

প্রতিটি সদস্য গোটা সমাজে নগর ইনসাফ, ও সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার প্রতিনিধিত্বমূলক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম ও সামর্থ হবে। অপরপক্ষে সমাজে ফিৎনা ফাসাদ, যুলুম নির্যাতন বিস্তারের মাধ্যমে দায়িত্ব ও কতৃব্য পালনের নাম কখনো স্বাধীনতা নয়। বরং সেটি হচ্ছে সমাজে বিশৃঙ্খলা আর অস্তিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার নামান্তর।

আর সমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে স্বাধীনতা, তার নিয়ম-নীতি, সীমা- পরিধি ইত্যাদি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হচ্ছে শরিয়তের নিয়ম-নীতি ও পরিধি অনুযায়ী গোটা সমাজ ও জাতির সেবায় প্রতিটি সদস্যের নির্ধারিত নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ তালিম তারবিয়াত ও সচেতনতা প্রদান।

এজন্য ইসলামী শরিয়ত মানুষদের তাদের ধর্ম, আকিদা, চিন্তা গবেষণার স্বাধীনতা প্রদান করেছে। কিন্তু মানুষের গোপনীয় ও অন্তরের বিষয়াবলীর প্রতি তথ্য-তালাশ, অনুসন্ধান ও গোপন রহস্য উদ্ঘাটনের প্রতি উৎসাহিত করেনি বরং অন্তরের গোপনীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান নিষেধ করেছে। অন্তরের গোপনীয় বিষয়ে কোন ধরনের শাস্তি প্রদানেরও অনুমতি নেই। ইসলামী শরিয়ত মানুষের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য কাজের উপর ফয়সালা করে থাকে। কারণ, ইসলামী শরিয়তের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর জমিনে প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্ব পালন ও বসবাসের জন্য স্বাধীনতা প্রদান করা। এতে কারো উপর যুলুম করা, নির্যাতন করা, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা, সীমালঙ্ঘন করা, অন্যের অধিকার হরণ করার অনুমতি প্রদান করা হয় নি। অন্যের অধিকার হরণ আল্লাহর জমিনে প্রতিনিধিত্বমূলক জীবন-যাপন এবং দায়িত্বশীলতার পরিপন্থী। মানবতার জীবনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ করেন :

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামাজ নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।

(সূরা মারয়াম : ৫৯)

স্বাধীনতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিষয়ে ইসলাম বুদ্ধিজীবীদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছে যে, মানুষের স্বাধীনতার লক্ষ্য হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব-অনুভূতির প্রশস্ততা প্রদান করা,

www.pathagar.com

যাতে সমাজের সকল মানুষ একে অন্যের কোন ধরনের ক্ষতি না করে সকলেই পরিতৃপ্তি ও আত্মতৃপ্তি সহকারে স্বাধীনভাবে প্রয়োজন মেটাতে পারে। অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি ইসলামী শরিয়তের শূরাভিত্তিক কর্ম-সম্পাদন ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে সকলেই নিজ কল্যাণ অনুসন্ধান করতে পারে। প্রত্যেকেই একে অপরকে নাগরিক মর্যাদা প্রদান করে, মানবিক মূল্যবোধের সাথে ব্যবহার করে। সকলেই তাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শূরাভিত্তিক সুখী সুন্দর জীবন-যাপন করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ করেন :

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾

'তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে।"(সূরা শুরা : ৩৮)

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, একমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে তাওহিদের উপর, অর্থাৎ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত এবং আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনিই এ ধর্মের রিসালতের মালিক। তিনি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে মানবিক বন্ধনের মাধ্যমে সংস্কার ও পরিশোধনের পথ করে দিয়েছেন। আর এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা একমাত্র ঐ সত্তার কাছ থেকেই সম্ভব যিনি সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী, সকল কিছুর স্রষ্টা। আর তারই প্রমাণ স্বরূপ যুগে যুগে স্থানে স্থানে নবী ও রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ করেন :

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

"এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করা পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে এ কুরআন সত্য।" (সূরা হা-মীম-সিজদা : ৫৩)

আর ইসলাম ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম-জাতি, গোষ্ঠী যাদের ভুল ভ্রান্ত ধারণা রেসালাতের দিক নির্দেশনাকে অপমানিত ও ধ্বংস করে দিয়েছে। যারা সামাজিক জীবনের প্রশাসনিক জীবনের স্বাধীনতা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারে নি। স্বাধীনতার সীমা-পরিসীমা, পরিধি ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ধারণা অর্জন করতে পারে নি। তারা নিয়ম-নীতি, ও আদর্শ-পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ-কর্ম ও জীবন পরিচালিত করতে পারে নি। সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের প্রণালী পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। তারা প্রত্যেকেই নিজে নিজের পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। নিজেদের কামনা-বাসনা, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে

www.pathagar.com

তাদের পরিচালনার প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের বিবেক বুদ্ধি থেকে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার চেতনা স্থবির হয়ে গেছে। পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক বন্ধন ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই মনে করে যে সমাজ, দল, গোষ্ঠী ও সংগঠনের কোনো প্রয়োজন নেই। তার নিজের একাকী জীবনই যথেষ্ট, যেমনি ইচ্ছা তেমনি নিজেকে পরিচালিত করতে পারে। যার ফলে এ পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ, হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা আর বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গেছে গোটা সমাজ ব্যবস্থা। এ জাতি তাদের পরিত্রাণের কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ একেক দিন একেক ধরনের মতাদর্শ প্রচার করে থাকে, তারা ইচ্ছামত ফতোয়া এবং রায় দিয়ে থাকে। ইচ্ছামত বিভিন্ন যাযহাব ও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান করতে থাকে। কিন্তু কোন ধরনের সফলতা অর্জন করতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার সঠিক অর্থ, সীমারেখা, পরিধি ইত্যাদি অনুধাবন করতে পারে নি। সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রণালী-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে পারে নি। অথচ তাদের দায়িত্ব ছিল এসব বিষয়ে সঠিক ধারণা অর্জন করা। সমাজের প্রতিটি সদস্যকে এসব বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলা। স্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট থাকা।

আল্লাহ এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেন :

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী কী হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল। তারা জমীনে চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের যুলুম করেছিল।" (সূরা আর-রূম ৩০/৯)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾

www.pathagar.com

"অবশ্যই তোমাদের পূর্বে বহুদলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তারা যুলুম করেছিল। অথচ রাসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে।" (সূরা ইউনুস ১০ : ১৩)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

"বলে দিন (হে রাসূল) তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে।" (সূরা আনআম ৬ : ১১)

অতএব আমাদেরকে স্বীকার করে নিতেই হয় যে মানবিক স্বাধীনতার জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম-নীতি, প্রণালী-পদ্ধতি, সীমা-পরিসীমা ও পরিধির প্রয়োজন, যে পরিধি, সীমা পরিসীমা এবং নিয়ম-নীতিগুলো সাধারণ শূরা পরিষদ নির্ধারণ করবে এবং সমাজের তথা গোটা জাতি গোষ্ঠী সেই নির্ধারিত নিয়ম-নীতি, ও সীমা-পরিসীমা এবং পরিধির আওতায় নিজেকে সোপর্দ করে তার জীবন পরিচালনা করবে। যাতে সমাজে কোনো ধরনের চিন্তা-ফাসাদ, অশৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়। আর সামাজিক মানবিক সঠিক স্বাধীনতার নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি এবং সীমা-পরিসীমা ও পরিধি শিক্ষা দিয়ে থাকে ইলমে ওহি ইসলাম। এজন্য পাশ্চাত্য সমাজই তাদের মানবিক, সামাজিক ও চারিত্রিক স্বাধীনতার সীমা-পরিসীমা-পরিধি এবং নিয়ম-নীতি নির্ধারণের জন্য ইলমে অহী তথা ইসলামের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী।

আর মুসলিম উম্মাহ ও জাতির চিন্তা-চেতনা ও গবেষণা-পর্যালোচনা সার্বক্ষণিক অবস্থায় সার্বিকভাবে ইলমে ওহির সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে সর্ব বিষয়ে তারা শক্তিশালী ছিল। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ ও জাতির চিন্তা-গবেষণার দুর্বলতা, পরাধীনতামূলক মনোভাব অন্ধ অনুকরণ এবং শূরাভিত্তিক মানবিক স্বাধীনতা অনুশীলনের স্থবিরতা ইত্যাদির কারণে, যুলুম নির্যাতনে পতিত হচ্ছে এবং দাসত্বের স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই মুসলিম উম্মাহকে এহেন পরিস্থিতিতে থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে তাকলিদ আর অন্ধ অনুকরণ পরিহার করে চিন্তা-গবেষণার উন্নতি সাধন করতে হবে। মানবিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবং পশ্চিমাদের প্রতিরোধের জন্য শুরা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ইসলাম তথা ইলমে ওহি প্রদত্ত স্বাধীনতার নিয়ম-নীতি, সীমা-পরিসীমা ও পরিধির যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে।

www.pathagar.com

রীতি-নীতি ও পদ্ধতির মৌলিক উপাদান : দায়িত্ববোধ, আত্মমর্যাদাবোধ ও অনুশীলন

তালিম তারবিয়াতমূলক নিয়ম-নীতি, পরিকল্পনা-পদ্ধতি ইত্যাদির মানে যুলুম নির্যাতন, বিশৃঙ্খলা আর অন্ধ অনুকরণ নয়। বরং তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার নিয়ম নীতি ও পরিকল্পনা-পদ্ধতির মানে হচ্ছে মানবজাতিকে বা মানব সন্তানকে প্রাথমিকভাবে নিজে নিজে ও গোটা সমাজকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায়ের অনুভূতি যোগ্যতা সদিচ্ছা জাগিয়ে তোলা, আত্মিক শক্তি ও মানবিক মর্যাদার স্পৃহা জাগ্রত করাও মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সঠিক পরিশোধনের এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষার প্রতি উৎসাহিত করা।

শিশুদের ক্ষেত্রে শিশু বিষয়ক নিয়ম-নীতি, আইন-শৃঙ্খলা পদ্ধতি, আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের মানে এ নয় যে, তাদেরকে ভয়-ভীতি জোর জবরদস্তি আর বাধ্যতামূলকভাবে দায়িত্ব আদায়ে অভ্যস্ত করা। বরং শিশুদের ক্ষেত্রে শিশু বিষয়ক নিয়ম-নীতি, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন পদ্ধতির মানে হচ্ছে তাদেরকে দায়িত্ব পালনে পর্যায়ক্রমে অভ্যস্থ করা। মানব ও মানবতার সেবার প্রতি ইতিবাচক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা। মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক-পরিধি এবং মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সঠিক পরিশোধনের অনুভূতি ও সঠিক অনুধাবন সৃষ্টি করা। সঠিক তারবিয়াতের মাধ্যমে সঠিক ও সৎভাবে সমাজে বসবাসে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা।

কিন্তু কোনো কোনো সময় শিশুদের ভয়-ভীতি এমন কি শারীরিক শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে। কারণ, অনেক শিশু তার সামাজিক পরিপার্শ্বিক অবস্থায় অনেক ধরনের অপরাধের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। এজন্য তাকে শিক্ষা এবং তারবিয়াত স্বরূপ সাময়িক ভয়ভীতি ও শারীরিক শাস্তি দিতে হয়। তবে শারীরিক শাস্তি বা ভীতি প্রদর্শনের যে পদ্ধতি, তা শুধুমাত্র বাবা মা বা শিশুর উপযুক্ত অভিভাবকগণ শিশুর আত্মিক, মানসিক ও দৈহিক অবস্থাসহ সর্বদিক বিবেচনায় রেখে প্রয়োগ করতে হবে, যে কেউ শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। কারণ, বাবা মা বা অভিভাবকগণই শিশুর প্রকৃত আত্মিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত। বাবা-মা ও অভিভাবকদের অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে যতটুকু সম্ভব হালকা ও অল্প শাস্তি প্রয়োগ করা। যাতে শিশুর শারীরিক আত্মিক ও মানসিক কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন না হয় এবং হিতে বিপরীত না হয়। বরং এ শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শিশু তার ভুল বুঝতে পেরে সে নিজেকে পরিশোধন করে একজন মানবিক মর্যাদা সমান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

এখানে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশুদের বেলায় যদিও অনেক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু শিশু যদি এমন অপরাধ করে ফেলে যা শারীরিক শাস্তি প্রদানের উপযুক্ত, তখন কিন্তু শিশুদেরকে

www.pathagar.com

ছাড় দেয়া যাবে না তাকে বড়দের মত শাস্তি প্রদান করতে হবে; শিশুদের সাধারণ অপরাধ ছাড়া অপরাধের বেলায় তাকে ছোট করে দেখা যাবে না। বরং তাকে যথাযথ শাস্তি প্রদানের অধিকার রয়েছে, বিশেষ আত্মিক ও মানবিক বিষয়াবলীতে। কারণ, বাল্য বয়সে আত্মিক বিয়গুলোর যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সঠিক দিক-নির্দেশনা মানবিক মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখনই তাকে শাস্তি প্রদান ছেড়ে দেবে, তখন সে চরিত্রহীন হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনকে বিনষ্ট করে ফেলতে পারে।

যদি শিশুদের অসাধারণ ও শারীরিক শাস্তি প্রদানের উপযুক্ত অপরাধগুলো ছোট করে দেখা হয় এবং তাকে প্রশ্রয় দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে সে শিশুটির মানবিক সম্মান মর্যাদা নষ্ট হবে, শিশু তার আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলবে। সে ভবিষ্যৎ জীবনে খারাপ, মিথ্যা, বক্রতা ও অপমানের পথে চলে যাবে। তার জীবনে দায়িত্ব পালনে উদাসীন হয়ে পড়বে, কুচিন্তা ও দুশ্চরিত্র হয়ে পড়বে। নেমে আসবে সামাজিক বিপর্যয়। এজন্য শিশুদের মানবিক মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা এবং গোটা সম্মান হেফাজত করা ও মানবিক বন্ধন অটুটু রাখার জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের মত শিশুদের ও শারীরিক শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে। শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব অর্পন করতে হবে তার বাবা-মা ও অভিভাকদরে প্রতি, তারাই নিয়ম-নীতি অনুযায়ী তার অবস্থা বোঝে শাস্তি প্রয়োগ করবে এবং তাকে আত্মিক ও মানসিকভাবে সঠিক ও পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে। কারণ, বীজ ভাল হলে গাছ ভাল হবে, আর গাছ ভাল হলে ফল ভাল হবে।

তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, শারীরিক শাস্তি প্রদান প্রকৃতপক্ষে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের কোনো উপকরণ নয়। বরং সেটি অপারেশনের ন্যায় চিকিৎসার মাধ্যম। শিশুদের খারাপ স্বভাব ও অপরাধের প্রবণতাকে দূরীভূত করার জন্য এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিশুদের তালিম তাবরিয়াত এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণের বেনার ভালবাসা, দয়া, মায়া, মমতা, ধর্ম উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে তাদের আত্মিক ও মানসিক গঠনের করার মাধ্যম ও উপকরণ।

বাবা, মা, অভিভাকদের ভালবাসা, স্বাধীনতা ও তার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে ভালভাবে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যার এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা রয়েছে সে অতি সহজে শিশুদের মন-মানসিকতা ও তার চাহিদা অনুভূতি অনুধাবন করতে পারে এবং সে আলোকে তালিম-তারবিয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-শিষ্টাচার প্রদান করতে পারে। উত্তম চরিত্রের বীজ তার মধ্যে বপন করে দিতে পারে। শারীরিক শাস্তি তথা ভয়ভীতি ও কঠোরতা ছাড়াই তাকে হাতে কলমে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও তালিম তারবিয়াতের মাধ্যমে একজন যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

www.pathagar.com

বাব-মা, অভিভাবকদেরকে তাদের সন্তান-সন্ততিদের বয়সের তারতম্য ও হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী তাদের স্বভাব, চরিত্র, ইচ্ছা চাহিদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকার প্রয়োজন। যাদের এ ধারণা রয়েছে, তারা অনায়াসে তাদের শিশুদের যোগ্যতা অনুযায়ী তালিম তারবিয়াতের ও শিক্ষা প্রশিক্ষণে এবং আদব-শিষ্টাচারের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাদের সন্তানদের বহন ক্ষমতা মেধা শক্তির বেশি তাদের উপর চাপিয়ে দেবেন না। তাদের অনুভূতি শক্তির বাহিরে কোন ধরনের আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ দেবেন না। তাদের আত্মিক ও মানসিক বা শারীরিক ক্ষতিকারক বা চাপ সৃষ্টিকারক কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তারা নেবেন না। কারণ, একটি প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে যে 'প্রতিটি মৌসুমের কিছু ফল রয়েছে আবার প্রতিটি ফলের মৌসুম রয়েছে। তাই তারা তাদের সন্তানদের অবস্থা বোঝে ব্যবস্থা নিবেন।

শিশুদের যোগ্যতা, মেধা ও অনুধাবন শক্তির বাইরে অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেয়া মানেই হচ্ছে আগুনে পানি দেয়ার ন্যায়। অর্থাৎ শিশুদের যোগ্যতার অতিরিক্ত তালিম-তায়বিয়াত ও প্রশিক্ষণ এবং কঠোরতার ফলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাদের আত্মিক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে।

সর্বোপরি বাবা-মা অভিভাবকদের ভালবাসা স্নেহ-মমতা শিশুদের জন্য সিক্তভূমি, সঠিক ভালবাসা ও স্নেহ মমতার মাধ্যমে অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। একে অন্যের প্রতি আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা, মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। শিশুদের হৃদয়ে তাদের বাবা-মা অভিভাবকদের প্রতি সম্মান মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নেয়। যার ফলে শিশুদের অন্তর চাষ-উপযুক্ত ও চারা রোপনের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে। মুরব্বী, বাবা-মা অভিভাককগণ অতি সহজেই তাদেরকে তালিম তারবিয়াত এবং শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও আদব শিষ্টাচারের মাধ্যমে একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

শিশুদের মৌলিক পরিবর্ধনের স্তরসমূহ এবং তার সাথে ব্যবহারের প্রকৃতি

বাবা-মা মুরব্বী এবং অভিভাবকদেরকে সর্বপ্রথমেই শিশুর আত্মিক মানসিক, শারীরিক এবং জৈবিক দিক ও গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করতে হবে। যাতে সার্বিক দিক বিবেচনা করে বয়স ও যোগ্যতা অনুযায়ী হাতে নাতে তার আত্মিক, মানসিক, জৈবিক এবং শারীরিক উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করতে পারে। তার উপরে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দিয়ে সঠিকভাবে নৈতিক মূল্যবোধের বীজ বপন করে দিতে পারে।

শিশুরা সাধারণত সাত বছর বয়স পর্যন্ত অনুকরণ ও অনুশীলন প্রিয় হয়ে থাকে। সে বড়দের আচরণ-অভ্যাস ইত্যাদি অনুসরণ করতে থাকে এবং নিজে নিজে করতে ও

www.pathagar.com

বলতে চেষ্টা করে। এজন্য শিশুদের এ সময়টাতেই বাবা-মা, অভিভাকদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও বারবার অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বয়সে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, বাবা-মা, অভিভাবকগণ এ সময়টাতে শিশুদের সাথে অত্যন্ত ধর্মীয়, গাম্ভীর্য, ভালবাসা ও বন্ধুত্বসূলভ ব্যবহার করতে হবে। যাতে শিশুটির হৃদয় কোনো ধরনের ভয়-ভীতি, সংকোচনতা, হীনমন্যতা ইত্যাদিতে শিকার না হয়ে নির্বিঘ্নে তার বাবা-মা ও অভিভাকদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারে এবং অনায়াসে সবকিছু বাবা-মা ও অভিভাবকদের কাছ থেকে অনুশীলন করতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যে, অভিভাকদের কাছ থেকে শিশু কোনো ধরনের বৈপরীত্ব আচরণ না পায়। এতে শিশু তার আস্থা ও বন্ধুত্ব হারিয়ে ফেলে। অতএব এ বয়সে শিশুদের অভ্যাস-আচরণ ও অন্যদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুদের দ্বিতীয় স্তরের বয়স শুরু হয় সাত বছর বয়স থেকে। এ বয়সেও সাধারণত শিশুরা মহব্বত ভালবাসা দয়া অনুগ্রহ প্রিয় হয়ে থাকে। তারা যেখানে মায়া মহব্বত ভালবাসা পায়, সেখানেই আশ্রয় নিতে চেষ্টা এবং এ বয়সে শিশুরা তার বাবা-মা, মুরাব্বী ও অভিভাবকদের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ইত্যাদি ছবির মত অনুসরণ করতে থাকে এবং শিখতে থাকে। এজন্য বাবা মা ও অভিভাবকগণকে আচার আচরণের প্রতি সদা-সতর্ক থাকতে হবে এবং শিশুদেরকে এ বয়সেই উত্তম চরিত্র ও সদ অভ্যাস গড়ে তোলায় চেষ্টা করতে হবে। ভাল, উত্তম ও ইতিবাচক কাজ কর্মে সহযোগিতার প্রতি তাকে উৎসাহিত করতে হবে। অন্যকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের তাকে উৎসাহিত করতে হবে। এ বয়সে শিশুদের সাথে এভাবেই আচরণ করতে হবে।

তারপর যখন দশ বছর বয়সে পৌঁছে যাবে তখন শুরু হয়ে তার তৃতীয় স্তরের বয়স। এ বয়সে সাধারণত শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি এবং আত্মিক ও মানসিক পরিপক্ষতার অগ্রগতি হতে থাকে। সে অনেক কিছু বাছ-বিচার বিবেচনা করে চলতে থাকে। এ বয়সে বাবা-মা ও অভিভাবকদের উচিত ও কর্তব্য হচ্ছে, শিশুর সামনে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য ও করণীয় বিষয়াবলী তুলে ধরা এবং সেগুলো পালনে ও আদায়ে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা। তার সামনে আত্মিক, মানবিক, মানসিক ও জৈবিক নানা বিষয়াবলী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিক তুলে ধরতে হবে। তাকে ক্ষতিকারক দিক থেকে বেঁচে থাকা, উপকারী বিষয়াবলী গ্রহণ করা এবং ভাল-মন্দ বিচার করে সঠিক পথে চলার দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এভাবেই এ বয়সে তার সাথে আচরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত প্রতিটি স্তরেই দেখা যায় যে শিশুদের সঠিক তালিম তারবিয়াতের ব্যাপারে দয়া-মায়া ও ভালবাসার বিষয়টি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটিই হচ্ছে তালিম তারবিয়াতের এবং শিশুকে ভাল কাজের অভ্যস্ত করার মূল ভিত্তি।

এরপর শিশু যখন বয়োসন্ধিক্ষণে পৌঁছে যাবে, তখন তার মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করে। আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক দিক দিয়েও এমন পরিবর্তন ও নতুনত্ব আসতে থাকে, যার সাথে সে নিজেকে সহজে খাপ খাওয়াতে অভ্যস্ত ছিল না। এ ধরনের পরিবর্তন ও এ ধরনের ব্যবস্থা, যা সে আগে কোনো সময় অনুভব করতে পারে নি, তার সাথে কি আচরণ করতে হবে তাও শিখে নি। এজন্য এ বয়সে অনেক শিশুই নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজে ও চিন্তা-চেতনায় লিপ্ত হয়ে যায়। আবার অনেকেই নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, নিজেকে লাজুক করে অভ্যস্থ করে নিতে পারে। এ বয়সে প্রতিটি শিশুই তার নিজে নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চেষ্টা করে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে ভালবাসে। তার নিজের ভাল-মন্দ, জ্ঞান-অর্জন, তার আত্মিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সে অনুভূতি লাভ করতে পারে। এজন্য বাবা মা ও অভিভাবকদের অবশ্যই তাদের দিকে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ভাল পরিবেশে মিশানোর চেষ্টা করতে হবে। তার নেতিবাচক প্রভাব দূর করে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করানোর চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুরা যৌবনে পা রাখে, তখন সে জীবন নামক সংগ্রাম পথে শক্তি ও সাহস নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। তার উপর চলে আসে নানা ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব, যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা, সাহাসিকতা আর আত্ম-নির্ভরশীলতার মাধ্যমে সে সকল দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আত্মিক মানসিক ও জৈবিক শক্তি অর্জন করে একজন যোগ্য মানুষ হতে চেষ্টা করে। ন্যায়-ইনসাফ আর বীরত্বের সাথে প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করে। এ হচ্ছে শিশুদের মৌলিক পরিবর্তনের স্থর এবং তার সাথে আচার-ব্যবহারের ধরন ও প্রকৃতিসমূহ।

অতএব শিশুদের সঠিকভাবে তালিম তারবিয়াত আর ইতিবাচক ভূমিকার মাধ্যমে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ের জন্য সার্বিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলাই প্রধান লক্ষ্য। এজন্য বাবা-মা, অভিভাবকদেরকে শিশুদের তথা যুবকদের প্রতি তাদের বয়স বৃদ্ধির স্তর অনুযায়ী সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে প্রতিটি যুবক সফলতার সাথে নিজেকে শক্তিশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে। বাবা মা এবং অভিভাকগণ যদি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারে, তাহলেই জাতির নতুন প্রজন্ম থেকে সংস্কার-পরিশোধন ও ভাল কিছুর আশা করা যাবে। রিসালতের দায়িত্ব

www.pathagar.com

আঞ্জাম দিতে পারবে। অন্যথায় জাতির নতুন প্রজন্ম থেকে ভাল কিছুর আশা করা যাবে না। তখন উম্মাহ ও জাতি তাদের শক্তি-সামর্থ্য, বীরত্ব, মর্যাদা, মূল্যবোধ হারিয়ে বিলীন হয়ে যাবে তাদের অস্তিত্ব।

একজন সফল অভিভাবকের গুণাবলী

কোনো মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে একজন সফল অভিভাবক হতে চায় তাহলে তাকে জ্ঞান, সম্মান, মর্যাদা, দয়া, অনুগ্রহ, ভালবাসা, ন্যায়-ইনসাফ, মিতব্যয়ী এবং ধর্ম ও সাহসিকতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। কারণ, এ গুণগুলিই হচ্ছে একটি মানবকে সঠিকভাবে তালিম তারবিয়াতের মাধ্যমে যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার মৌলিক হাতিয়ার। এ গুণাবলীর মাধ্যমেই এ পৃথিবীতে সে একজন খাঁটি মানুষ হিসেবে পরিণত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন; মানুষ হচ্ছে খনির ন্যায়, যারা জাহেলী যুগে ভাল ও উত্তম ছিল, তারা ইসলামের যুগেও ভাল ও উত্তম, যদি তারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে।

একটি মানব সন্তানকে সঠিকভাবে তালিম তারবিয়াত প্রদান এবং আত্মিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী করে গঠনের বিষয়টি মানুষের স্বভাব ও ফিতরাতের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে ইসলামের যুগ অথবা জাহিলিয়াতের যুগ বা তার পার্থক্য বড় বিষয় নয়। বরং একজন মানুষের ফিতরাত বা স্বভাব যদি খারাপ হয়ে থাকে তাহলে তাকে যতই ইসলামী জ্ঞান, ইলমে ফিকহ, ইত্যাদির মাধ্যমে গঠন করার চেষ্টা করা হোক না কেন, আমলের প্রতি তাকে ধাবিত করা যাবে না। আর যদি ফিতরাত ও স্বভাব ভাল হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অল্পের মাধ্যমেই আত্মিক ও মানসিকভাবে গঠন করা যাবে। ইলম অনুযায়ী আমলের প্রতি ধাবিত করা যাবে।

একজন সফল অভিভাবকের জন্য শিশুদের স্বভাব এবং তার বয়সের তারতম্য অনুযায়ী পরিবর্তন ও আচার-আচরণের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। তার সাথে কোন বয়সে কী ধরনের আচার-আচরণ এবং কোনো প্রকৃতির ভালবাসা ও তালিম তারবিয়াত প্রদান করতে হবে, সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। কারণ, কোনো কোনো সময় এ গুণাবলী না থাকা বা না জানার কারণেই একটি মানব সন্তানের জীবনে ধ্বংস আর অধঃপতন নেমে আসতে পারে। তাকে আত্মিক ও মানসিকভাবে শক্তি ও মজবুত করে গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পারে। এ বিষয়ে একটি প্রবাদ রয়েছে- 'মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রুই উত্তম' এ জন্য সে বিষয়ের প্রতি বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

www.pathagar.com

তেমনিভাবে একজন অভিভাবককে তার দায়িত্বে সফলতা অর্জনের জন্য অবশ্যই দয়া অনুগ্রহ, ধর্ম, ত্যাগ এবং সঠিক ভালবাসার গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ, এগুলো ছাড়া একজন অভিভাবক আস্থা অর্জন করতে পারে না। যার কারণে তাকে আত্মিক ও মানসিক যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

তেমনিভাবে একজন সফল অভিভাবকের মধ্যে ন্যায়বিচার, ইনসাফ আদালত ইত্যাদি গুণগুলো থাকা আবশ্যক। কারণ, এ গুণগুলোই হচ্ছে বাবা-মা ও অভিভাবকদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আস্থা অর্জনের মৌলিক হাতিয়ার এবং শিশুদের অবস্থা, চাহিদা, মনোভাব ইত্যাদি অনুধাবনের মাপকাঠি। শিশুরা ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তাদের বাবা বা অভিভাবকদের কাছ থেকে যদি সঠিক আদালত, ন্যায়-ইনসাফ এবং আলাদা ধরনের বিশেষত্ব না পায় ; তাহলে তারা বাবা-মা ও অভিভাবকদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রতি কর্ণপাত করে না। তাদের প্রতি তারা আস্থা অর্জন করতে পারে না। এ জন্য বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে শিশুদের প্রতি ইনসাফ আদালত ও ন্যায় বিচার করতে হবে। আর তা কথার মাধ্যমে নয়, প্রতিটি কাজের মাধ্যমে তাদের সামনে তা তুলে ধরতে হবে। কারণ, শিশুদের বড়দের কাজের প্রতি বেশি অনুকরণশীল হয়ে থাকে। তেমনিভাবে অভিভাবকদেরকে শিশুদের প্রতি সর্ববিষয়ে উত্তম ব্যবহার ও নম্র আচরণ করতে হবে। তাহলেই তাদের প্রতি শিশুর সঠিক আস্থা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা গড়ে উঠবে।

ধর্ম এবং তারবিয়াত এমন দু'টি গুণ, যা কখনো একটি আরেকটি থেকে আলাদা করা যায় না। দু'টি একই উৎস থেকে নির্গত। শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে এ দুটি গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ, শিশুরা তো ভুল ভ্রান্তি আর অপরাধ করবেই, এটিই হচ্ছে শিশুসুলভ অভ্যাস। এজন্য বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে ধৈর্য সহকারে ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তাদের তালিম ও তারবিয়াত প্রদান করতে হবে। তার সাথে সর্বাবস্থায় ইতিবাচক আচরণ করতে হবে। তাহলেই তাদের প্রতি ভালবাসা, দয়া, অনুগ্রহ ইত্যাদি ফলপ্রসূ হবে এবং সে ভাল গুণাবলী ও সদাভ্যাসে অভ্যস্থ হতে পারবে।

তেমনিভাবে প্রতিটি বাবা-মা বা অভিভাবককে তাদের সন্তান ও শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের পিছনে খরচ করার মানসিকতা থাকতে হবে। তাদের চাহিদা পূরণে অভ্যস্থ হতে হবে। অন্যথায় বাবা-মা ও অভিভাবকদের ভালবাসা, ধৈর্য, সম্মান-মর্যাদা ন্যায়-ইনসাফ আর আদালতের কোনো মূল্য থাকবে না। আর যদি এ দায়িত্বটি যথাযথভাবে আদায় করে, তাহলেই মানসিক যোগ্যতা অর্জন করে সে তার বাবা-মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত তৈরি করে নিতে পারবে। আর বাবা মা ও তার থেকে উত্তম ব্যবহার ও ভাল আচরণ পাওয়ার অধিকারী হতে পারবে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এর হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে :

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

হজরত মোয়াবিয়া ইবনে জাহিমা সালাফী (রা.) হতে হাদিস বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ এর খেদমতে আসলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি, এজন্য আপনার কাছে পরামর্শ করতে এসেছি। রাসূল ﷺ বললেন তোমার কি মা আছে? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ, রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন তুমি তোমার মায়ের সেবা যত্ন করতে তাকে। কেননা, তার পায়ের নিচে তোমার জান্নাত।

(সুনানে নাসায়ী)

রাসূল ﷺ এর আরেকটি হাদিস রয়েছে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রা.) বর্ণনা করেন।

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

"এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ বাবা-মায়ের মধ্যে কার হক আমার উপর বেশি? রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন তোমার মায়ের। তারপর লোকটি জিজ্ঞাসা করল– তারপর কার? রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন– তোমার মায়ের, লোকটি আবার জিজ্ঞাস করল, তারপর কার? রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, তোমার মায়ের। লোকটি আবার জিজ্ঞাস করল তারপর কার? রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন তোমার পিতার।"

(মুত্তাফাকুন আলাইহি)

একজন বাবা-মা; মুরব্বী, অভিভাবক এবং একজন শিক্ষককে অবশ্যই এ সকল গুণাবলী অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভালবাসা ধৈর্য, শ্রদ্ধা এবং শিশুদের প্রয়োজনে খরচ করার অভ্যাস ও মানসিকতা ইত্যাদি থাকতে হবে। কারণ, এ গুণাবলী সকল মানব সন্তানের শিক্ষক রাসূল ﷺ এর গুণাবলী ও সুন্নত। রাসূল ﷺ তার সন্তান, ছাত্র এবং

www.pathagar.com

পরিবারবর্গদেরকে এ সকল গুণাবলী ও আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা দিতেন। এজন্য শিশুদের শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাবা-মা তথা জাতির এ বিষয় ও গুণাবলীর প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত এবং তাদের প্রতি সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করাও কর্তব্য। তেমনিভাবে সন্তানদের লালন পালন ও তালিম তারবিয়াতের বেলায় মায়েদেরও এ সকল গুণাবলী ও আদর্শ থাকা উচিত এবং তাদের সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য। তাহলেই জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উত্তম গুণে গুণান্বিত এবং ভাল চরিত্রে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে। কারণ, যে জাতির মধ্যে তাদের শিক্ষক ও মায়েদের সম্মান মর্যাদার অবনতি সে জাতির সভ্যতা সংস্কৃতিতে অবনতি আর ধ্বংস নেমে আসে। সে জাতি তার আত্মিক ও মানসিক শক্তি সামর্থ হারিয়ে ফেলে। সমাজপরিবার পিতাসহ মাদরাসা, মক্তব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া কোনো কিছুর ভূমিকাই ফলপ্রসূ হবে না। তাদের আত্মিক ও মানসিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

এজন্যই রাসূল ﷺ হচ্ছেন পরিবার, ব্যক্তি, সমাজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, উপদেশ, বক্তব্য তথা গোটা মুসলিম উম্মাহ ও জাতি এবং সকল মানব সন্তানের জন্য উত্তম আদর্শ ও একমাত্র অনুসরণযোগ্য। গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ইমান-আখলাক, চরিত্র, শক্তি-সামর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য, নারী ও শিশু বিষয়ক রাসূল ﷺ এর শিক্ষা-বক্তব্য এবং দিক-নির্দেশনাগুলো পুনরায় প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করতে হবে

LATEST PUBLICATIONS OF

INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT (IIIT)

*	Shaikh Muhammad Al Ghazali - A Thematic commentary of the Qur'an (Vol-2)	450/-
*	Kutaiba S. Chaleby- Forensic Psychiatry in Islamic Jurisprudence	500/-
*	M. Umer Chapra- Islam And The Economic Challenge	800/-
*	Tahir Amin- National & Internationalism in Liberalism, Marxism & Islam	250/-
*	Dr. Taha Jabir Al-Alwani- Missing Dimensions in Contemporary Islamic Movements	150/-
*	Aisha B. Lemu- Laxity, Moderation & Extremism in Islam	150/-
*	Abdelwahab M. Almessiri- Feminism vs Women's Liberation Movements	150/-
*	Akbar S. Ahmed- Toward Islamic Anthropology	200/-
*	Ismail Raji Al-Faruqi- Islam & Other Faiths	1,000/-
*	Abdul Hamid A. AbuSulayman- Crisis in the Muslim Mind	400/-
*	Zahra Al Zeera- Wholeness & Holiness in Education	550/-

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলিম পরিবার আশার উৎস/আলো

ইসলামী শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সত্যবাদী মুমিন' 'রক্ষণশীল প্রতিনিধি' এবং 'দৃঢ়বিশ্বাসী' মানুষ তৈরি করা। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একমাত্র পরিতৃপ্ত ঈমানী শক্তি, প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীলতার অনুভূতি, হৃদয়ের সাহস, আমানত ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা, কাজের দক্ষতা এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই সম্ভব। আর সম্ভাবনাময় একজন মানুষ গঠন করতে হলে, এ সকল উন্নত গুণাবলীর বীজ মানব শিশুর মূল উৎস শিশু বয়সেই স্থাপন করতে হবে। এ জন্যই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্কই হচ্ছে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা 'নববী শিক্ষার কারিকুলামের মূল ভিত্তি। কারণ, পরিবারই শিশুর মানসিক ও বৈষয়িক বিকাশের সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। একটি মানব শিশু তার মানসিক ও বৈষয়িক যে কোনো ধরনের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তখন একমাত্র পরিবারই তার সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা ও ব্যবস্থা করে তাকে সুন্দরভাবে লালন পালনের যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এজন্যই পরিবার গঠন ও পরিবারের সুসম্পর্কই হচ্ছে মানবিক গঠন ও বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। যার উপর ভিত্তি করে মানবিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এজন্যই পবিত্র আর-কুরআন ও রাসূলের বাণী এবং মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলাম পরিবার এবং পরিবারের সুসম্পর্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে পরিবারকে প্রথম বীজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আমাদেরকে তাই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে হবে। যাতে সঠিকভাবে পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করে মুসলিম শিশুদেরকে যথাযথ তালিম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করে সঠিকভাবে লালন পালন করা যায়। তাদের থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির আগ্রাসনের শিকার, অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্ত-অনুকরণ, বিচ্যুতি এবং চিন্তার স্থবিরতা ইত্যাদি অপসারণ করা যায়। বিশেষ করে বর্তমান চ্যালেঞ্জের মুকাবেলায় মুসলিম জাতিকে যেন হেফাজত করা যায়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র আল-কুরআনে এরশাদ করেন :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে

www.pathagar.com

তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা আর-রূম : ২১)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً﴾

"যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর। এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

(সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ৭৪)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

www.pathagar.com

"যখন লোকমান উপদেশ হিসেবে তার পুত্রকে বললেন : হে বৎস, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরিক করা মহা অন্যায়। আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছর বয়সে। নির্দেশ দিয়েছি যে আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরিক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করো। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমার দিকেই এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে অবহিত করবো। হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর খণ্ডের গর্ভে অথবা আকাশে, অথবা ভূগর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ গোপন-ভেদ জানেন, সবকিছু খবর রাখেন। হে বৎস! নামাজ কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবুর কর। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ। অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।(সূরা লুকমান : ৩১/১৩-১৯)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদের বার্ধক্য বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাসকে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নামাজ কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমার পালনকর্তা! কবুল করুন আমাদের

www.pathagar.com

দোয়া। হে আমাদের পালনকর্তা আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে "।

(সূরা ইব্রাহীম : ১৪/৩৯ - ৪১)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣١) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

"স্মরণ করুন, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন : অনুগত হও। সে বলল আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম। এরই অসিয়ত করেছেন ইব্রাহিম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল-বাকারা : ২/১৩১ - ১৩২)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। যাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎ কাজ করি।

www.pathagar.com

আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতিদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে দেয়া হতো।

(সূরা আল-আহকাফ : ৪৬/১৫ - ১৬)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤)

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহ্ শব্দটিও বলো না। এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল : হে পালনকর্তা তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন।"

(সূরা আল-ইসরা : ১৭/২৩-২৪)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤) قَالُواْ تَاللّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٥) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (٨٦) يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧)

"এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : হায় আফসোস ইউসুফের জন্য। এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং

www.pathagar.com

অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। তারা বলতে লাগল : আল্লাহর কছম আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না, যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃত্যুবরণ না করেন। তিনি বললেন : আমি তো তোমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না। বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাস কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।"

(সূরা ইউসুফ : ১২/৮৪ - ৮৭)

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন : "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবান এবং তার পরিবারের প্রতি দয়াবান।" (মুসনাদে আহমদ)

রাসূল ﷺ আরও এরশাদ করেন; তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঐ ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে ভাল। আর আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। (ইবনে মাজাহ ও হাকেম)

ইমাম মুসলিম (রঃ) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূল ﷺ এর হাদিস বর্ণনা করেন;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه مسلم)

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন; চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে মেয়েদেরকে বিবাহ করা হয়। (১) তার ধন-সম্পদের কারণে ; (২) বংশ মর্যাদার কারণে; (৩) শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) ধার্মীকতার কারণে। অতএব তুমি ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও। তোমার দু'হাত ধূলি ধূসরিত হোক।[5]

ইমাম তিরমিজী (রঃ) রাসূল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন; যে রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন ঃ যখন/যদি তোমাদের নিকট এমন কোনো দীনদার, আমানতদার পাত্র বিয়ের

---

(৫) تَرِبَتْ يَدَاكَ দ্বারা রাসূলের দু'আ করা উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং আমানতদারিত্বে তোমরা সন্তুষ্ট থাক। তাহলে তার সাথে তোমরা বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তোমরা এমতাবস্থায় বিয়ে না দাও তাহলে জমিনে বড় ধরনের ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে।

ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম হাকিম (রা.) সকলেই রাসূল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন; যে রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন : তোমরা স্নেহময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী মেয়েদেরকে বিবাহ কর, যাতে আমি কিয়ামতের দিন অধিক উম্মতের মাধ্যমে গর্ব করতে পারি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রা.) হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেন : তিনি বলেন : যে আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব নেতাও দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষও তার পরিবারের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন নারীও তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব প্রত্যেকই দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

এ হচ্ছে ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব, একমাত্র পরিবারই হচ্ছে সঠিকভাবে মানব তৈরির কারখানা এবং মানব শিশুর সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। আর ইসলাম পরিবারকে এ ধরনের গুরুত্ব প্রদান– এটা আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। কারণ, মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। অপরদিকে এ সৃষ্টি জগতের প্রাণীকূলের মধ্যে একমাত্র মানব সন্তানের শিশুকাল সবচেয়ে দীর্ঘ সময়। এমনকি দু'দশকের চেয়েও বেশি সময় অতিক্রম করতে হয় শিশুকাল/বাল্যকাল পাড়ি দিতে। এ জন্যই শিশুকে তার বাল্য জীবনে মানসিক, শারীরিক আত্মিক তালিম-তারবিয়াত, সেবা-যত্ন পরামর্শ দিকনির্দেশনা ইত্যাদি দেয়ার প্রয়োজন হয়। খলিফা হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত ও প্রস্তুত করার জন্য। আর এ সকল প্রয়োজন একমাত্র পরিবারই দিয়ে থাকে। সুতরাং মানব শিশুর আত্মিক, শারীরিক, বৈষয়িক বিকাশ এবং সকল প্রকার উন্নতি, অগ্রগতি-অবনতি, ইতিবাচক হোক আর নেতিবাচক হোক সকল ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।

এ সকল কারণে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, কেন ইসলাম পরিবার ও পরিবার গঠন এতবেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছে? এবং পরিবার গঠনকে পৈত্রিক ও মাতৃক সুসম্পর্ক এবং মানুষের ফিৎরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে,

www.pathagar.com

পরিবারের ভীত মজবুত করা এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। আর এ জন্যই ইসলাম পরিবার গঠন, মানুষের ফিৎরাত, পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অধিকার ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

পরিবার গঠনে শরিয়তের রহস্য : ভিত্তি ও পদ্ধতি

পরিবার গঠনে ইসলামী শরিয়তের রহস্য ও তাৎপর্য ততক্ষণ পর্যন্ত অনুধাবন করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনে মানুষে স্বভাবসুলভ দিকগুলো সম্পর্কে এবং পরিবারের সকল সদস্যদের দায়িত্ব ও একে অপরের পরিপূরক ভূমিকা সম্পর্কে অনুধাবন করতে না পারবে। কারণ, মানুষ যখন এ সকল বিষয়ে অনুধাবন করতে পারবে তখন ইসলামী শরিয়তকে বুঝতে পারবে। আর যখন ইসলামী শরিয়তকে বুঝতে পারবে, তখন পরিবার গঠন সম্পর্কে ইসলামী শরিয়তের রহস্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে বুঝতে পারবে। এবং পরিবারের সকল সদস্যদের দায়িত্ব বুঝাও সহজ হবে।

অতএব পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে পরিবারের সকল সদস্যের পরিপূরকমূলক দায়িত্বের প্রতি খেয়াল রেখেই দায়িত্ব অর্পণ ও পরিবার পরিচালনা করা। এটিই হচ্ছে মানুষের পারিবারিক সদস্যদের মাঝে আত্মিক ও জৈবিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

সাধারণত মানুষের মধ্যকার এ সম্পর্ক এবং বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের মাঝে এ ধরনের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামী শরিয়তের দিক নির্দেশনাগুলো না বুঝার কারণে পরিবার গঠন ও পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে বুঝতে পারে না। যার কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ও সম্পর্কের বিষয়ে ভুল করে থাকে। তাঁরা মনে করে যে পরিবারের সকলের দায়িত্ব ও সম্পর্ক সমান ধরনের। ফলে তারা মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবকে অনুধাবন করতে ভুল করে। আর যখন স্বভাবকে অনুধাবন করতে ভুল করে, তখনই পরিবারের সদস্যদের মাঝে দায়িত্ব অর্পণে বিশৃঙ্খলা ও সীমালঙ্ঘন করে থাকে– যা শেষ পর্যন্ত পরিবারের মন্দ ডেকে নিয়ে আসে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে মানুষের ফিৎরাত সম্পর্কে অনুধাবন না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনের ব্যাপারে ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

আর পরিবারের সদস্যদের পরস্পর সম্মতি ও পরিপূরকমূলক ভূমিকা পরিবারের নারী-পুরুষ, বাবা-মা, ভাই-বোন, তথা সকল সদস্যের মাঝে ভালবাসা, দয়া, অনুগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে। আর যখনই পরিবার থেকে সম্মতি ও পরিপূরকমূলক ভূমিকা, ভালবাসা, দয়া অনুগ্রহ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়, তখনই বাবার সম্পর্ক মায়ের সাথে এবং ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক বাবার সাথে তথা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের একে অপরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে যায়। তখন সেই পরিবারের প্রতিটি সদস্য তার মানসিক, আর্থিক, জৈবিক, ও দৈহিক বিকাশে প্রয়োজনীয় তালিম-তারবিয়াত, সেবা-যত্ন, সহযোগিতা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়। একটি শিশুর মানবিক আত্মীক, জৈবিক ও দৈহিক বিকাশ এবং একটি আদর্শ পরিবার গঠন তখনই সম্ভব, যখন পরিবারের সকল সদস্য তার সাধ্যানুযায়ী দায়িত্ব আদায় করে বা আদায় করতে চেষ্টা করে।

পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক দুর্বলতা এবং সন্তানের সাথে নারীর বৈষয়িক ও আত্মিক আবেগ ও দয়াময় সম্পর্ক তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ, সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। অপর পক্ষে নারীর তুলনায় পুরুষের জৈবিক দুর্বলতা এবং নারীত্বের কামনা- বাসনা ও তাদের প্রতি দয়া- অনুগ্রহ ও ভালবাসার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগায়। এ জন্যই আল্লাহ নারীর হাতে জৈবিক প্রশান্তির লাগাম তুলে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের এ জৈবিক ও বৌদ্ধিক প্রশান্তির উপর পুরুষ সহজে প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং নারী তার ইচ্ছায় জৈবিক ও বৌদ্ধিক প্রশান্তির উপর অবিচল থাকতে পারে। সে তার এ অবিচলতা ততক্ষণ পর্যন্ত হারায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ তাকে দৈহিকভাবে স্পর্শ না করে বা দৈহিকভাবে স্পর্শ করার অনুমতি না দেয়। সুতরাং যখন একজন পুরষ নারীকে জৈবিক আবেগে স্পর্শ করে, তখন আর নারী তার জৈবিক ও বুদ্ধিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। অপরপক্ষে নারীর তুলনায় পুরুষের জৈবিক ও কাম-দুর্বলতার কারণে একজন নারীর দৃষ্টি বরং শুধুমাত্র কামনা-বাসনা ও চিন্তা-ধ্যান তাকে জৈবিকভাবে প্রভাবিত করে ফেলে। এমন কি অনেক সময় নারী তার বুদ্ধির মাধ্যমে একজন পুরুষকে তাঁর প্রতি দুর্বল করে ফেলতে পারে। যার ফলে পুরুষ স্বাভাবিকভাবে নারী ও সন্তানদের প্রতি দুর্বল, নম্র ও দয়াপরশ হয়ে পড়ে। এ সকল দিক বিবেচনায় নারী-পুরুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও তাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী শরিয়ত নারী-পুরুষের মাঝে বিবাহের ব্যবস্থা করেছে। সেই বিবাহের মাধ্যমে বা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের বংশ মর্যাদা ও রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে। এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুর মানবিক, দৈহিক ও আত্মিক বিকাশ ঘটে এবং নারী সন্তানদের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। এ জন্যই আল্লাহ পুরুষদেরকে নারী ও সন্তানদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও বহন করার ক্ষমতা দান করেছেন। এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, গড়ে উঠে পরিবার। সেই পরিবারই হয় সন্তানের শান্তি, নিরাপত্তা ও আশ্রয়স্থল। নিশ্চয়ই পুরুষকে নারীত্ব ও মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা এবং তাকে নারীর তুলনায় সাহসিক ও শক্তিশালী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তারা পারিবারিক

www.pathagar.com

প্রয়োজনে এবং নারী ও সন্তানদের প্রয়োজনে পূরণ এবং তাদের লালন পালন ও পরিচালনা করতে পারে। নারীদেরকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল, নম্র, কোমল ও আবেগময়ী করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে পরনির্ভরশীল দুর্বল শিশু ও আবেগময়ী পুরুষ তাদের কাছে শান্তি ও আশ্রয় নিতে পারে।

এ জন্যই পরিবারের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আর নারীদেরকে তাদের শক্তি সামর্থ ও ইচ্ছানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে কাজ-কর্ম করার নির্দেশ প্রদান করেছে। তার চেয়ে বেশি কিছু তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া বা বাধ্য করা, তাঁদের প্রতি যুলুম ও দুর্ব্যবহারের নামান্তর, যা শরিয়ত, মানুষের স্বভাব এবং নারী পুরুষের একে অন্যের পরিপূরকমূলক নীতির পরিপন্থি।

মানুষের স্বভাব এবং নারীকে দুর্বল ও পুরুষকে সবল করে সৃষ্টি ইত্যাদির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইসলামে নারী-পুরুষের সতরের[6] পার্থক্যের রহস্য অনুধাবন করা যায়। ইসলাম নারীর সতরের পরিমাণ বেশি এবং পুরুষের সতরের পরিমাণ কম বা স্বল্পভাবে নির্ধারণ করেছে।

এ ইসলাম নারীর প্রতি যুলুম করেনি বরং নারীকে হেফাযত করেছে এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের দিক বিবেচনা করে পারিবারিক বন্ধনের ব্যবস্থা করেছে।

ইসলাম পুরুষদেরকে সীমিত পরিমাণ সতরের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে তাদের কাজ-কর্মে সমস্যা বা ব্যাঘাত না ঘটে, তেমনিভাবে পুরুষের সতরের পরিমাণ কম থাকাতে নারীর প্রতি বা মাতৃত্বের প্রতি ফিৎনা যুলুম ও সীমা লঙ্ঘনের অবকাশ নেই বললেই চলে। কারণ, নারী স্বভাবগতভাবে জৈবিক বিষয়ে অধিক সংযমশীল। অপরদিকে পুরুষের তুলনায় নারীকে অধিক সতরের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যাতে পুরুষের যুলুম ও জৈবিক সীমালঙ্ঘন এবং ফিৎনা-ফাসাদ থেকে নারী ও মাতৃত্বকে হেফাজত করা যায়। তেমনিভাবে পুরুষদেরকেও হেফাযত করা যায়। কারণ, স্বভাবগতভাবে নারীর তুলনায় পুরুষ জৈবিক বিষয়ে অধিক দুর্বল এবং আবেগপ্রবণ। এমনকি নারীর অঙ্গ-প্রতঙ্গের দৃষ্টি পর্যন্ত পুরুষকে আকৃষ্ট ও দুর্বল করে ফেলতে পারে। এ জন্যই ইসলামী শরিয়ত নারী-পুরুষের এ ধরনের সতরের বিধান দিয়েছে। এটিই হচ্ছে ইসলামী শরিয়তের নারী-পুরুষের সতরের ব্যবধানের রহস্য।

---

(৬) শরিয়ত নির্ধারিত পুরুষ, মহিলার শরীরের যে সমস্ত অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখা ফরয তাকে সতর বলে।

www.pathagar.com

এ জন্যই ইসলামী শরিয়ত বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত নারীকে বিশেষভাবে দেখার অনুমতি দিয়েছে, তাতেও ইসলামী শরিয়তের হেকমত রয়েছে। তেমনিভাবে ইসলামী শরিয়ত নারীকে একসাথে একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিষেধ করেছে। কারণ, নারীকে এক সাথে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হলেও মানুষের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয় থাকবে না। কারণ, একজন নারী একটি মাত্র পুরুষের বীজ বহন করতে পারে। নারী একবারেই গর্ভবতী হয়ে থাকে, সকলের বীজের মাধ্যমে নয়। তাই ধ্বংস হয়ে যাবে পরিবার এবং বিবাহের ফলাফল। এজন্যই ইসলামী শরিয়ত নারীকে একসাথে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয় নি।

অপরপক্ষে ইসলামী শরিয়ত পুরুষদেরকে শর্তসাপেক্ষে একসাথে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের যদি জৈবিক ও আর্থিক সামর্থ থাকে এবং একাধিক স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে প্রয়োজন অনুসারে একাধিক বিয়ে করতে পারে। কারণ, এতে বিবাহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে কোন ধরনের সমস্যা হয় না। সন্তানের পিতৃপরিচয় ও বংশ মর্যাদা বহাল থাকে। পরিবারও ধ্বংস হয় না বরং একাধিক পরিবার হতে পারে। কিন্তু তার পরেও ইসলামী শরিয়ত পুরুষদেরকে অপ্রয়োজনে একসাথে একাধিক বিয়ে করার অনুমোদন দেয় নি। কারণ, বিনা প্রয়োজনে একাধিক বিয়ের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মাঝে এবং স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের ভালবাসা, সহমর্মিতা, দয়া, অনুগ্রহ ইত্যাদি হ্রাস পায়। একে অন্যে হিংসা বিদ্বেষের মাধ্যমে স্বামী কর্তৃত্বে আঘাত হানে, পরিবার ভেঙ্গে যায়। এমনকি পরিবারের সদস্যদের মাঝে আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এজন্য ইসলামী শরিয়ত অপ্রয়োজনে পুরুষদেরকেও একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয় নি। অতএব ইসলামী শরিয়তের এ সিস্টেমের ভিত্তিতে, দয়া-ভালবাসা-সহমর্মিতার উপর একটি আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠে। জাগ্রত হয় একে অন্যের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব। তখন স্বামী তার স্ত্রীকে এমন কোনো কাজে বাধ্য করতে পারে না বা তার উপর এমন কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে না, যা তার ইচ্ছা ও সাধ্যের বাইরে। তেমনিভাবে স্ত্রীও তার স্বামীকে এমন কোনো কাজে বাধ্য বা তার উপর চাপিয়ে দিতে পারে না, যা তার ইচ্ছা ও সাধ্যের বাইরে। আর এতেই রয়েছে পরিবারের শান্তি। যদি স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে মেনে নিতে না পারে, তাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি, মনোমালিন্যতা ভুল বোঝাবোঝি লেগেই থাকে। তখন তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে অটল থাকতে বাধ্য করা যাবে না। বরং ইসলামী শরিয়ত স্বামীকে তালাক[7] প্রদানের অনুমতি আর স্ত্রীকে খুলা[8]

[7] তালাক হচ্ছে ইসলামী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাহ বিচ্ছেদকারী শব্দ।

www.pathagar.com

এর মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেছে। কারণ, এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে বিবাহ বহাল রাখা তাদের জন্য এবং বিশেষ করে সন্তানের জন্য বিচ্ছেদের চেয়েও অধিক ক্ষতিকারক।

এজন্যই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর এ বিষয়াবলীকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে, কুরআনে তার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে এবং স্বামী-স্ত্রীকে তাদের দায়িত্ব, অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে সতর্ক ও নসিহত করেছে। ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়কে তাদের নিজ সত্ত্বা ও তাদের ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তি নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার ও খরচ করার অধিকার দিয়েছে। এতে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের উপর বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন বা অন্য কোন ধরনের প্রতারণামূলক আশ্রয় না নিয়ে তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও একে অন্যের পরিপূরক ও সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে সুখী সুন্দর পরিবার গঠন ও জীবন পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যতা হয়েই যায়, তাহলে ইসলাম তাদেরকে সৎ ও সঠিক পন্থায় যে কোনো মাধ্যমেই হোক মীমাংসার নির্দেশ দিয়েছে। যাতে বিচ্ছেদের মাধ্যমে একটি পরিবার ধ্বংস না হয় এবং সন্তান সন্ততি বিপদে না পড়ে। কিন্তু তার পরেও যদি তাদের মধ্যে সমঝোতা ও মীমাংসা সম্ভব না হয়, তখন ইসলাম স্বামীকে তালাকের মাধ্যমে আর স্ত্রীকে 'খুলা'র মাধ্যমে বিচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে। এতে তাদের উভয়েরই ক্ষতি রয়েছে, তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রদত্ত মহর হারাবে এবং আরেকটি সংসার গড়তে অতিরিক্ত বোঝা-সহ নতুন করে ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আর খুলার ক্ষেত্রে স্ত্রী তার প্রাপ্য সম্পদ হারালো। এ জন্যই ইসলামী শরিয়ত খুলার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীকে মহর হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন তাতেই খু'লা করার নির্দেশ দিয়েছে। এ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সংসার ও তাদের বিচ্ছেদের বিষয়ে ইসলামী শরিয়তের দিক নির্দেশনা।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারই হচ্ছে সমাজের মূল ভিত্তি। মানুষকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিবারই তার প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেয়। ইসলামী শরিয়ত পরিবারের সকল সদস্যের দিক ও প্রয়োজন বিবেচনা করে পরিবারের জন্য কিছু বিধি বিধান ও নিয়ম নীতি দিয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে দয়া-অনুগ্রহ-সহমর্মিতার ভিত্তিতে একটি আদর্শ পরিবার গড়ে উঠে।

[8] খুলা হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ স্বামীকে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে স্ত্রী নিজেকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে নেয়া।

www.pathagar.com

সমাজ ও পরিবারের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির ভূমিকা

মানুষ যেমন পরিবারের সদস্য তেমনি সমাজেরও সদস্য। মানুষের রয়েছে পারিবারিক দায়িত্ব এবং সামাজিক দায়িত্ব। এ পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বের মিশ্রণ এবং বৈপরিত্যও রয়েছে, যা অনেক সময় ভুল বোঝাবোঝি ও সীমালঙ্ঘনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং পরিবারে পিতার যেমন একটি অবস্থান রয়েছে তেমনি রয়েছে মায়ের ও ছেলে মেয়েদের, তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে পারিবারিক আলাদা ও ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব ও ভূমিকা, যা তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও ভূমিকার সাথে মিলে না।

অতএব, পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে বাবার সম্পর্ক হচ্ছে আত্মিক সম্পর্ক, সম্মান মর্যাদা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক, তেমনিভাবে পরিবারে, মা মেয়ে, ভাই-বোন ইত্যাদির সম্পর্ক যা সামাজিক সম্পর্কের সাথে মিলবে না। কারণ, সামাজিকভাবে অনেক সময় বাবার চেয়ে ছেলের অবস্থান মায়ের চেয়ে মেয়ের অবস্থান স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর অবস্থান অনেক উন্নত ও উর্ধ্বে হতে পারে তাদের প্রত্যেকের বিবেক বুদ্ধি সামর্থ ইত্যাদি অনুযায়ী। তাদের এ সামাজিক ও পরিবারিক দায়িত্ব ও ভূমিকার মিশ্রণ ও বৈপরিত্ব কোনো কোনো সময় পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভুল বোঝাবোঝি, মনোমালিন্য অনধিকার চর্চা সীমালঙ্ঘন ও পারিবারিক দুর্বলতা ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে।

পুরুষ হচ্ছে পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারের ছেলে-মেয়ের বংশ পরিচয় তার সঙ্গে সম্পর্কিত সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীকে পরিচালনা করা, তাদের যথাযথ শান্তি নিরাপত্তা, উন্নতি অগ্রগতি ইত্যাদি নিশ্চিত করা, এমনকি পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কের মাধ্যম হচ্ছে স্বামী। কারণ, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি তাদের নিরাপত্তা, শান্তি, উন্নতি, অগ্রগতি ইত্যাদি নির্ভর করে পরিবারের পুরুষ বা স্বামীর উপর। আর এ সব কিছুর উপর নির্ভর করে পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। তাই ব্যক্তি ও সমাজকে গঠন করতে হলে পরিবারকে গঠন করতে হবে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, সাধারণতঃ পুরুষ এবং মহিলা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের লোক। পুরুষ হচ্ছে একক স্বভাবের লোক আর নারী হচ্ছে দ্বিত্ব স্বভাবের লোক। পুরুষের রয়েছে শুধুমাত্র কাজের ক্ষমতা। আর নারীর রয়েছে কাজ ও সন্তান প্রসবের ক্ষমতা। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী সন্তান প্রসব এবং তার লালন পালনের অর্থাৎ মাতৃত্বের যোগ্যতা নিয়েই জীবন-যাপন করে। সন্তান প্রসবে এবং আদর-যত্ন, লালন-পালনে নারী ও মাতৃত্বের বিকল্প নেই। এজন্যই একটি সন্তানকে যথাযথভাবে লালন-পালন করতে হলে, নারী ও মাতৃত্বকে

www.pathagar.com

অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। তাই একজন মা বা নারীকেও তার আত্মিক, মানসিক, বৈষয়িক সবকিছু উজাড় করে সন্তান লালন-পালন করতে হবে। এজন্যই নারীকে পুরুষের থেকে আলাদা করা যাবে না। নারীকে পুরুষ থেকে আলাদা করা বা দূরে রাখার মানেই হচ্ছে নারীর উপর এবং সন্তান সন্ততির উপর মানসিক ও বৈষয়িকভাবে যুলুম করা। সুতরাং নারীকে পুরুষেরই কর্তৃত্বাধীন ও ছত্র-ছায়ায় রাখতে হবে।

অপর দিকে পুরুষ হচ্ছে শুধুমাত্র কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন একক স্বভাবের অধিকারী। পুরুষের মধ্যে সন্তান গর্ভধারণের ক্ষমতা নেই। এজন্য পুরুষকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে যোগ্যতা-সম্পন্ন ও শক্তিশালী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী তার যথাযথ চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করে তালিম তারবিয়াতের আদর যত্ন ও লালন পালনের মাধ্যমে একটি সন্তানকে তার প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত পৌছাতে পারে। তারই মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বামীকে বা পুরুষকে সহযোগিতা করতে হবে। এটিই হচ্ছে একটি পরিবারের আমল ও মূল কথা এবং স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের মৌলিক দায়িত্ব।

এ জন্যই পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের ভূমিকার মধ্যে কোন ধরনের বৈপরিত্য, দ্বন্দ্বের প্রাধান্য সৃষ্টি করার কোনো অবকাশ নেই, প্রত্যেকের একটি সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা রয়েছে এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে গণ্য। তাই পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে একজন নারীর প্রথম দায়িত্ব ও ভূমিকা মা ও মাতৃত্বের ভূমিকা পালন, যা পরিবার ও সমাজের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ একজন নারী মা হিসেবেই তার সন্তান সন্ততিকে হাজার কষ্টের পরও সারা রাতের আরামের ঘুম হারাম করে সর্বাধিক আদর সোহাগ আর স্নেহ মমতার ভিতর দিয়ে লালন পালন করেন, যা একজন পুরুষ কখনও করতে পারে না। এটিই হচ্ছে একজন নারী ও পরিবারের কাছ থেকে সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী শরিয়ত সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। সুতরাং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের বিরোধিতা সমাজের যে কেউ করুক না কেন সে ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঠিক ফিতরাত/স্বভাব থেকে দূরে সরে যাবে এবং ইসলামী শরিয়তের বিরোধিতা করবে। এটা সে পাশ্চাত্য প্ররোচনায় করুক আর মুসলিম অন্ধ অনুকরণে করুক, সমান কথা। যে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের প্ররোচনায় আজ নারী সমাজকে দেহ-ব্যবসা আর যৌনাচারে লিপ্ত করে তাদের ভোগের পাত্র আর খেলনার উপকরণে পরিণত করেছে। তেমনিভাবে কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের অন্ধ অনুকরণ আর অন্ধ বিশ্বাসের কারণে নারীদেরকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা, যথাযথভাবে

www.pathagar.com

সন্তান লালন-পালন, স্বামীর সেবা ও তাকে সহযোগিতা এবং জাতি ও সমাজের সেবামূলক শিক্ষা দীক্ষা ও চিন্তা-চেতনা থেকে বঞ্চিত করে অজ্ঞতা, মুর্খতা, সংকীর্ণতার বন্দিশালায় আবদ্ধ করে রেখেছে। অথচ আধুনিক বিশ্বে দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় এবং নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য, প্রযুক্তিগত উপকরণ তৈরি করা হয়েছে যাতে সে নিজেকে পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও সমাজ সেবার জন্য প্রস্তুত করে নিতে পারে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে মুসলিম নারীদেরকে তুলনামূলকভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। এমনকি হিন্দু নারীদের থেকেও মুসলিম নারীদেরকে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে। অথচ ইসলাম নারীদেরকে যে অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে হিন্দু ধর্মে তার কিঞ্চিতও দেয় নি, তারপরেও হিন্দু নারীরা সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, অথচ একজন মুসলিম নারীকে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয় নি। যার ফলে মুসলিম সন্তানদের তালিম তারবিয়াত ও সুশিক্ষা এবং ইসলামের সামাজিক কর্মকাণ্ডে দুর্বলতা চলে আসছে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ আল- গাযযালী (রা.) এর গ্রাম্য ও বাল্য জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী থেকে আমার শোনা একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। তিনি কীভাবে গ্রামের সর্বস্তরে নারীদেরকে দেখতে পান, কিন্তু দেখতে পান না একমাত্র মসজিদে। সে প্রসঙ্গেই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

'আমার অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে যখন আমি দেখি যে, বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশ-সমূহে মুসলমানদের মসজিদগুলোতে নারীদের জন্য নামাজের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। আর কোন মতে ব্যবস্থা থাকলেও তা পর্দার আড়ালে পিছনের কাতারে এমনভাবে ব্যবস্থা করা যে, একজন মহিলার এ অবস্থায় সেখানে নামাজ পড়াটাও কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। অথচ তারা মসজিদে নামাজে গেলে অধিক পর্দা অবলম্বন ও অত্যন্ত আদরের সাথে যায়। এমনকি মসজিদে অন্যান্য সকল মুসল্লিও পাকসাফ হয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হয়ে মসজিদে নামাজ পড়তে যায়। তারপরেও কোন্ জিনিসটি নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করে? বা মসজিদে উপস্থিত হলেও কোন্ বিষয়টি নারীদেরকে সর্বশেষ কাতারে পর্দার আড়ালে সংকুচিত স্থানে নামাজ আদায় করতে বলে? অথচ মুসলমানদের 'ইবাদতের স্থান মসজিদ থেকে বের হলেই হাট বাজার রাস্তা ঘাটে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্দ্বিধায় সব ধরনের কাজ করছে!! সেখানে কি তাদের মানসিক কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় না? আসে না তাদের মনে কোন ধরনের কুমন্ত্রণা? আসে শুধু পূত পবিত্র স্থান মসজিদে আল্লাহর ইবাদতের কাজে!!

www.pathagar.com

আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, অধিকাংশ মুসলিম দেশে মুসলমানদের মসজিদসমূহে জুমু'আর নামাজ ও তার খুৎবায় পর্যন্ত মুসলিম নারীদের উপস্থিত হতে দেখা যায় না এবং তাদের জন্য মসজিদে উপস্থিত হবার বা নামাজের কোন ব্যবস্থাও করা হয় না। এতে মনে হয়, যেন আল্লাহর নির্দেশ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য এসেছে, নারীদের বেলায় কিছুই আসে নি, ইসলাম নারীদেরকে সামাজিক অধিকার দেয় নি। সামাজিক দায়-দায়িত্ব বলতে নারীদের কোন ধরনের ভূমিকাই নেই এবং নারীদের সামাজিক কোন মর্যাদাই নেই। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম নারীদের সম্পর্কে এ সকল সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে নারীদের বেলায় ইসলামিক নির্দেশের ভুল বোঝাবুঝি। অর্থাৎ ইসলাম নারীদের পারিবারিক দায়-দায়িত্ব, সন্তান লালন-পালন, দেখা-শোনায়, স্তন্যদানে ও মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনে জুমআ ও জামাতে উপস্থিত না হবার অনুমতি প্রদান করেছিল। যাতে একজন মায়ের জামাতে বা জুমু'আর নামাজে উপস্থিতির কারণে তার দুধের শিশু ছটপট ও কষ্ট না করে। বিশেষ করে রাতের নামাজ এশা ও ফজরের নামাজে নারীদের মসজিদে জামাতে উপস্থিত না হওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেছে। যাতে তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনে কোন ধরনের সমস্যা না হয়। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব এবং সন্তান লালন-পালন ইত্যাদি কারণ ছাড়া নারীদেরকে মসজিদে নামাজের জামাতে উপস্থিত হতে এবং জুম'আর নামাজ ও খুতবাতে উপস্থিত হতে নিষেধ ও বাধা প্রদান করে নি। কারণ, পুরষ যেমন সমাজের অংশ, নারীও তেমন সমাজের অংশ। পুরুষের যেমন ধর্মীয় দায়িত্ব পালন আবশ্যকীয়, নারীরও তেমন আবশ্যকীয়। এতে ধর্মীয় ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে নারী-পুরুষ উভেয়রই মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য ও প্রাধান্যের কোন কারণ নেই। কিন্তু ইসলামের সেই নির্দেশকে ভুল বুঝার কারণে নারীদেরকে মসজিদ, জামাত, জুম'আ, খুৎবা ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা হচ্ছে ও নিষেধ করা হচ্ছে। অথচ ইসলামের নির্দেশ ছিল তাদের প্রতি সহনশীলতার জন্য। ইসলাম কখনো তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে নি। (রাসূলের বাণী) "তোমরা নারীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে বাধা প্রদান কর না।"

বর্তমান মুসলিম সামাজিক বিধানে মাতৃত্ব ও তার কার্যাবলী

বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা বিশ্বের সামনে মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, আমাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ তথা ইসলামী শরিয়ত এবং তাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ ও তাদের শরিয়ত সম্পর্কে কোন ধরনের জ্ঞান অর্জন না করে এবং কোন ধরনের বাছ বিচার ও যাচাই বাছাই ছাড়াই পদাংক অনুসরণ করা।

www.pathagar.com

বিশেষ করে নারীদের বেলায় আমরা নির্দ্বিধায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের অনুসরণ করছি, অথচ আমাদের শরিয়ত ও তাদের শরিয়তে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। মুসলিম ও ইসলামী শরিয়ত কোন সময় ও এমন কোন কাজ সমর্থন করতে পারে না, যে কাজে পারিবারিক বন্ধনে ভাঙ্গন বা বিভেদ সৃষ্টি করে, অথবা নারীর ইজ্জত সম্মানে আঘাত হানে অথবা নারীর মাতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা বিপদকে টেনে আনে।

পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের বেলায় যে সমস্ত আচরণ করা হচ্ছে এবং পুরুষের মত করে বিনা বাধায় বিনা শর্তে নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে বের করে দেখা হচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় পরিবারকে ভাঙ্গন ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং নারীদের ইজ্জত সম্মান ও সম্ভ্রমের উপর আঘাত হেনে তাদের ব্যভিচার ও দেহ-ব্যবসার প্রতি অনুপ্রাণিত করছে।

সমাজে নারী এবং পুরুষ এক নয় এবং এক হতেও পারে না। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা স্বভাব, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজন। নারী-পুরুষ সমাজের একে অন্যের পরিপূরক। তেমনিভাবে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যও এক নয়। এক মনে করাও ঠিক নয়। বরং উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে পিতৃত্বের ভূমিকা পালন করা, পরিবারের, স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-সন্তান ও অন্য সদস্যদের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আর নারী বা মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা, সন্তান লালন-পালন ও যথাযথ শান্তি, নিরাপত্তা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা। অতএব নারী পুরুষের দায়িত্ব এক মনে করার মানেই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এজন্য ইসলামী শরিয়ত ও মুসলিম সমাজে নারী এবং পুরুষের ভূমিকা নিয়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবী গবেষক ও চিন্তাবিদগণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে কীভাবে উত্তম পন্থায় নারী ও পুরুষের সর্বোচ্চ শক্তি ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে ইসলামী শরিয়তের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যায় এবং সুশৃঙ্খলভাবে মুসলিম উম্মাহ ও সমাজের খেদমত করা যায়।

এর কারণেই মা ও মাতৃত্ব এবং পরিবারকে গুরত্ব দেয়া হচ্ছে এবং দিতে হবে। তাদেরকে সকল ধরনের বিচ্ছেদ, ভাঙ্গন এবং বিভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও প্রভাবমুক্ত করে সামাজিক উন্নয়নের জন্য মা ও পরিবারকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে আলাদা ও ভিন্ন।

এ জন্যই আমাদের উচিত এবং কর্তব্য হচ্ছে নারী এবং পুরুষ উভয়ই সমাজের অংশীদার হিসেবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্মসংস্থান ও উপার্জনের যথাযথ ব্যবস্থা করা। যাতে সঠিকভাবে আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা যায়।

www.pathagar.com

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সামর্থ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নারী পুরুষ এবং সমাজের সকল সদস্যের জন্য সহজ এবং সুশৃঙ্খলভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

নারীর বেলায় মা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন ও সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন হিসেবে মনে করা হয়। তাদের সে দায়িত্ব পালনের যথার্থ ব্যবস্থা করা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

নারী তার মাতৃত্বসুলভ দায়িত্ব পালনে এবং সন্তান-সন্ততির যথাযথ লালন পালন, আরাম-আয়েশ এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনে তার ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা, মাতৃত্বের সংরক্ষণ ও হেফাজত করার জন্য মানসিক-আত্মিক ও বৈষয়িকভাবে সমাজের ও পুরুষের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

অতএব আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে এবং সামাজিক সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থান তৈরির বেলায় এদিকগুলো বিবেচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মুসলিম সমাজে নারীদের যথেষ্ট কর্মসংস্থান রয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান দেয়া যেতে পারে। যেমন : কিন্ডারগার্টেন, নার্সারী, প্লে-গ্রুপ এবং ইবতেদায়ী ও প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পেশায় নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। কারণ, একজন নারী স্বভাবগতভাবে বাচ্চা ও শিশুদের পাঠদানে অধিক উপযুক্ত ও অধিক সামর্থবান। এ ধরনের কাজ নারীদেরকে তাদের অন্যান্য দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদানও করে না।

এজন্য অনেক নারীই নিজেকে তাদের কাজের কিছু সময় বা অর্ধেক সময় স্বল্প মজুরীতে/বেতনে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ, শিক্ষকতা এমন একটি পেশা বা নারীদেরকে তাদের কাজে ও দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করে না। বরং নারীদের মাতৃত্ব ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করে। এমনকি সমাজে এমন কিছু নারী রয়েছে, যারা পারিবারিক ও মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাদের এ ধরনের পেশা আরো অধিক উপযোগী। কিন্তু তারপরও কোন মুসলিম বিশ্ব তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ধরনের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে না। তারা এ ধরনের শিক্ষতার পেশাকে শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে রুটিন অনুযায়ী ভাগাভাগী করে খুব সহজেই কাজে লাগাতে পারতো। এমনকি এ ধরনের অন্যান্য যথেষ্ট পরিমাণ কর্মস্থল রয়েছে, যেগুলো সিস্টেম অনুযায়ী নারী-পুরুষের মধ্যে ভাগাভাগি করে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারত।

www.pathagar.com

সাধারণত ২০ (বিশ) বছর বয়সেই একজন নারী তার শিক্ষা জীবনের অনার্স, মাস্টার্স, বা ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করতে সক্ষম হয় বা শেষের পর্যায়ে চলে যায়। তেমিনভাবে এই বয়সেই একজন নারী তার মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনে এবং সুস্থ সবল সন্তান ভূমিষ্ট ও তার যথাযথ লালন-পালনের ব্যবস্থা গ্রহণে শরীরিক ও মানসিকভাবে সর্বাধিক উপযুক্ত হয়ে থাকে।

এজন্য নারীদেরকে এ বয়স থেকে অন্তত চল্লিশ-পয়তাল্লিশ বছর পর্যন্তমাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রাখা উচিত ও কর্তব্য। যাতে অন্তত তাদের শেষ সন্তানটি পর্যন্ত মায়ের লালন-পালন আদর যত্ন ও তালিম- তারবিয়াতের ভেতর দিয়ে আত্মিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

এরপর যখন একজন নারী তার মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনের ভেতর দিয়ে তালিম-তারবিয়াত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মোটামোটি অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলবে। তখন তাকে চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ বছর বয়সের পরে সামাজিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করতে হবে। তখন থেকে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত তাকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রাখা উচিত। কারণ, নারীদের সাধারণত পয়তাল্লিশ বছর বয়সে জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী হরমোন জনিত কারণে স্বভাবগতভাবে নারীর মাসিক চক্র বন্ধ হয়ে যায়। নারী তার সন্তান ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন হরমোনজনিত কারণে পুরুষের তুলনায় নারী অধিক সবল ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। তেমনিভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর আয়ুষ্কাল বা বয়স পুরুষের তুলনায় দীর্ঘ হয়ে থাকে। এজন্য নারীকে ৬৫-৭০ বছর বয়স পর্যন্ত সামাজিক কাজে বা পেশাগত কাজে নিয়োজিত রাখা উচিত।

কিন্তু আমরা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার আলোকে নারীদেরকে তাদের ফুটন্ত যৌবনে মাতৃত্বের ভূমিকা থেকে দূরে সরিয়ে সামাজিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে নিয়ে আসি। আবার যখন মাতৃত্বের বয়স শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের সামাজিক আর্থিক দায়িত্ব পালনের দরজা বন্ধ করে দেই অর্থাৎ তাদের অবসর জীবনে চলে যেতে হয়। এভাবে পশ্চিমাদের অনুসরণে আমরা নারীদের মান-সম্মান ভুলুণ্ঠিত করে মাতৃত্বের অপমানি করছি।

অথচ আমাদের অবশ্যই উচিত ও কর্তব্য ছিল যে, নারীদের জন্য তাদের সঠিক বয়সে সম্পূর্ণ আলাদা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কারণ, এতে একদিকে যেমন নারীদের জন্য আলাদা কর্মস্থল ও কাজের সেক্টর এবং ব্যবস্থা করাও সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি নারীরা

www.pathagar.com

ছলে-বলে হোক আর কৌশলে হোক অথবা জোরপূর্বক হোক কোন পরপুরুষের কাছে দুর্বলতার শিকার হয়ে মাথা নত না করে নিজেরাই আত্মিক, মানসিক ও মানবিক মূল্যবোধ ও ভারসাম্য রক্ষা করে দেশ ও জাতির সেবা করতে পারে। যদি নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা কর্মস্থলের ব্যবস্থা না করে যৌথ কর্মস্থলের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সেখানে হয়তো জৈবিক দুর্বলতার কারণে না হয় বস বা মালিককে খুশি করার কারণে অথবা নিজের ক্যারিয়ার গঠন ও পদোন্নতিসহ নানা কারণে জৈবিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। ভেঙ্গে যাবে পরিবারিক সম্পর্ক ও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন। যার বাস্তব চিত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। কারণ, স্বভাবগতভাবে নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি দুর্বল। তারপর একই স্থলে দীর্ঘ দিনের জন্য ব্যস্ততায় আরো দুর্বল হওয়াটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এটিই হচ্ছে আমাদের ইসলামী শরিয়ত ও পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই সামাজিক বিষয়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণে এমনভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, যেন শুরু করার আগেই শেষ না হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রোডাকশন বা ফলাফল লাভ করা পর্যন্ত উৎপাদনের সকল উপকরণ যথাযথ ব্যবহারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, অর্থনৈতিক বিষয়টি একেবারে সহজ বিষয় নয়। বরং এ বিষয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে।

তেমনিভাবে আমাদেরকে নারী ও পরিবার কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। যাতে সঠিকভাবে ফলাফল লাভের মাধ্যমে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করে আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারি।

তেমিনভাবে আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামী শরিয়তের আলোকে নারীদের ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা ও মূল্যবোধ রক্ষা তাদের মাতৃত্বমূলক দায়িত্বে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও উন্নতির লক্ষ্যে নারীদের জন্য আলাদা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক ও সমাজের অংশ– সে মনোভাব অবশ্যই তৈরি করতে হবে।

(সীনা) যুগের দিক নির্দেশনা

পরিবারের ভূমিকা : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, স্থপতি, সংস্কার শিশুর লালন-পালন, পরিচর্যা, শিশু বিষয়ক তালিম-তারবিয়াত, ও তার কারিকুলাম উন্নয়ন এবং শিশু বিষয়ক সংস্কৃতির

www.pathagar.com

সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেন নি। বরং তারা গুরুত্ব দিয়েছে। উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে, যার ফলে জাতির নতুন প্রজন্ম থেকে আমাদের আলো নির্বাপিত হয়ে গেছে, স্থবির হয়ে গেছে আশা আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনা। জাতি পরিণত হয়েছে একটি প্রাণহীন দেহতে। অথচ উচিত ছিল বাল্য বয়সেই একটি শিশুর ভিতরে সে সকল মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠিত করা।

সুতরাং এ নিষ্প্রাণ জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে হলে এবং সমস্যার সমাধান করতে হলে, শিশু বিষয়ক তালিম-তারবিয়াত-পরিচর্যা এবং নারী ও পরিবার সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে গুরুত্ব দিতে হবে।

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যে জাতি আজ সর্বস্তরে পশ্চিমা ধরনের সভ্যতা সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ এবং উপনিবেশন ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের শিকার, তেমনিভাবে বাঁধা লাগানো অত্যাধুনিক নানা ধরনের আবিস্কারে আর বিজ্ঞাপনে দিশেহারা, সে জাতি কীভাবে তাদের শিশুর সেই হারানো অদৃশ্য শক্তিকে ফিরে পাবে এবং নতুন প্রজন্ম থেকে ভাল কিছু আশা করতে পারবে। এবং তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে পারবে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে একটিই। তা হচ্ছে, পারিবারিক ভূমিকাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। পারিবারিক ভূমিকার মাধ্যমে সঠিকভাবে শিশুর লালন-পালন ও তার পরিচর্যা করে শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে হবে। তাহলে এক পর্যায়ে জাতি এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যস্থলে পৌছুতে পারবে।

প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ : গৌণ বিষয়

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম আধ্যুষিত এলাকাসমূহ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির প্রাণকেন্দ্র। তারই হাতে রয়েছে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শক্তি বৃদ্ধির চাবিকাঠি। তারাই জাতিকে সঠিক সংস্কার ও পরিশোধনের দিক নির্দেশনা দিতে পারে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রকৃতি এবং ইলমে ওহির দিক নির্দেশনার সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারে। তবে তাদের এ সংস্কার এবং তালিম তারবিয়াতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংগঠন আর প্রতিষ্ঠান-নির্ভর হলে চলবে না। প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের উপর নির্ভরশীল হয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংস্কার ও পরিশোধন করতে পারবে না। কারণ, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজেদের উপকার ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আধুনিক বিশ্বের অনুকরণ করে থাকে। তাদের স্বার্থ পরিপন্থী কোন কিছু করতে তারা রাজি হয় না। তারা জাতির অনুসরণ করে মাত্র।

www.pathagar.com

তবে তার মানে এ নয় যে, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। বরং সংস্কার-পরিশোধন ও তালিম তারবিয়াতের ক্ষেত্রে সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে গৌণ ভূমিকায় রাখতে হবে। বর্তমান প্রচার মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলো তাই প্রমাণ করে। সেখানে রয়েছে বিশেষ ধরনের সভ্যতা-সংস্কৃতি, তালিম-তারবিয়াত। তারা কোন সময়ই ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইসলামী তালিম-তারবিয়াতের বেলায় উৎসাহ প্রদান করে না। তবে তার মানে এ নয় যে, প্রচার মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলোকে পরিত্যাগ করব। বরং আধুনিক প্রচার মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলো মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, গবেষক এবং চিন্তাবিদদের জন্য সংস্কার পরিশোধন এবং তালিম-তারবিয়াতের বিরাট একটি উপকরণ হতে পারে। যার মাধ্যমে তারা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের জন্য বিশেষ ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে পারে।

এর মাধ্যমে যদিও সকল সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই ধারাবাহিকতায় বা ঐক্যের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তদুপরি সার্বিকভাবে তাদের সামনে একটি দিক নির্দেশনা তুলে ধরতে পারবে। যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন মূসা (আ.) ও তার ভাই হারুন (আ.) আরব জাতিকে।

যদিও আমাদের পক্ষে বর্তমান আধুনিক প্রচার মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও অত্যাধুনিক যন্ত্র সরঞ্জামাদির যুগকে মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) এর যুগের সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়; তদুপরি আমাদেরকে তথা মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং ইসলামী তালিম-তারবিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমা সভ্যতা, সংস্কৃতি, তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষাসহ প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি দিকের মোকাবেলা করতে হবে। প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের নেতৃত্বে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার ও পরিশোধন করতে হবে। গোটা সমাজ তথা পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হবে। পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ সকল প্রকার আগ্রাসনের মোকাবেলা করে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার ও পরিশোধন করে গোটা সমাজ ও পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য এমন একটি দলের বা জাতির প্রয়োজন, যাদেরকে তাদের আত্মাই তাদের কাজ কর্মে প্রেরণা প্রদান করবে। তাদের স্বভাবই (فطرة) সংস্কার ও পরিশোধনের প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাবে। তারাই মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তালিম-তারবিয়াতের ব্যবস্থা করবে। তারাই তাদের সর্বশক্তি দিয়ে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির জাগরণের কাজ চালিয়ে যাবে। সমকালীন সকল প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করবে।

www.pathagar.com

পিতৃসূলভ অনুপ্রেরণা সামাজিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মুক্তি-পরিত্রাণ লাভ এবং সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন প্রতিটি মুসলিমের প্রাণের দাবি। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির এ প্রাণের দাবি আদায়ের জন্য সর্বপ্রথমেই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর উপর একান্ত ভরসা করতে হবে। তারপর সকল প্রকার নেতিবাচক প্রভাবের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তিতে বলিয়ান হতে হবে। এ আত্মনির্ভরতা এবং আত্ম শক্তি অর্জিত হবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পারিবারিক জীবনে একটি মুসলিম মানব সন্তানকে আত্মিক ও মানসিকভাবে গঠন করার মাধ্যমে। আর এ কাজটি করতে পারে শিশুর পিতা কর্তৃক অনুপ্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে। কারণ, একজন পিতা সর্বাবস্থায় তার সন্তান ও শিশুদের তারবিয়াত ও শাসন ইত্যাদি তাদের কল্যাণের জন্যই করে থাকে। এজন্য শিশুদের পিতার অনুপ্রেরণা প্রদানই মুসলিম উম্মাহ্‌র সামাজিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে থাকে।

যেহেতু একজন পিতা সার্বক্ষণিকভাবে তার সন্তানদের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত থাকেন, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য তারাই শিশুদের অনুপ্রেরণা যোগাতে পারেন। বর্তমান যুগে ইসলামী শিক্ষা প্রশিক্ষণ, তালিম-তারবিয়াত এবং ইসলামী সংস্কার-পরিশোধনের একমাত্র চাবিকাঠি তাদের হাতেই বলতে হয়। তবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সামাজিক পরিবর্তন ও পরিশোধনের জন্য সন্তান ও শিশুদের গঠনের ক্ষেত্রে জাতির চিন্তাবিদ গবেষক, পরিশোধক ও সংস্কৃতিবিদদেরকে সহায়তা করতে হবে। তাদেরকে শিশুদের কল্যাণের বিষয়াবলীর প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। তাদেরকে শিশুদের আত্মিক ও মানসিক গঠনের পথ ও পন্থা ইসসলামের মূল্যবোধ ও মূলনীতির আলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে। যাতে সকলেই ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করতে পারে। এজন্য জাতির চিন্তাবিদ গবেষক ও সংস্কৃতিবিদদের জাতির সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু বলা যেতে পারে।

এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির খেদমতে এবং জাতির নতুন প্রজন্মকে শক্তিশালী ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে মাদ্‌রাসা ও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। তারা শিশুদের বাবা-মা ও অভিভাবকদের জন্য বিশেষ ধরনের সেমিনারের আয়োজন করতে পারে। যে সেমিনারের মাধ্যমে তারা বাবা-মা ও অভিভাবকদের সামনে সঠিক সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শিশুদের সঠিক তালিম-তারবিয়াতের মৌলিক পদ্ধতিসমূহ তুলে ধরতে পারে।

www.pathagar.com

তেমনিভাবে এ কাজে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও অংশ নিতে পারে। তারা যুবকদের জন্য এ প্রসঙ্গে বিশেষ ধরনের শিক্ষা এবং ইসলামিক বিধান অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিবার গঠনের পদ্ধতি ও নিয়মাবলী ইত্যাদি শিক্ষা দিতে পারে। যাতে ঐ যুবকরা সঠিক পদ্ধতিতে দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে পরিবার গঠন করে তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে ইসলামিক মূল্যবোধ ও মূলনীতি অনুযায়ী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং তালিম-তারবিয়াত প্রদান করতে পারে।

বিশেষভাবে ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। তারা জাতির সংকট নিরসনে এবং চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্য শিশুদের অভিভাবক বাবা-মাদের জন্য সেমিনার, সভা, আলোচনা পর্যালোচনা-সহ নানা ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে। তাদের সতর্ক ও সচেতন করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে এমন একটি জাতি উপহার দিতে পারে, যারা মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পরিবর্তন, পরিশোধন এবং সংস্কার সাধন করতে সক্ষম। কারণ, বাবা, মা ও অভিভাবকরাই হচ্ছে শিশু গঠনের প্রাথমিক মাদরাসা ও শিক্ষালয়। তাদের মাধ্যমেই সঠিক জাতি গঠন সম্ভব হবে।

কাঙ্ক্ষিত তালিম-তারবিয়াতে বাবা-মায়ের ভূমিকা

শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা তালিম-তারবিয়াতের ক্ষেত্রে স্কুল, মাদ্‌রাসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াত প্রদান করার বিষয়টি নির্ভর করে পারিবারিক শিক্ষা বা বাবা-মা ও অভিভাবকদের শিক্ষার উপর। স্কুল, মাদরাসা, মক্তব তথা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় একজন অভিভাবক, বাবা-মা তার সন্তান তালিম-তারবিয়াত প্রদান করতে অধিক সক্ষম। কারণ, বাবা-মা ও অভিভাবক তার একটি সন্তানের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সার্বিক দিক খুব ভালভাবে বিবেচনা করতে পারে। অনেকেই ইতিবাচক বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সে সমস্ত দিকগুলো বিবেচনা করা সহজসাধ্য না হওয়ার কারণে তারা লাগামহীনভাবে তালিম-তারবিয়াত প্রদান করতে থাকে। আবার কোন কোন সময় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানা ধরনের সমস্যাও থাকতে পারে। এজন্য প্রত্যাশিত তালিম-তারবিয়াতের বেলায় বাবা-মা এবং অভিভাবকদের ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

একটি আদর্শ পরিবারের হাতেই রয়েছে শিশুদের তালিম-তারবিয়াতের সর্বাধিক ক্ষমতা ও শক্তি। এজন্য শিশুদের তালিম-তারবিয়াতের ক্ষেত্রে পরিবারকে শিশুদের চক্ষের আয়না বা রঙ্গিন চশমার সাথে তুলনা করা হয়। রঙ্গিন চশমা যেমন চোখে লাগালে,

www.pathagar.com

প্রাকৃতির দৃশ্যও রঙ্গীন দেখায় তেমনিভাবে পরিবার তার সন্তানকে যা বুঝাবে, যা শিক্ষা দিবে, তাই বুঝবে ও শিখবে। শিশু কী দেখল অথবা কী শুনল সেটি বড় কথা নয়, বরং শিশুদের ক্ষেত্রে বড় কথা হচ্ছে শিশুদের কী বুঝানো হচ্ছে । এজন্য দেখা যায়, একই প্রতিষ্ঠানের একই সিলেবাস একই শিক্ষকের তত্বাবধানে ছাত্র ও শিশুগুলো ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন স্বভাবের হয়ে থাকে। অথচ কথা ছিল একই প্রকৃতি একই স্বভাবের হওয়ার। কিন্তু তারপরও ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন স্বভাবের হওয়ার কারণ হচ্ছে পারিবারিক প্রভাব এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী পরিবেশের প্রভাব। এজন্য শিশুদের আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক গঠনের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-দীক্ষায় বাবা-মা ও অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মধ্যে তালিম-তারবিয়াতের অভাব

বর্তমানে আমরা যদি মুসলিম উম্মাহ ও জাতির তালিম-তারবিয়াতের গুরুত্বের প্রতি অবলোকন করি, তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারপর দ্বিতীয় স্তরে প্রচার মাধ্যমকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আর তৃতীয় স্তরে রাখতে হবে পারিবারিক গুরুত্বকে। কারণ, বর্তমান সমাজে পারিবারিক ভূমিকা শুধুমাত্র শিশুদের আহারবিহার পরিধান, ও বাসস্থানের আর চাহিদা পূরণেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। তালিম-তারবিয়াতের গুরুত্ব নেই।

তেমনিভাবে আমরা যদি বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে শিশুদের তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার বেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার-মিডিয়া এবং পারিবারিক ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। পারিবারিক ভূমিকা শুধুমাত্র কিছু ওয়াজ নসীহত, উপদেশ আর বাণীর মাঝেই সীমাবদ্ধ। শিশুদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ এবং আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরাত বা স্বভাবের প্রতি কোনো লক্ষ্য নেই। তারা জানেই না কীভাবে তাদের আত্মিক এবং মানসিক বিকাশ সাধন করতে হয়। কীভাবে তাদের তালিম-তারবিয়াত এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। কীভাবে তাদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতি আর মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এ সকল বিষয়ে তাদের কোন লক্ষ্য নেই।

অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, আজ পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের উপর উপনিবেশ সৃষ্টি করছে, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধে আগ্রাসন চালাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি হ্রাস পাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতি সার্বিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে। পশ্চিমা সভ্যতা

www.pathagar.com

সংস্কৃতি মুসলিম উম্মাহ জাতির জন্য মহামারীর আকার ধারণ করছে। এখন জাতির প্রত্যেকেই নিজ নিজ অর্থ নিয়েই ব্যস্ত। পার্থিব সম্পদ, আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি আর অহমিকা নিয়েই জীবন-যাপন করছে। সাধারণ সমাজে আজ হিংসা, বিদ্বেষ, যুলুম, নির্যাতন, অন্যায় অবিচার, আর দুর্নীতি বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। তার প্রতি কেউ কর্ণপাত করছে না। সামাজিক নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, সামাজিক কল্যাণ, জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা, ইসলাম ও মানবতার মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়-ইনসাফ, আদালত ইত্যাদি বিষয়ের আজ কোন গুরত্ব নেই। এমন কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান অথবা সংগঠন পাওয়া যায় না, যারা এ সকল বিষয়ে সাধারণ সমাজ তথা মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে সচেতন করে তুলবে। তাদের শক্তি সামর্থ আর মনোবল দিয়ে এ কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবে এবং অন্যায়ের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিবে।

আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, মাদ্রাসা এবং প্রচার মাধ্যমগুলো এ বিষয়ে তাদের আশানুরূপ দায়িত্ব আদায় করছে না। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সৎ ও সঠিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে না।

তেমনিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা একই ধরনের। এ সকল বিষয়ে তাদেরও ভূমিকা একেবারে নগণ্য। তারাও মুসলিম উম্মাহ ও জাতির জন্য যোগ্য শিক্ষক এবং মেধাবী নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারছে না, তাদের জন্য সভা, সেমিনার-আলোচনা, পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে পারছে না। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির এহেন পরিস্থিতির মোকাবেলায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

তেমনিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও শিশুদের উন্নয়নে এবং তাদের মধ্যে লুকায়িত আত্মিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারছে না। জাতির সংস্কার ও পরিশোধনের জন্য তাদের কাজে স্পৃহা জাগাতে পারছে না।

আমরা যদি শিশুদের তালিম-তারবিয়াত আর শিক্ষা-দীক্ষার বেলায় মুসলিম বিশ্বকে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী এবং সাধারণ বিশ্বের মাঝে তুলনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, মুসলিম বিশ্বের ত্যাগ-তিতিক্ষা, দান-অনুদান অত্যন্ত নগণ্য। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, মক্তব, স্কুল এবং সামাজিক তালিম- তারবিয়াতী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ জনগণের সাহায্য সহায়তায় অথবা গরীব- দিনমজুর অভিভাবকদের অনুদানে পরিচালিত হয়। যার কারণে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা-ব্যবস্থা, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের মান-মর্যাদার অবনতি ঘটেছে। তাদের অগ্রগতি উন্নতির মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে।

www.pathagar.com

তেমনিভাবে আমরা যদি মুসলিম বিশ্বের শিক্ষার কারিকুলাম এবং উপকরণাদির প্রতি তাকাই,তাহলে একই অবস্থা দেখতে পাবো। সেখানে পাবো দীর্ঘকাল যাবৎ দুর্বল, রুগ্ন ও ব্যর্থ শিক্ষা–কারিকুলাম ও সিলেবাস এবং শিক্ষার উপকরণ। যার কারণে শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক বিকাশ হচ্ছে না। তাদের মধ্যে জাগরণের স্পৃহা আসছে না। বরং তাদের মধ্যে যুলুম, সন্ত্রাস, অসহায়তা আর হতাশা বিরাজ করছে। এজন্য মুসলিম বিশ্বকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের তালিম-তারবিয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি রক্ষায় দুর্বার চেষ্টা চালাতে হবে। তাহলে মুসলিম বিশ্ব তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারবে।

তেমনিভাবে আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে, তাদের একদিকে যেমন ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের সভ্যতা- সংস্কৃতি, অপর দিকে ছিল না তাদের তালিম-তারবিয়াতের আদব-শিষ্টাচারের অগ্রগতি-উন্নতি। অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে যুলুম-নির্যাতন, সন্ত্রাস আর শারীরিক নির্যাতনের অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের তালিম তারবিয়াতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একইভাবে তাদের অজ্ঞতা আর মূর্খতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তাদের পরিবার-ব্যবস্থা। যার কারণে তাদের মধ্যে চিন্তা-চেতনা গবেষণা হ্রাস পেয়েছে। শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা, তালিম-তারবিয়াতের রীতি-নীতি ও পদ্ধতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। শিশুদের আত্মিক ও মানসিক এবং জৈবিক বিকাশ কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিবন্ধকতা আর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এজন্য আমাদের এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে তালিম তারবিয়াত আর সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে আবারও আমাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারি।

তারবিয়াতী পরিবারের শিষ্টাচারের গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার ও পরিশোধনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তারবিয়াতী পরিবারের আদব-শিষ্টাচার ও আচার ব্যবহার। কারণ, মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার ও পরিশোধন এবং জাগরণ সৃষ্টিকরণ পারিবারিক আদব-শিষ্টাচারের মধ্যেই নিহিত। এজন্য বেশ কয়েকটি কারণে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কৃতিবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদেরকে এবং; নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পারিবারিক আদব-শিষ্টাচারকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করছি।

www.pathagar.com

প্রথমতঃ শিশুর জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিসহ আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক গঠন ও উন্নয়ন সাধনে পারিবারিক ভূমিকা অনন্য। কারণ, একমাত্র ঘর বা পরিবারই হচ্ছে শিশুর উৎসস্থল, আরাম-আয়েশ, আশ্রয় ও বিনোদন, পারিবারিক ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক-নির্দেশনা, আচার ব্যবহার আর আদব-শিষ্টাচারের মধ্য দিয়েই একটি শিশুর বিবেক বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। এজন্য শিশুদের ক্ষেত্রে পরিবারকে রঙ্গীন চশমার সাথে তুলনা করা হয়। রঙ্গিন চশমা যেমন চক্ষে লাগালে প্রকৃতির দৃশ্য ও রঙ্গিন দেখায় বা চশমার রং ধারণ করে। তেমনিভাবেই একটি শিশু তার পরিবারকে এমনি অনুসরণ করে। শিশুরা কী দেখল? কী শুনল? সেটি বড় বিষয় নয়। বরং পরিবার শিশুদেরকে কী বুঝালো? শিশু কী অনুধাবন করল, সেটি হচ্ছে বড় বিষয়। তাই পরিবার যেমন হয়ে থাকে শিশুর আত্মিক মানসিক তথা জ্ঞান অনুভূতিও সে রকম হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং পরিবার সার্বক্ষণিকভাবে তাদের সন্তান ও শিশুদের ফিতরাত ও স্বভাব অনুযায়ী তাদের কল্যাণ কামনা করে থাকে। তারা তাদের জীবনের মান-উন্নয়ন এবং দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে গড়ে তোলা-সহ আরাম-আয়েশে ও সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট থাকেন। এজন্য একটি শিশুর উপর তার পরিবার, বাবা-মা ও অভিভাবকদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে থাকে। তাই শিশু শিক্ষা, তালিম- তারবিয়াত, আদব-শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে অন্যান্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বাবা, মা, অভিভাবক তথা পরিবারের ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়তঃ একজন সমাজ সংস্কারক পরিশোধক লেখক গবেষক ও চিন্তাবিদ মুসলিম উম্মাহ ও জাতির বাবা-মা, ও অভিভাবকদেরকে শিশু-পরিচর্যার বিষয়াবলী, শিক্ষা-দীক্ষা, তালিম-তারবিয়াত ইত্যাদি হাতে নাতে শিক্ষা দিতে পারেন। তাদের সন্তানদের জন্য কল্যাণকর বিষয়গুলো সহজে বুঝিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন এ কাজটি সহজে করতে পারে না। তারা যথাযথভাবে বাবা মা ও অভিভাবকদেরকে উন্মুক্ত বক্তব্য ও সম্বোধন করতে সক্ষম হয় না। কারণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ সব সময়ই তাদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং সার্বক্ষণিক কল্যাণ কামনা করে থাকে। তারা প্রয়োজনের আলোকে জাতির অনুসরণে সামাজিক পরিবর্তন, পরিশোধন ও সংস্কার সাধনে সাড়া দিয়ে থাকে।

এজন্য মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ চিন্তাবিদ, পরিশোধক ও গবেষকদেরকে পরিবার এবং শিশুদের জন্য পারিবারিক তালিম তারবিয়াত শিক্ষা দীক্ষার বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে বাবা-মা ও অভিভাবকদের

www.pathagar.com

জন্য তালিম-তারবিয়াত সংক্রান্ত আদব-শিষ্টাচার, সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বাবা-মা ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তারা সঠিকভাবে যোগ্য ও উপযুক্ত বাবা-মা হিসেবে সন্তানদের তারবিয়াতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে। তারা নানা ধরনের অভিজ্ঞতার আলোকে সঠিকভাবে তাদের সন্ত ানদের ও শিশুদের আত্মিক-মানসিক জৈবিক এবং শারীরিকসহ সার্বিক বিষয়াবলী বিবেচনা করে তাদেরকে আদব-শিষ্টাচার, তালিম তারবিয়াত, শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি প্রদান করতে সক্ষম হতে পারে এবং তাদের সন্তানদের ইসলামের মূল্যবোধ অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে।

এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই বাবা-মা পরিবার এবং অভিভাবকদের অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, তারাই হচ্ছে যুগ ও জাতির পরিশোধনের শুভযাত্রা। তাই ইসলামী সংস্কৃতিবিদ, সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদেরকে সাধ্যানুযায়ী তাদের বিদ্যা বুদ্ধি, যোগ্যতা অভিজ্ঞতার আলোকে বিশুদ্ধ নিয়ত ও এখলাছের সাথে বাবা-মা ও অভিভাবকদের জন্য সার্বিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে। কারণ, সন্তানদের উপর তাদের বাবা-মা ও অভিভাবক এবং পরিবারের ভূমিকাই সরাসরি বিনা বাধায় সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তারাই তাদের সন্তানদের সার্বিক দিক বিবেচনা করে, আচার-আচরণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে পারে। সন্তানেরাও সহজে তাদের বাবা-মা অভিভাবক এবং পরিবারের আচার-আচরণ, বক্তব্য, আদব-শিষ্টাচার ও উপদেশাবলী মান্য করতে ও বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করে। এ সম্পর্কে আমাদের কাছে অনেক ভুরি ভুরি নজির, বাস্তব উদাহরণ রয়েছে।

একজন বাবা-মা বা অভিভাবক এবং পরিবার যদি সঠিকভাবে তাদের সন্তানের উপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাহলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি খুব সহজেই তাদের সন্তানদেরকে তালিম- তারবিয়াতের যথাযথ ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। শিশুদের তারবিয়াতী শিক্ষা, আদব-শিষ্টাচার ও পরিশোধন স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন যদি সঠিকভাবে গড়ে ওঠে তাহলে তার প্রভাব যেমন সন্তানদের উপর পড়ে, তেমিনভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে তাহলে তার প্রভাবও সন্তানদের উপর পড়ে, সন্তানদের তালিম- তারবিয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-শিষ্টাচার ইত্যাদির বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

এজন্য স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন এবং পারিবারিক জীবনে ভালবাসা, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি অবশ্যই থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। যতক্ষণ

www.pathagar.com

পর্যন্ত একটি পরিবারে এ গুণগুলো প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবারে আরাম-আয়েশ, শান্তি বিরাজ করতে পারবে না। সে পরিবার তাদের সন্তান সন্ততিদের তালিম-তারবিয়াত, আদব-শিষ্টাচার, আত্মিক ও মানসিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে না। শিশুরা সার্বিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না।

অতএব শিশুদের তালিম-তারবিয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা, শিষ্টাচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক, পারিবারিক ভালবাসা, স্নেহ-মমতা দয়া অনুগ্রহ এবং নিরাপত্তা ইত্যাদি পূর্বশর্ত। বাবা-মায়ের বা পরিবারের সুসম্পর্ক ভালবাসা ইত্যাদি শিশুদের হৃদয়ে ভালবাসা, শ্রদ্ধা, শান্তি, নিরাপত্তার ও আনুগত্যের প্রবণতার জন্ম দেয়। শিশুরা সর্বাবস্থায় তাদের বাবা-মা ও পরিবারের ডাকে সাড়া দেয়, তারা তাদের অনুগত্য স্বীকার করে, তাদের কল্যাণকর বিষয়গুলো বাস্তবায়নে চেষ্টা করে। বাবা-মায়ের সঠিক ভালবাসা আর স্নেহ মমতার মাধ্যমে শিশুদের অন্তর থেকে অহেতুক ভয়-ভীতি আর নেতিবাচক প্রভাব দূরিভূত হয়ে যায়। তারা নিজেদেরকে আত্মিক ও মানসিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে।

প্রকৃত প্রেমিক, আগ্রহী, সচেতন ও বিশ্বস্ত সেই ব্যক্তি, যে সঠিক কল্যাণের পথে নিজের সর্বস্ব বিলীন করে দিতে পারে, বিপদে সংকটে ধৈর্য ধারণ করতে পারে। দুঃখ কষ্ট ইত্যাদিতে বিচলিত না হয়ে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে পারে। আর অপারগ, দুর্বল, কাপুরুষ ঐ ব্যক্তি, যে প্রয়োজনের সময় তার শক্তি সমর্থ ব্যয় করতে পারে না। দুঃখ কষ্ট আর আপদে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। আর এ বিষয়টিই আমাদের মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মধ্যে সর্বস্তরে বিরাজ করছে। যেখানে ভালবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা তার ধৈর্য, সাহসিকতা নেই, সেখানে সঠিক তালিম-তারবিয়াত আর শিক্ষা-দীক্ষার আশা করা যায় না। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সংস্কার ও পরিশোধন কল্পনা করা অনুচিত।

এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই স্বামী-স্ত্রী এবং পরিবারকে সজাগ ও সচেতন করতে হবে। শিশুদের আত্মিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক অনুধাবনের অনুপ্রেরণা জাগাতে হবে। পরস্পরের মধ্যে দয়া-অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার উৎসাহ প্রদান করতে হবে। যাতে করে প্রথমে স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের মধ্যে সে সকল গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করে, তারপর তাদের সন্তানদেরকে সেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষা ও তালিম-তারবিয়াত প্রদান করতে পারে। কারণ, হারিয়ে যাওয়া বা অস্তিত্বহীন বস্তু কোন কিছু দিতে পারে

www.pathagar.com

না। তেমনিভাবে যে সংস্কার বা পরিবার হিংসা-বিদ্বেষ আর ঝগড়া-বিবাদের কারণে ভেঙ্গে গেছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে, সে পরিবার থেকে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা তালিম-তারবিয়াতসহ ভাল কিছুর আশা করা যায় না। বরং সে সব পরিবারে ফিতনা-ফাসাদ, অশৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা আর অপরাধের প্রবণতা দিন দিন বাড়তেই থাকে।

এজন্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও মূলনীতি অনুযায়ী একটি পরিবারের আদব-শিষ্টাচার, আচার-আচরণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা, তালিম তারবিয়াতসহ আত্মিক ও মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, একটি পরিবার হচ্ছে সঠিক ও শক্তিশালী জাতি গঠনের প্রথম ফাউন্ডেশন বা ভিত্তিপ্রস্তর। একটি জাতির অগ্রগতি উন্নতি, সংস্কার পরিশোধন ইত্যাদি সার্বিক বিষয়াবলী নির্ভর করে পরিবারের উপর। সুতরাং মুসলিম উম্মাহ ও জাতির চিন্তাবিদ গবেষক, সংস্কৃতিবিদ ও পরিশোধকদের পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ও বিষয়াবলীর প্রতি গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করতে হবে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় সভা, সেমিনার ও আলোচনা-পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে পারিবারিক বিষয়াবলীকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পারিবারিক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। পারিবারিক দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে বিশেষ প্রোগাম ও সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে সমাজের কোনো মানুষ বা সদস্যই পারিবারিক বিষয়াবলী সম্পর্কে অজ্ঞ আর মূর্খ না থাকে। সমাজের প্রতিটি সদস্য যেন সে ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে। তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।

তেমনিভাবে সমাজের যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পথ ও পন্থাকে সহজসাধ্য করবে হবে এবং যুবক-যুবতীদেরকে বিবাহ বন্ধন ও পরিবার গঠনের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। তাদের জন্য সঠিক পরিবার গঠনের উপযোগী বিশেষ ধরনের সভা সেমিনার আলোচনা পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

তেমনিভাবে পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং বিশেষ করে যুবক যুবতীদেরকে সঠিকভাবে সন্তান উৎপাদন, লালন-পালন, তালিম-তারবিয়াতের বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদের সে বিষয়াবলীর প্রতি সচেতন করে তুলতে হবে। যুবক-যুবতী, পরিবার এবং শিশুদের জন্য বিশেষ বিশেষ বই পুস্তক ইত্যাদি রচনা করতে হবে। তাদের সার্বিক বিষয়ের সকল সমস্যার কারণ নির্ণয় করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, সাধারণত শিশুদের আত্মিক মানসিক ও জৈবিক দিকগুলো অনুধাবন না করে, তাদের বয়সের স্তর অনুযায়ী তালিম-তারবিয়াতের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা না করে, শুধুমাত্র ভালবাসা আর স্নেহ-মমতা দিলেই চলবে না। এতে তাদের আত্মিক ও মানসিক গঠন পূর্ণ হবে না। বরং কোন কোন সময় হিতে বিপরীত হতে পারে। এ অযৌক্তিক ভালবাসাই সন্তানদের ক্ষতি সাধনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ, পাপ-পঙ্কিলতা আর অপরাধ-প্রবণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাদের অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

এজন্য সঠিক ফলপ্রসু দয়া-অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা আর ভালবাসা হচ্ছে সন্তান ও শিশুদের বয়সের স্তর অনুযায়ী তাদের আত্মিক মানসিক, জৈবিক এবং শারীরিক অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা প্রদান করা। তাদের পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা করা। তাহলেই তাদের প্রতি সঠিক ভালবাসা হবে এবং সে ভালবাসা ফলপ্রসূ হবে।

তারবিয়াতি জ্ঞানের কার্যক্ষমতা : নিজস্ব অভিজ্ঞতা

আমরা এখানে তারবিয়াতী জ্ঞান সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করব, যাতে একজন অভিভাবক, বাবা-মা, মুরাব্বী কীভাবে তাদের সন্ত ানদেরকে বাস্তব কোন শিক্ষা প্রশিক্ষণ ছাড়াই নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তালিম ও তারবিয়াত প্রদান করতে পারেন। এমন কি তাদের নিজেদের মাঝে যদি এমন কোন অভ্যাস বা মন্দ স্বভাব থাকে, যা তারা পছন্দ করেন না, তাহলে তা এড়িয়ে কীভাবে তাদের সন্তান ও শিশুদের উত্তম আখলাক চরিত্র শিক্ষা দিতে পারেন। অথবা এমন কোন গুণ যা অভিভাবকের মধ্যে নেই, অথচ তাদের সন্তানদের তা শিক্ষা দিয়ে উত্তম ও সুন্দর চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে পারেন।

এখানে আমার বাস্তব ও নিজস্ব একটি অভিজ্ঞতা রয়েছে, তবে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনার পূর্বেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে আমি কোন দিন ধূমপান করিনি, এমনকি কোন দিন তামাক বা সিগারেটের কাছেও যাই নি। অথচ আমি এমন একটি পরিবারে বড় হয়েছি, যেখানে আব্বা আম্মা উভয়েই ধূমপানে অভ্যস্ত ছিলেন। অথচ আমি কোন দিন ধূমপান করি নি।

সাধারণতঃ শিশুরা তাদের চতুষ্পার্শের বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অনুসরণ করে থাকে, বিশেষ করে তার পরিবার ও বাবা-মা এবং অভিভাবকদেরকে অনুসরণ করে। কারণ, বাবা-মায়ের ও অভিভাবকের তত্ত্বাবধানেই তারা বড় হতে থাকে। সেখানে যদি বাবা-মা বা অভিভাবকের কোন খারাপ অভ্যাস থাকে, তাহলে তার সন্তানকে কীভাবে তা এড়িয়ে বা না শিখিয়ে ভাল চরিত্র ও অভ্যাস শিখাতে পারে, সেখানেই তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। যেমন কোন বাবা-মা যদি ধূমপায়ী হয়ে থাকে, আর সে যদি

www.pathagar.com

চুপচাপ বসে ধূমপান করতে থাকে, তাহলে তার সন্তানও অবশ্যই বাবা-মায়ের অনুসরণ করে ধূমপান করতে শুরু করে দিবে। আর যদি শিশুকে শুধুমাত্র এমনিতেই অথবা ধমক দিয়ে নিষেধ করে, তাহলে সেই শিশু সন্তানের ধূমপান বা নিষেধকৃত অভ্যাসের প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, সে চুপে চুপে গোপনে হলেও ধূমপান করার চেষ্টা করবে। এমনকি এক পর্যায় তাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ধূমপান থেকে বিরত রাখা যাবে না। আর যদি বাবা-মা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে, তাকে সঠিকভাবে আদর যত্ন আর স্নেহ-মমতার মধ্য দিয়ে তার সামনেই সিগারেট বা হুক্কা নিয়ে বসে আর তার ছোট শিশুকে এই ধূমপানের ক্ষতিকারক দিকগুলো তার সামনে তুলে ধরে এবং নিজের ভুল স্বীকার করে অনুশোচনার প্রমাণ করে এবং অচিরেই ধূমপান ছেড়ে দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে। আর তার শিশু যদি এ সকল অনুতাপ, ভুলের স্বীকার ও ছেড়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি শুনতে থাকে, তাহলে ঐ শিশু আর ধুমপান করতে যাবে না। তারপরও যদি কাজ না হয়, সুফল না পাওয়া যায় তাহলে সময় সুযোগে সিগারেট অথবা হুক্কার তামাক বা ধোঁয়ার কালো দু' একটি স্পট বা দাগ তার শরীরে বা সাদা কাপড়ে লাগিয়ে তাকে দেখানোর চেষ্টা করেন আর তাকে বলেন যে এ ধরনের কালো কালো অসংখ্য দাগ ধূমপায়ীদের ভেতরে বুকে ফুসফুসে ইত্যাদিতে লেগে থাকে। দাগ পড়তে পড়তে এগুলোর কার্যক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সর্দিকাশি, বুক ব্যথা, যক্ষ্মাসহ নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি করে। অবশেষে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাহলে ঐ শিশু আর কখনো ধূমপানের কাছে যাবে না। এভাবেই একজন বাবা-মা, অভিভাবক তার সন্তানকে খারাপ ও বদ অভ্যাস থেকে অনায়াসে বিরত রাখতে পারেন।

একজন বাবা, মা, অভিভাবক ও মুরব্বী হচ্ছে সন্তানদের জন্য বা শিশুদের আদর্শ এবং অনুসরণযোগ্য। অনেক সময় বাবা-মা ও অভিভাবক কিছু কিছু আত্মিক ও বাহ্যিক আখলাক চরিত্র নিয়ে অবহেলা করে থাকেন, যা ঠিক নয়। কারণ, এর জন্যই একটি সন্ত ানের আদর্শ চরিত্র নষ্ট হয়ে ভবিষ্যৎ জীবন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। যাকে পরবর্তী সময়ে সংশোধন করা বা সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্য বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তাদের উত্তম চরিত্র ও সৎ অভ্যাসে তালিম-তারবিয়াত যথাযথভাবে প্রদান করতে হবে।

নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুদের তারবিয়াত প্রদানের আরেকটি উদাহরণ তুলে ধরছি যে, আমার আম্মা (আল্লাহ তার উপর রহম করুক) ধূমপানের জন্য সিগারেটে আগুন ধরিয়ে রাখছেন এমতাবস্থায় আমার ছোট এক ভাই সেই জ্বলন্ত সিগারেটটি

www.pathagar.com

উঠিয়ে মুখে দেয়ার উপক্রম হয়, তখন আমার বোন দেখতে পেয়ে খুব দ্রুতই তার হাত থেকে সিগারেটটি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তখন মা বিষয়টি দেখতে পেয়ে আমার বোনকে সরিয়ে নিয়ে খুব আদর করে সিগারেটটি ছোট ভাইয়ের হাতে তুলে দেয় যাতে সে ভাল করে সিগারেটের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। ছোট শিশু আমার ভাইটি আনন্দ চিত্তে সিগারেটটা মুখে নিয়ে তার সঠিক স্বাদ গ্রহণ করতে লাগল, তখন নাকে মুখে ধোঁয়ার ঝাঁঝ লাগতেই হতভম্ব হয়ে সিগারেটটি দূরে ছুড়ে মারল। তখন থেকে নিয়ে সে আর কোনদিন সিগারেটের স্বাদ গ্রহণ করতে যায় নি। চিরদিনের জন্য সে সিগারেট বা ধূমপান থেকে দূরে সরে দাঁড়ালো। সেখানে যদি তাকে ধূমপান করতে না দিয়ে বিরত রাখা হতো, তাহলে সে যে ভাবেই হোক সে তার স্বাদ ইচ্ছামত উপভোগ করতে অভ্যস্ত হত।

আমার বাস্তব আরেকটি শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে যে, কীভাবে শিশুদের অভিজ্ঞতা থেকে তালিম-তারবিয়াত প্রদান করা যায়। আমি একদিন আমার মা (আল্লাহ তার উপর রহম করুক) এবং আমার ছোট ভাইয়ের মধ্যে আরও একটি ঘটনা অবলোকন করলাম। একদিন আমার ছোট ভাইটি সে তখনো ভালমতো কথা বলতে পারছে না। সে এরাবিয়ান কফি তৈরি করার জন্য গরম দুধ রাখার একটি পাত্র (غمصة) যার হাতল অলংকৃত ও সুসজ্জিত, সেই পাত্রটি নিয়ে বাড়িতে মায়ের কাছে আসল। সে ঐ পাত্রটি আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার মধ্যে পেয়েছিল। হতে পারে সে পাত্রটি কোনো ভ্রমণকারী দল বা পথিকের ভুল ক্রমে পড়ে গেছে। কারণ, আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সচরাচর এরাবিয়ানরা মক্কায় যাওয়া আসা করত। যাই হোক মা শিশুটিকে খুব আদর সোহাগ আর স্নেহভরে কোলে তুলে নিলেন অথচ পাত্রটি তার হাতেই রয়েছে। কিছু সময় শিশুটিকে আদর করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেন, বাবা তুমি পাত্রটি যেখানে পেয়েছ সেখানেই রেখে আস, পাত্রটি আসলে আমাদের নয়। পাত্রটি হয়তো কারো ভুলবশত পড়ে গেছে। তুমি এভাবে অন্যের কোন কিছু পেলে কোন সময়ও নিয়ে আসবে না। মায়ের কথা মতো শিশুটি পাত্র যেখানে পেয়েছিল, সেখানেই রেখে চলে আসল। আমি ঘটনাটি অবলোকন করে মনে করলাম যে, ঐ শিশুটি তার মায়ের কাছ থেকে যে শিক্ষা ও তারবিয়াত পেয়েছে, কোন দিন অন্যের কোন কিছু রাস্তায় পেয়ে তা ঘরে নিয়ে আসা তো দূরের কথা, পথিকের হারানো কোন কিছু স্পর্শ করাও অসম্ভব। এমনকি সে কোনদিন অন্যের কোন ধরনের অধিকার পর্যন্ত নষ্ট করবে না। এখানে যদি মা শিশুটিকে বা যে কোন মানুষই তার সন্তান বা শিশুকে এ ধরনের কাজে প্রশ্রয় দিত, যা অনেকেই এ ধরনের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে; তাহলে পর্যায়ক্রমে অন্যের জিনিসে হস্তক্ষেপ,

www.pathagar.com

অন্যের অধিকার নষ্ট ইত্যাদিসহ চুরির অভ্যাস পর্যন্ত গড়ে তার জন্য ওঠা স্বাভাবিক ছিল না। তার আখলাক চরিত্রসহ সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেত।

এজন্য বাবা-মা, ও অভিভাবকদের উচিত তাদের সন্তানদের যথোপযুক্ত, আদর-সোহাগ, স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার মাধ্যমে নিজের কাছে রাখা এবং উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়া, বুঝিয়ে সুঝিয়ে খারাপ চরিত্র থেকে বিরত রাখা। সবসময় নিজেদের কাছে রাখা, যাতে তারা খারাপ ও অভদ্র স্বভাবের লোকদের সাথে মিশতে না পারে। তাহলেই তাদেরকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

ব্যক্তিগত বা নিজস্ব অভিজ্ঞতার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে যে, টিভি বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠান অবলোকন করা। আমি অনেক সময় পর্যবেক্ষণ করেছি যে, আধুনিক টিভি চ্যানেলগুলোতে অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন প্রোগ্রাম ও বার্তা প্রচার করে, এমনকি কোন কোন সময় আমল-আখলাক চরিত্র বিধ্বংসী প্রোগ্রাম পর্যন্ত প্রচার করে থাকে। আবার কোন কোন সময় ভাল প্রোগ্রামের ভেতর দিয়েও মাঝে মাঝে খারাপ প্রোগ্রাম ও কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যা খুব সহজেই ছোটদেরকে প্রভাবিত করে ফেলে। এমতাবস্থায় শিশুদেরকে কীভাবে সঠিক তালিম-তারবিয়াত ও সৎচরিত্র শিক্ষা দেওয়া যায় সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।। একদিকে যেমন টিভি বা টেলিভিশন প্রোগ্রামগুলো বাদ দেয়া বা ত্যাগ করা যাচ্ছে না, কারণ আজকের আধুনিক যুগে টেলিভিশন মানুষের জীবনের সাথে মিশে গেছে এবং যুগের চাহিদানুযায়ী চ্যানেলগুলোতে, এমন কিছু শিক্ষা, বিনোদন ও সভ্যতা, সাংস্কৃতিমূলক প্রোগ্রাম প্রচার করে থাকে যা থেকে দূরে থাকাও কঠিন। অপরদিকে খারাপ ও আসল চরিত্র ধ্বংসকারী প্রোগ্রামগুলো থেকে বেঁচে থাকা যায় না, তাহলে শিশুদেরকে কীভাবে ভাল ও সৎচরিত্রবান রাখা যাবে।

এমতাবস্থায় বাবা, বা অভিভাবকের উচিত ও কর্তব্য হচ্ছে প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে শিশুদের ভাল দিকগুলো বুঝিয়ে দেওয়া এবং ভাল দিকগুলোর দিকে ধাবিত করে দেওয়া। প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে তা সম্ভব না হলে প্রোগ্রামের পর তাকে উত্তম চরিত্রের আলোকে বুঝিয়ে দেয়া, যাতে খারাপ চরিত্রের প্রভাব তার থেকে দূর হয়ে যায়। কারণ, সাধারণত শিশুরা কী দেখল যেটি বড় বিষয় নয়। বরং তাকে কী বুঝানো হলো সেটি বড় বিষয়। তেমনিভাবে শিশুরা বাবা-মা, ও অভিভাবকদেরকে অনুকরণ প্রিয় হয়ে থাকে। তাদের কাছে থাকে ও তাদের কথানুযায়ী চলতে ভালবাসে। এজন্য তাদের কথাই তারা মানে।

www.pathagar.com

আর যে সকল প্রোগ্রামে শুধু খারাপ দিকই রয়েছে সেগুলো থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে। তাদেরকে নসিহত উপদেশের মাধ্যমে বুঝিয়ে সুজিয়ে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের মত ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার বিশেষ খারাপ প্রোগ্রাম থেকে বিরত রাখতে হবে। তাদের সঠিক তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে সকল প্রতিকূল ও নেতিবাচক প্রভাবের মোকাবেলা করার যোগ্যতা তৈরি করতে হবে। তাহলে তারা নিজেরাই সে সকল খারাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

তালিম-তারবিয়াতের ব্যাপারে আমার এ কিতাবখানায় যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য ও গুরুত্ব পাচ্ছে, সে বিষয়টি হচ্ছে ইসলামী চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, গবেষক মুরাব্বী ও পরিশোধকদের চেষ্টা প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম যা মুসলিম উম্মাহ ও জাতির বাবা মা, অভিভাবকদেরকে সঠিক ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি, মূল্যবোধের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে ও ইসলামী বক্তব্য তুলে ধরার জন্য উৎসর্গ করছে। তাদের সামনে কুসংস্কার, সত্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেছে। তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সঠিকভাবে তালিম-তারবিয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করতে এবং তাদের চরিত্রবান হিসেবে এবং তাদের আত্মিক ও মানসিক গঠন ও উন্নয়ন করতে সাহায্য-সহায়তা করেছেন। সে দিকটি আমার পুস্তকে প্রাধান্য পাচ্ছে। এ সহায়তার প্রভাব তাদের সন্তানদের মধ্যে পড়েছে তথা গোটা জাতির মধ্যে পড়েছে। তাদের মধ্যে আদল-ইনসাফ, ন্যায়-নীতি, সঠিক ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, ধৈর্য ও ত্যাগ তিতিক্ষা এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনার প্রবণতা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে।

তবে এখানে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, এ পৃথিবীতে অন্যান্য জাতি- গোষ্ঠীর লাইব্রেরীগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সেখানে শতশত হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ বই পুস্তক তালিম-তারবিয়াতের বিষয়ে রয়েছে, যে বই পুস্তকগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের তথাকথিত আদর্শ সম্পর্কে প্রত্যেক বাবা-মা, অভিভাবকদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের পদ্ধতি নিয়ম-নীতি ইত্যাদি শিক্ষা দিচ্ছেন। যার ফলে বাবা মা ও অভিভাবকরা তাদের সন্তান সন্ততি ও শিশুদেরকে সঠিকভাবে তালিম- তারবিয়াত প্রদান করতে পারছেন, তাদের ডাকে ও প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারছেন। কিন্তু আমাদের মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ইসলামিক লাইব্রেরীগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে অধিকাংশ লাইব্রেরীতে তালিম তারবিয়াত বিষয়ক এবং সঠিকভাবে পরিবার গঠন বিষয়ক বই, নেই বললেই চলে। সেখানে দু'একটি পাওয়া গেলেও তা উল্লেখ করার মত নয়। সেখানে রয়েছে ওয়াজ নসিহত আর উপদেশ ইত্যাদি। অথবা সেখানে রয়েছে সে সকল কিতাব ও বইপুস্তক, যেগুলো বিবাহ বন্ধন, বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক, ওসিয়াত সম্পত্তি বণ্টন ইত্যাদি সম্পর্কীয় ফিকহ ও আইন কানুন বিষয়ক। সেখানে মানবিক

www.pathagar.com

সম্পর্ক পারিবারিক সম্পর্ক তালিম-তারবিয়াত বিষয়ক বই পাওয়া যায় না। অথচ এগুলোর প্রতি উম্মাহ-জাতি ও সকল মানুষ অধিক মুখাপেক্ষী। আইন-কানুন বিষয়ক বই পুস্তকের প্রতি সাধারণ মানুষ এত মুখাপেক্ষী নয়। তাদের যেগুলোর প্রয়োজন নেই, সেগুলো কাজী, বিচারক, হাকিম ও উকিল মুখতারদের জন্য প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে তাদের কাছে যাবে এবং সেখান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সমাধান নিয়ে আসবে।

এজন্য তালিম-তারবিয়াত ও সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং পরিবার গঠন ও পারিবারিক সম্পর্কের অগ্রগতি সাধনসহ ইত্যাদি নানা বিষয় ও সমস্যাবলীর একটি ইসলামিক সমাজতাত্ত্বিক কার্যকরী সমাধানের প্রয়োজন। যার মাধ্যমে দিক- দিগন্তের মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সকল চ্যালেঞ্জ আর প্রতিরোধের মোকাবেলা করে ইসলামী তালিম-তারবিয়াত, শিক্ষা দীক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

শিক্ষক পরিবারের সহযোগী

শিশুদের তালিম-তারবিয়াত শিক্ষা-দীক্ষা দান, আত্মিক ও মানসিক অনুপ্রেরণা দান এবং সার্বিক কল্যাণ কামনা একমাত্র বাবা-মা, অভিভাবক ও পরিবারই সর্বাধিকভাবে করে থাকে। তার পাশাপাশি শিক্ষকেরা তাদের সহযোগী হিসেবে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে। তারাই বাবা-মা ও পরিবারের ন্যায় শিশুদের তালিম-তারবিয়াত এবং আত্মিক-মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারে। কারণ, বর্তমান সমাজ সাধারণত তাদের হাতে শিশু সন্তানদের ন্যস্ত করে দেন। শিক্ষকরাই তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে তাদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করে থাকেন।

এজন্য শিক্ষকদের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তার প্রভাব শিশুদের উপর পড়ে থাকে। বাবা-মা ও পরিবারের তালিম-তারবিয়াত আর চেষ্টা প্রচেষ্টার নিয়ম পদ্ধতি যদি শিক্ষকের তালিম-তারবিয়াত, নিয়ম-পদ্ধতির সাথে মিলে যায় বা বিপরীত ধর্মী না হয়, তাহলে খুব সহজেই তাদের তালিম-তারবিয়াত ও চেষ্টা প্রচেষ্টা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে সুফল বয়ে নিয়ে আসবে।

কিন্তু বর্তমান উন্নয়নশীল বিশ্বে শিক্ষকদের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিম তারবিয়াত ও শিক্ষা-পদ্ধতিগত দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ভুলভ্রান্তি ইত্যাদি এবং পশ্চিমা পরিকল্পনার অন্ধ অনুকরণের ফলে শিশুদের তালিম-তারবিয়াতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। নানা ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে আমাদের সন্তান ও শিশুদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ আশানুরূপ হচ্ছে না।

www.pathagar.com

এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষক এবং সাধারণ শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক বিষয়ক সমস্যায় দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি এবং শিক্ষা বিষয়ক নিয়ম-নীতি, সিস্টেম পদ্ধতি ইত্যাদি জাতির বিবেকবান ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং সার্বিক দিক বিবেচনা করে সকলের সমন্বয়ে যথাযথ একটি সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। যাতে আমাদের শিশু সন্তানদেরকে সঠিকভাবে তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়।

একজন শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা ও পরিবারের ন্যায় ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা শিশু সন্তানের সার্বিক কল্যাণ কামনা করে সঠিক তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে তাকে সফলতায় পৌঁছিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একজন শিক্ষক একটি শিশুকে ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতায় পৌঁছানোর ভূমিকা পালন করতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিজের ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবনসহ সার্বিক বিষয় পরিতৃপ্ত ও সচেতন না হবে, তেমনিভাবে তালিম তারবিয়াত, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, সিলেবাস, ক্যারিকুলাম, নিয়ম-পদ্ধতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকবে।

এজন্য জাতির বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ, চিন্তাবিদ, গবেষক, পরিশোধক এবং শিক্ষাবিদদেরকে অবশ্যই শিক্ষকদের সার্বিক মান-উন্নয়নসহ সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দুরীভূত করার জন্য একান্ত সহযোগিতা করতে হবে।

ধর্মীয় বক্তব্য : জ্ঞান ও অনুভূতির সম্পর্ক

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শেষ নেই। প্রতিদিন নিত্য নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিস্কার, উন্নতি অগ্রগতি আর অগ্রযাত্রা চলছে। পৃথিবীর মানুষ আজীবন জ্ঞান বিজ্ঞানের পিছনে লেগেই আছে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুসন্ধান চলছেই। এজন্যই বলা হয় 'জন্ম থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে হবে'। কিন্তু মানুষের আবেগ অনুভূতি ও বিবেকের রয়েছে একটি সীমারেখা ও পরিধি। মানুষের বয়সের স্তর অনুযায়ী তার আবেগ-অনুভূতি ও বিবেক হয়ে থাকে। এ জন্য মানুষের আবেগ অনুভূতি আর বিবেকটাই জ্ঞান বিজ্ঞান এবং তালিম-তারবিয়াতের মূলভিত্তি হয়ে থাকে। এমনকি তার আখলাক-চরিত্র, আকিদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নির্ভর করে তার বিবেক ও আবেগ অনুভূতির উপর। এজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও বিবেকের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই শিশুদের তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এমনকি কুরআন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুদের বয়সের স্তর অনুযায়ী এবং তাদের

www.pathagar.com

আত্মিক ও মানসিক যোগ্যতানুযায়ী তালিম- তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্যই বলা হয় 'স্থান ও কাল অনুযায়ী বক্তব্য হয়ে থাকে' (لكل مقام مقال)।

মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও বিবেকের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ককে বাস্তব একটি উদাহরণের সাথে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, কীভাবে মানুষের অনুভূতির উপর তার অর্জিত বা তার উপর পতিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন আমাদের সমাজের ধর্মীয় জ্ঞান-প্রদানের অবস্থা বা পদ্ধতি হচ্ছে শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার সময় প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমেই তাকে কুরআনের ৩০তম পারাকে এলোমেলো ও অপরকল্পিতভাবে শিখতে দেয়া হয়। তারা মনে করে ৩০তম পারার সূরাগুলো ছোট ছোট হওয়ার কারণে সহজেই শিশুরা মুখস্ত ও আত্মস্ত করতে পারবে। অথচ তারা অন্যদিকটি খেয়াল করেনি যে শিশুর আবেগ-অনুভূতি ও বিবেক কতটুকু হয়েছে, সে ভালভাবে কথাই বলতে পারছে না। আর কুরআনের ৩০তম পারার অধিকাংশ সূরা ইলমে গায়েব ও আক্বিদা সংক্রান্ত মাক্কি সূরা, সেগুলো কীভাবে শিশুরা তার ক্ষুদ্র বিবেক দিয়ে অনুধাবন করতে পারবে। এজন্য শিশুদেরকে তার বিবেক অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

পবিত্র কুরআনের ৩০তম পারার মাক্কী সূরাগুলোতে অধিকাংশ আয়াতেই কাফের, মুশরিক, সীমালঙ্ঘনকারী হঠকারী ও আল্লাহ রাসূল ও কুরআন তথা অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের অস্বীকার ও হঠকারিতার ইহকালীন পরিণাম আল্লাহর আজাব, গজব ও শাস্তি এবং পরকালীন ভয়াবহ পরিণাম জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অত্যন্ত সাবলীল ও অলংকৃত ভাষার মাধ্যমে তাদের হঠকারিতা আর সীমালঙ্ঘনের প্রতি ধমক ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেগুলো একজন বিবেকবান ব্যক্তির জন্যও সহজসাধ্য নয়। প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন, তাদের সামনে কাফের মুশরিক ও সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম তুলে ধরার প্রয়োজন। যাতে তারা সে বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করে সেখানে গভীর চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও গবেষণা করতে পারে। নিজেকে এ ভয়াবহ পরিণাম আল্লাহর আযাব, গজব ও শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে। নিজেদের কল্যাণের পথ বেছে নিতে পারে।

কিন্তু যদি কুরআনের বর্ণিত কাফের মুশরিক ও সীমালঙ্ঘন কাফেরদের অবস্থা, তাদের শাস্তি, আজাব ও গজব এবং তাদের সম্পর্কে ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের বক্তব্যটি ছোট শিশুদের অনুধাবন তো দূরের কথা, যে ভালভাবে কথা বলতে পারছে না, সে কীভাবে কুরআনের এ বক্তব্যটি অনুধাবন করতে পারবে, কীভাবে আল্লাহর এ ডাকে সাড়া দিবে। বরং তার সামনে এ বক্তব্যটি তুলে ধরলে বা শিক্ষা দিলে শিশুর হৃদয়ে ভয়-ভীতি আর

www.pathagar.com

ত্রাসের সঞ্চার হবে। তার আত্মিক ও মানসিক অনুভূতি হ্রাস পাবে। তার বিবেক বুদ্ধি, বীরত্ব ও সাহসিকতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তার ভেতরে চেতনা ও উদ্ভাবনী শক্তি জন্মাবে না। তার পুরো জীবনটাই ভীতির সম্মুখীন হয়ে যাবে। সে না পারবে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে, না পারবে স্বয়ং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে। না পারবে পরকালে মুক্তির জন্য পুঁজি সংগ্রহ করতে, অথচ আল্লাহ মুমিনদেরকে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য। যদিও সে চুরি করে, ব্যভিচার করে।

রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন; হজরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন; রাসূল ﷺ এরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিল, তার সাথে কাউকে শরিক করল না, সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। আবু দারদা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যদি চুরি করে এবং যদি সে ব্যভিচার করে? রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে ব্যভিচার করে। আমি আবারও বললাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে ব্যভিচার করে? রাসূল ﷺ বললেন, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে ব্যাভিচার করে। আমি আবার বললাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে ব্যভিচার করে? রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, যদিও সে চুরি করে যদিও সে ব্যভিচার করে। যদিও আবু দারদার তা অপছন্দ। (মুসনাদে ইমাম আহমদ) কারণ আল্লাহ তার বান্দার আমলসমূহ সামগ্রিকভাবে বিচার করবেন। শুধুমাত্র পাপের বিচারই করবেন না। বরং পাপ-পূণ্য উভয়ের হিসাব নিবেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন :

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾

"পূণ্যকাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটা এক মহা স্মারক।" (সূরা হুদ : ১১/১১৪)

হতে পারে অমুক মানুষেরই তার পাপ কর্ম পূণ্য কাজের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। হতে পারে অনেক মানুষেরই পূণ্য কাজ পাপ কর্মের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। সে জান্নাতে শান্তিতে বসবাস করবে। এজন্য শিশুদেরকে শিশু বয়সে কুরআনের এ ধরনের ভীতিমূলক বক্তব্য ও তালিম-তারবিয়াত প্রদান তার দায়িত্ব-অনুভূতি হ্রাস করে পাপ কাজের প্রতি ধাবিত করে ফেলতে পারে। এজন্য শিশুদেরকে এ ধরনের ভীতিমূলক নেতিবাচক বক্তব্য শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে কাফের মুশরিক আর সীমালঙ্ঘনকারীদের আজাব-গজব আর শাস্তির কথা এবং তাদের সম্পর্কে ধমক ও ভীতির কথা শোনানোর প্রয়োজন নেই। বরং তাদের বয়সের স্তর ও বিবেক-অনুভূতি অনুযায়ী তালিম-তারবিয়াত প্রদান ও ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে।

www.pathagar.com

সুতরাং বাবা-মা অভিভাবক ও মুরব্বীদের উচিত ও কর্তব্য হচ্ছে যে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের তালিম-তারবিয়াত ও জ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ও রাসূলের আদর্শ ও দিক নির্দেশনাকে অনুসরণ করতে হবে। সে মূলনীতি ও দিক নির্দেশনার আলোকে তাদের সন্তানদের বয়সের স্তর ও বিবেক- অনুভূতি অনুযায়ী জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করতে হবে। এহিসেবে শিশুদের সামনে ধর্ম ও আল কুরআনের সেসব অংশ ও আয়াত শিখাতে হবে, যে সব আয়াত ও অংশ তাদের অনুভূতি ও বিবেক সমর্থন করতে পারে, অনুধাবন করতে পারে। তাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহ ও তার রাসূলের ঈমান, বিশ্বাস এবং ইসলাম ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে, সেসব আয়াত প্রথমে তাদেরকে শিখাতে হবে। তারপর যখন শিশু তার বয়সের দ্বিতীয় স্তরে পৌছে যাবে, মোটামুটি ভালমন্দ পার্থক্য করতে পারবে ; তখন তাকে ভাল কাজের আদেশ, খারাপ কাজের নিষেধ এবং সাধারণ ছোটখাট পাপ করা যেমন মিথ্যা বলা, অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা ও ভাল কাজের অনুপ্রেরণা দানকারী আয়াত ও সূরাসমূহ শিক্ষা দিতে হবে। যাতে তার হৃদয়ে কোন ধরনের ভয়ভীতির সঞ্চার না হয়ে ভাল কাজের প্রতি নিজেকে অভ্যস্থ করতে পারে। তারপর যখন বয়সের তৃতীয় স্তরে পৌছাবে, তখন তাকে বড় বড় পাপ কাজ ও অশালীন আচার ব্যবহার থেকে বিরত রাখা, নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কীয় আয়াত এবং কোন কারণে ভুল হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, তাওবা- ইস্তেগফার ও আল্লাহর রহমত কামনামূলক আয়াতগুলো শিক্ষা দিতে হবে। যাতে তার মধ্যে কোন ধরনের সন্ত্রাসমূলক প্রভাব বিস্তার না হয় এবং তার দায়িত্বের প্রতি সচেতন হতে পারে। তারপর যখন শিশুপ্রাপ্ত বয়সে পরিণত হবে, তখন তার সামনে তার দায়িত্ব-কর্তব্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আয়াত এবং দায়িত্ব অনুভূতিতে ফাঁকি দিলে বা যথাযথভাবে আদায় না করলে তার পরিণতি ও আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি আজাব গজব ইত্যাদি সম্পর্কীয় আয়াত ও সূরাগুলো শিক্ষা দিতে হবে। যাতে একটি শিশু সার্বিক দিক দিয়ে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেতনতামূলক মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। যেমনিভাবে গড়ে তুলেছিলেন রাসূল ﷺ তার সাহাবাদেরকে তথা গোটা আরবজাতিকে। তারা তাদের নিজেদেরকে গঠন করে তাদের শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতা দিয়ে যথাযথভাবে বীরত্বের সাথে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

শিশুদের তালিম-তারবিয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক একটি বিষয়, যার মাধ্যমে শিশুদেরকে সঠিক ইমান আকিদা, আখলাক-চরিত্র, ধর্ম-বিশ্বাস এবং আত্মিক-মানসিক ও জৈবিক বিকাশ সাধন করা যায়। এজন্য শিশুদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ এবং তালিম-তারবিয়াত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সর্বক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর

www.pathagar.com

কোমল ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী তাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। তাহলেই তাদের থেকে ভয়ভীতি, ত্রাসসহ সকল প্রকার নেতিবাচক প্রভাব দুরীভূত হয়ে সম্মান-মর্যাদা, বীরত্ব, ইতিবাচক প্রভাব ও কোমল মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠবে এবং সমাজের দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করবে।

এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই শিশুদের তালিম-তারবিয়াতের ক্ষেত্রে তাদের বিবেক অনুভূতির সাথে জ্ঞানের সম্পর্ককে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে। এমনকি কুরআন শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে সে বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা। তার বয়সের স্তর অনুযায়ী এবং আত্মিক ও মানসিক যোগ্যতা ও বিবেক অনুপাতে প্রথমে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালবাসা, দেশ- জাতির মহব্বত, ইমান-বিশ্বাস, আকিদা সম্পর্কীয় আয়াত ও সুরাগুলো শিক্ষা দেয়া। তারপর তাকে উত্তম আমল-আখলাক, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। তারপর তাকে তার উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে এবং দায়িত্ব কর্তব্য অনাদায়ে তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি, গজব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনমূলক আয়াত ও সূরাগুলো শিক্ষা দিতে হবে। তাহলে একটি শিশু তার আত্মিক ও মানসিক যে কোন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব এবং ভয়ভীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে নিজেকে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন সঠিক মুমিন মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্‌র সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে।

এভাবে যদি প্রতিটি বিষয়ে তালিম-তারবিয়াত, সভ্যতা-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সহ সবকিছুই শিশুদের বয়সের স্তর অনুযায়ী এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধি-অনুভূতি শক্তি অনুযায়ী প্রদান করা হয় তাহলে প্রতিটি শিশু আত্মিক ও মানসিক-সহ সার্বিক বিষয়ে ইতিবাচক যোগ্যতা ও প্রভাব নিয়ে বেড়ে উঠবে। এটিই হচ্ছে রাসূল ﷺ প্রদর্শিত শিশু শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের মূল ভিত্তি ও লক্ষ্য। সে বিষয়টি আমাদেরকে ভাল ও গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। শিশু-শিক্ষা তথা আমাদের তালিম তারবিয়াতের কারিকুলাম ও সিলেবাস দেশ-জাতি, গোত্র-বংশ নির্বিশেষে সকলের জন্য বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে নারী-পুরুষ, জাতি-গোষ্ঠী উত্তম, অধম ইত্যাদির কোন ভেদাভেদ নেই, সকলেই ভাই ভাই একই আদমের সন্তান, সকলেই মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের সৈনিক।

এজন্য মুসলিম উম্মাহ ও সকল জাতি গোষ্ঠীর অভিভাবক, মুরুব্বী, চিন্তাবিদ গবেষক, শিক্ষক, সংস্কারক ও পরিশোধকদের ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে এবং সংগঠন ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশু বিষয়ক তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শিশুদের আত্মিক মানসিক ও মৌলিক বিকাশ ঘটিয়ে তাদের শক্তিশালী করে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ভিত্তি মজবুত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বমহলে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মুরুব্বী চিন্তাবিদ, সাংস্কৃতিবিদ, সংস্কারক, সংস্কারক ও চিন্তাবিদদেরকে সাধারণ শিক্ষক, সাধারণ প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদ্রাসা-মক্তব ও পরিবারকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের জন্য সঠিক ঈমান আকিদা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আমল-আখলাক ইত্যাদি বিষয়ে বইপুস্তক প্রকাশসহ আদব-শিষ্টাচারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। একজন ব্যক্তিকে যখন সঠিক ঈমান আকিদা-আখলাক-চরিত্র ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসহ গোটা সমাজ এমনিতেই সংশোধন হয়ে যাবে। ইসলামের ভিত্তি মজবুত হয়ে যাবে। সকলেই তখন সঠিক ইসলামী মূল্যবোধ, মূলনীতি ও সংগঠনের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেবে।

এমনকি তখন মানুষের কথার সাথে কাজের মিল থাকবে। তাদের চিন্তা-চেতনার সাথে বাস্তবতার সম্পর্ক থাকবে। সকলেই একযোগে সাহায্য সহযোগিতা আর পরামর্শভিত্তিক সামাজিক কাজ শুরু করে দেবে। তখনই বলিষ্ঠ, যোগ্যতাসম্পন্ন, সম্মানীত মুমিন মুসলিম নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে।

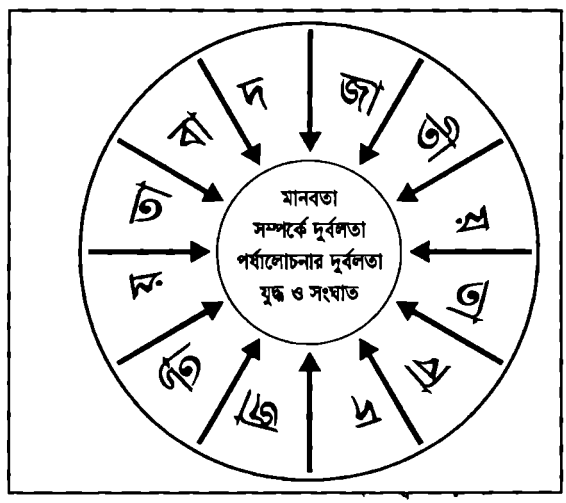

সাংস্কৃতিক ও মানবিক সংগ্রাম

সম্মুখ যুদ্ধ

চিত্র নং ৯

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাজের পরিকল্পনা

কর্ম-পদ্ধতি : প্রতিটি কাজ বাস্তবায়নের জন্য সূক্ষ্ম দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলো একটি আরেকটির পরিপূরক হিসেবে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্তভাবে সমাধান করতে হবে। যাতে আশানুরূপ ফলাফল লাভ করা যায়।

আর শিশু-বিষয়ক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর আত্মিক ও মানসিকভাবে পরিবর্তন সাধন করে সঠিকভাবে গঠন করা। যাতে শিশুর আত্মা, মনমানসিকতা ও চিন্তাধারা সঠিক, বলিষ্ঠ, শক্তিশালী, তীক্ষ্ণ মেধাবী এবং গঠনমূলকভাবে নিরাপদে গড়ে ওঠে। এটিই হচ্ছে মুসলিম চিন্তাধারার পুনর্গঠন।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সেই রেসালাতের ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে ইসলাম ও আলকুরআনের বাণীর দিকে ফিরে যেতে হবে। রাসূল ﷺ এর প্রদর্শিত পথ ও পদ্ধতিকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। সেই মূলনীতি ও পদ্ধতির আলোকে শিশুর অন্তরে আত্মিক ও মানসিক পরিশুদ্ধির বীজ বপন করতে হবে এবং জাতিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সঠিক ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

আর তা তখনই সম্ভব, যখন মুসলিম ও ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে মুসলমানদের অজ্ঞতা, মূর্খতা, পশ্চাদপদতা, বিভেদ ও বিভ্রান্তি ইত্যাদি কারণে ঢুকে যাওয়া অপসংস্কৃতি ও রুগ্ন চিন্তাধারা পরিপূর্ণভাবে পরিশোধিত হবে।

চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিবিদদের সচেতনতা

উপরিউক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতির অবক্ষয় এবং ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, তত্ত্ব ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। যদিও এ বিষয়ে অনেক চিন্তাবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিবিদ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে খ্যাতিমান হয়েছেন। জাতিকে সেই অবক্ষয় থেকে তুলে আনার জন্য বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত এড়িয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাদের এ পরিশ্রম আশানুরূপ ফলপ্রসু হয় নি। তাঁরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারে নি। কারণ, তাদের পরিকল্পনা ও পরিশ্রমে সামগ্রিক দিক বিবেচনা করা হয় নি। তাদের পরিকল্পনায় সামাজিক, আত্মিক, মানসিক ও প্রাকৃতিক

www.pathagar.com

বিষয়াবলী স্থান পায় নি। তার কারণ হচ্ছে মুসলিম চিন্তা-চেতনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে গ্রিক অধিবিদ্যার প্রভাব বিস্তার ও আগ্রাসন। যে আগ্রাসন মুসলিম জাতিকে আত্মিক-মানসিক ও ধর্মীয় দিক থেকে দুর্বল করে মুসলিম বিশ্বে স্বৈরাচারমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। যার কারণে মুসলিম ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার, সম্মান-মর্যাদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার জন্য অধিকাংশ মুসলিম মনীষী ও উলামাগণ স্বৈরাচারমূলক রাজনীতির প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন। দেখা দিয়েছিল রাজনৈতিক সংঘাত। যে সংঘাত অতীতের ন্যায় আজ পর্যন্ত বিরাজমান। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য দল উপদল। প্রত্যেকটি দল-উপদল তাদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সমর্থক সহযোগী, কর্মী ও সদস্য বৃদ্ধিকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যার কারণে কোন দল উপদল বা সংগঠনই শিক্ষা-দীক্ষা, তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে জাতির পুনর্গঠনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয় নি। তেমনিভাবে তারা গুরুত্ব দেয় নি সঠিকভাবে পরিবার গঠনের বিষয়টিকে। তাই শিশু শিক্ষা ও পরিবার গঠনের বিষয়গুলো অবহেলার মধ্যে পড়েই রইল। অথচ মানুষের আত্মিক, মানসিক ও সামাজিক গঠন ও উন্নয়ন নির্ভর করে সঠিকভাবে পরিবার গঠন ও শিশু শিক্ষার উপর।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে পুনর্গঠন করতে হলে এবং জাতির মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে হলে, অবশ্যই ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ গবেষক ও সংস্কৃতিবিদদেরকে ঈমান, ইসলাম, একত্ববাদ, ও খেলাফতের ভিত্তিতে শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিশু-শিক্ষা ও শিশু-পরিচর্যার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তেমনিভাবে গুরুত্ব দিতে হবে পরিবার গঠনের বিষয়টিকে। কারণ, পরিবারই হচ্ছে শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশের একমাত্র প্রথম আশ্রয়।

সুতরাং যখন ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিবিদগণ শিশু-শিক্ষা ও পরিচর্যা এবং পরিবার গঠনের বিষয়টিকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়ে আন্তরিকতার সাথে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে শিশু শিক্ষা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করে শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করতে পারবেন এবং ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংস্কার সাধন করতে পারবেন; তখনই এক পর্যায়ে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পরিবর্তন ও জাগরণ সৃষ্টি সম্ভব হবে। যার বাস্তব প্রমাণ রয়েছে হজরত মূসা (আ.) এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এর জাতি গঠনে। হজরত মূসা (আ.) সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। তেমনিভাবে হজরত মুহাম্মদ ﷺ

www.pathagar.com

এমন একটি অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় জাতি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যে জাতি থেকে সমসাময়িক জাতি ও গোষ্ঠীগুলো শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। তেমনিভাবে আমরা আমাদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের দিকে তাকালে অনুধাবন করতে পারি যে, ওদের তুলনায় আমাদের মাঝে কেমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

এসব কিছু প্রমাণ করে যে, আমরা যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আমাদের কাজ চালিয়ে যাই, তাহলে অদূরভবিষ্যতে ৪০-৫০ (চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ) বছরের মধ্যেই জাতির পরিবর্তন এবং মুসলিম উম্মাহর পরিবর্তন ও জাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব। ইনশাল্লাহ, আল্লাহর পক্ষে এ ধরনের পরিবর্তন ও জাগরণ সৃষ্টি করা কঠিন কোন ব্যাপার নয়।

সামাজিক ইসলামিক চিন্তাধারার অগ্রগতি

ইলমে ওহি ও আল-কুরআনের দিক নির্দেশনাকে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও সক্রিয়করণের মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনার পরিশোধনের পক্ষে যদিও যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ, থিসিস ও রচনাসহ অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকদের সমাজ বিচ্ছিন্নতা এবং অনুসরণমূলক (تقليدي) অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফলে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাচেতনার পরিশোধন ও সংস্কার সাধনে তেমন অগ্রগতি হয় নি।

এজন্য মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সুস্থ বিবেক ও চিন্তাবিদদের ভবিষ্যত প্রজন্ম থেকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতি গঠনের লক্ষ্যে সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে সামাজিক ইসলামিক চিন্তাধারাকে বেগবান করতে হবে। এরই মধ্য দিয়ে সার্বিকভাবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার বাস্তবায়ন করে ইলমে ওহি ও আল-কুরআনের দিক-নির্দেশনাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হবে। এরই ভিত্তিতে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে পরিশোধন করে প্রতিনিধিত্বমূলক ভারসাম্যপূর্ণ একটি জাতি গঠন করতে সক্ষম হবে।

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পরিশোধনের লক্ষ্যে যারা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যদিও শিশু শিক্ষা ও পরিচর্যার বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে সফলতা অর্জন করতে পারেন নি ; তাদের অন্যতম একজন হচ্ছেন ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (৫০৫ হিজরী, ১১১১খ্রি.)। তিনি ধর্ম এবং যুক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের

www.pathagar.com

লক্ষ্যে তার বিখ্যাত কিতাব 'তাহাফুতুল ফালাসাফাহ (تهافة الفلاسفة) রচনা করেছেন। তাতে তিনি শিক্ষার সংস্কারের দিকটিও তুলে ধরেছেন। তেমনিভাবে তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ইহয়াউ লুমুদ্দীন' (إحياء علوم الدين) রচনা করেছেন, তাতে তিনি ভাব-উদ্দীপক যুক্তি ও শরিয়তের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার এ পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা জাতির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারে নি। কারণ, সফলতা নির্ভর করে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাথে সঠিকভাবে সমন্বয় সাধন এবং শিশু শিক্ষার মাধ্যমে জাতির অত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধনের উপর। অথচ তার লিখনির মধ্যে সে বিষয়টি স্থান পায়-নি।

তেমনিভাবে তাদের আরো একজন ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ইমাম তাকীউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়াহ (৭২৮হিঃ/১৩২৮খ্রি.)। যিনি মানুষের সঠিক আকিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তার গবেষণা ও লেখনিতে মানুষের বিতর্কিত আকিদার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। কিন্তু তার গবেষণা ও লেখনিতে শিশু শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে জাতি গঠনের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায় নি। যার ফলে তার লেখনি ও গবেষণার মাধ্যমে যারা প্রভাবিত হয়েছে তাঁরাও সে দিকটি অনুধাবন করতে পারে নি এবং গুরুত্ব দেয় নি।

তাদের অন্তর্ভুক্ত আরো দু'জন ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ইমাম আলী ইবনে আহমদ ইবনে হাজম (১০৬৪খ্রি.) এবং আল্লামা আবু যায়েদ আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন (১৪০৬খ্রি.) যারা সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলীকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সে বিষয়ে সিলেবাস কারিকুলাম ইত্যাদি তৈরি করেছেন। কিন্তু তাদের এ চিন্তাধারা ও গবেষণা জাতির পরিবর্তনে ও পুনর্গঠনে তেমন কাজে আসে নি। কারণ, তারাও শিশু-বিষয়ক তালিম-তারবিয়াত ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন নি।

আর মুতা-আখখিরিন (متأخرين) বা নবযুগে যারা এ বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন, তাদের অন্যতম হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহু (الإمام محمد عبده ১৯০৫)খ্রি.) এবং আল-মানার পত্রিকা সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও তাদের ছাত্রবৃন্দ, যারা মানুষের সঠিক ইসলামী আকিদা, ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনাকে অপসংস্কৃতি-বিকৃতি, নোংরামি, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি থেকে মুক্ত করার বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

তেমনি একজন হলেন শায়েখ আব্দর রহমান কাওয়াকিবী (১৯০২খ্রি.)। যিনি রাজনৈতিক দিকটিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে

www.pathagar.com

ইসলামী মূলনীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টাও আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নি এবং লক্ষস্থলে পৌছতে পারে নি। কারণ, তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুধুমাত্র বয়স্কদেরকে লক্ষ্য করে সীমিত ছিল। তিনি তার গবেষণায় শিশুর অন্তরে জাতির পুনর্গঠনের বীজ বপন করতে পারেন নি।

অতএব উপরিউক্ত ইসলামিক চিন্তাবিদ ও ব্যক্তিত্বের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম, কুরআনের দিক-নির্দেশনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করে জাতির জাগরণ সৃষ্টি করে তাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পারে নি। কারণ, একদিকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকদের তাকলিদী (تقليدي) চিন্তা-চেতনা ইসলামী চিন্তাবিদ ও ব্যক্তিত্বের চিন্তা-চেতনা স্থবির করে দিয়েছে, অপরদিকে পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা ও প্রভাব এখনও অবাধ অপ্রতিরোধ্য অবস্থায় চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে জাতির আকিদা বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিশোধন ও মুসলিম উম্মাহ্‌র জাগরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা, পরিশ্রম ও দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মানুষের হৃদয়ে কোন পরিবর্তন আসছে না। আসছে না জাতির সচেতনতা ও জাগরণ।

সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই উপরিউক্ত সমস্যাগুলো জেনে বুঝে এবং সঠিকভাবে অনুধাবন করে সংস্কার, পরিশোধন ও ইসলামীকরণের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও চিন্তা জগতে এলোমেলোভাবে সাময়িকের জন্য কাজ করলে চলবে না। বরং সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে ইলমে ওহি ও আল কুরআনের দিক-নির্দেশনাকে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করে সংস্কার ও পরিশোধনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই সফলতার দ্বারপ্রান্তে ও লক্ষ্যস্তলে পৌছানো সম্ভব হবে।

সাংস্কৃতিক পরিশোধন

ইসলামিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিশোধনের জন্য অবশ্যই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে যুক্তি ও চিন্তা জগতের মূলভিত্তির সংস্কার ও পরিশোধন করতে হবে। কারণ, এটিই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্‌র আত্মিক, মানসিক ও বৈষয়িকভাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যম এবং তালিম-তারবিয়াতের উপায়।

সাংস্কৃতিক পরিশোধনের জন্য অবশ্যই ইসলামি মূল্যবোধ, মূলনীতি ও ভাব- ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত করে জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির পরিশোধনের প্রাথমিক দ্বার উন্মোচিত হবে। এ পথ

www.pathagar.com

ধরেই ইলমে ওহি ও কুরআনের দিক-নির্দেশনাকে সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতে হবে। এ পদ্ধতিতে চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকল প্রকার অপসংস্কৃতি, বিচ্যুতি, ভোজবাজি ও কল্পকাহিনী থেকে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিশোধন করা যাবে। হেফাজত করা যাবে সকল নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিবেক, বুদ্ধি, মেধা ও চিন্তাশক্তিকে।

বর্ণগত, জাতিগত ও গোষ্ঠীগত বৈষম্য দূর করে খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে মুসলিম উম্মাহর হক। ফিরে পাবে আত্মিক ও মানসিক চেতনা ও শক্তি। কারণ, যে জাতির মধ্যে আত্মিক শক্তি নেই, খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের চেতনা নেই; সে জাতি অসার ও দুর্বল। সে জাতি কখনো প্রতিবন্ধকতা, বিরোধিতা আর দুর্যোগের মোকাবেলা করে সফলতা অর্জন করতে ও লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পারে না। সে সমাজের শেষ পরিণতি হবে পরাজয়, ধ্বংস, বিভ্রান্তি আর আত্মাহুতি।

সুতরাং জাতির উন্নয়ন ও মুসলিম উম্মাহর পুনর্গঠনের জন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিশোধন অত্যাবশ্যকীয়।

শিক্ষা-বিষয়ক সংস্কার

মুসলিম উম্মাহ তথা জাতির পরিবর্তন ও জাগরণের জন্য শুধুমাত্র শিক্ষা- বিষষয়ক সংস্কার যথেষ্ট নয়। বরং জাতির পরিবর্তন ও পুনর্গঠন করতে হলে অবশ্যই শিক্ষার সাথে তার আত্মিক, মানসিক ও বৈষয়িক দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ, মানুষ জাতি আবেগ, অনুভূতি, উপলব্ধি ও বিবেকের সমন্বয়ে গঠিত। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এসবগুলো দিক এক সাথে বিবেচনায় না আনা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতির আশানুরূপ পরিবর্তন, জাগরণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব হবে না। সুতরাং জাতির জাগরণের জন্য এখানে ইসলামী ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে ইতিবাচক ভূমিকা পেতে হলে, অবশ্যই তাকে শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সাথে আত্মিক, মানসিক ও বৈষয়িকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। শুধুমাত্র তার শিক্ষাগত যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়। বরং শুধু তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ততটুকু কাজে আসবে, যতটুকু একটি গাধা তার শক্তি অনুযায়ী বোঝা বহন করতে পারে। অথবা তার উদাহরণ ঐ ধূমপায়ী ডাক্তারের মত, যে ধূমপানের ক্ষতিকারক দিকগুলো খুব ভালো করে জানা সত্ত্বেও ধূমপান থেকে বিরত থাকে না। কারণ, সে শুধু শিক্ষা অর্জন করেছে, কিন্তু অন্যান্য দিকগুলোর সাথে সমন্বয় করে বাস্তবে পরিণত করে নি। অথবা তার উদাহরণ ঐ মদ্যপায়ীর মত যে তার ক্ষতিকারক দিকগুলো খুব ভালভাবে জানে। কিন্তু তার পরেও জৈবিক ও মানবিক দুর্বলতার কারণে বিরত থাকতে পারে নি।

www.pathagar.com

তার জ্ঞান ও শিক্ষা কোন কাজে আসে নি। সুতরাং ঐ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করতে হলে একজন ব্যক্তি কিংবা জাতিকে অবশ্যই শিক্ষার সাথে সাথে আত্মিক, মানসিক ও জৈবিকভাবে গঠন করতে হবে।

এ জন্যই শিশুর আত্মিক, মানসিক ও বৈষয়িক বিকাশ সাধন করতে হলে এবং শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও অগ্রগতি করতে হলে শিশু শিক্ষানীতি ও কারিকুলাম অবশ্যই প্রণয়ন করতে হবে। সেই নীতি ও কারিকুলামের মাধ্যমে শিশুকে তার বাল্য বয়সেই বলিষ্ঠ, বীর, উদ্ভাবক ও সঠিক ঈমানদার হিসেবে গড়ে তুলে একজন নিষ্ঠাবান মুমিন ব্যক্তিত্বে পরিণত করা সম্ভব হবে। কারণ, বাল্যবয়স অতিক্রমের পরপরই মানুষ বাঁকা কাঠের ন্যায় পরিণত হয়। তখন তাকে আর শিক্ষা-দীক্ষা আর তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে সংশোধন করা সম্ভব নয়। বরং তার থেকে নেতিবাচক দিকগুলো দূরীভূত করে আত্মিক, মানসিক ও জৈবিকভাবে সংশোধন করতে হলে, তাকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করতে হবে। এজন্যই এরশাদ হয়েছে, (الناس معادن) অর্থাৎ মানুষ খনির ন্যায়, খনি যে ধরনের হবে ধাতুও সে ধরনের হবে। আরো এরশাদ হয়েছে, (خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জাহিলী যুগে ভাল ও উত্তম ছিল, তারা ইসলামের যুগেও ভাল ও উত্তম হবে যদি তারা দীনী জ্ঞান অর্জন করে। অর্থাৎ শিশুকে বাল্য বয়সে যে শিক্ষা দেয়া হবে, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর সেই ফলাফলই আসবে। এজন্যই শিশুকে বাল্যবয়সেই আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে হবে।

তেমনিভাবে শিশুদের জন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিশোধন হচ্ছে বীজের ন্যায় অর্থাৎ বীজ যেমন নির্ধারণ করে গাছ কী হবে এবং তার ফুল ও ফল কী হতে পারে। তেমিনভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে নির্ধারণ করা যাবে শিশু কী হবে এবং তার থেকে কী আশা করা যাবে। আর শিক্ষা বা তারবিয়াত হচ্ছে গাছে পানি দেয়ার ন্যায়। গাছে যেমন পানি দিলে তরতাজা ও সতেজ হয়, ফুল ও ফল দেয়ার উপযোগী হয় ; তেমনিভাবে শিশুকে বাল্য বয়সে শিক্ষা ও তারবিয়াত দিলে শিশুর আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক বিকাশ ঘটে এবং তার থেকে যথাযথ ফল আসে। আর বীজ থেকে যেমন পানি ও পরিচর্যা ছাড়া ফুল ও ফলের আশা করা যায় না, তেমনি সংস্কৃতির পরিশোধন এবং শিক্ষা ও তারবিয়াত ছাড়া শিশু থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না।

তারবিয়াত পরিবারের শিষ্টাচার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা সংস্কৃতির পরিশোধন এবং শিশু শিক্ষা ও শিশু শিক্ষার কারিকুলাম ও নীতিমালা ইত্যাদির গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারলাম।

www.pathagar.com

তাই এখন ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদেরকে সঠিকভাবে ইসলামী শিষ্টাচার আদব, আখলাক এবং ইসলামিক তত্ত্ব ও ইসলামিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গুরুত্ব সহকারে বাবা-মার অভিভাবকদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে বাবা, মা ও অভিভাবকগণ তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে সঠিকভাবে লালন-পালন করতে পারে এবং সঠিকভাবে পরিবার গঠন করে তাদের সন্তানদেরকে তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে তার আত্মিক-মানসিক ও জৈবিক বিকাশ ঘটাতে পারে। সকল প্রকার অপসংস্কৃতি, ভোজবাজি, কল্পকাহিনী এবং নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত করে চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান, উদ্ভাবক, সাহসী ও মুত্তাকী মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একটি জাতির সম্ভাব্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সাহিত্য, কিচ্ছা, নাটক ও কল্পকাহিনীর যোগসূত্র রয়েছে। একটি জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সাহিত্য, শিষ্টাচার কল্পকাহিনীর মাধ্যমে ফুটে ওঠে এবং সহজেই মানুষকে প্রভাবিত করে। এজন্য কোন জাতির সাহিত্য, গল্প-নাটক ও কল্পকাহিনীর চরিত্র সংকেত ও প্রতীক ইত্যাদিকে ভুল বোঝাবুঝির কারণে একটি জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। যেমন আলিফ লায়লার মত অন্যান্য কল্প কাহিনী ছবি-নাটক ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের মনুষ্য হিংস্রপ্রাণী, সরিসৃপ, অজগরের মত ভয়ংকর প্রাণীর চিত্র, সংকেত এবং দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে ভয় এবং ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং মুসলিম চিন্তাবিদ, গবেষক সাহিত্যিকদেরকে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। জাতির সাহিত্য, শিষ্টাচার বিশেষ করে শিশু সাহিত্য, কল্পকাহিনী, নাটক ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক ও হুশিয়ার থাকতে হবে। শিশুদের জন্য উপযুক্ত সঠিক ও সত্য কিচ্ছা কাহিনী রচনা করতে হবে, যাতে সত্য ও বাস্তব সাহিত্য, নাটক-গল্প ও কল্প-কাহিনীর মাধ্যমে অশ্লীল নোংরা ভ্রান্ত কল্পকাহিনী আর নাটকীয় চিত্র, ধোঁয়া আর মরীচিকার ন্যায় বিলীন হয়ে যায়। সত্যের সামনে মিথ্যার ঠাই হতে পারে না। অত্যন্ত আফসোস ও দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, আমাদের মুসলিম সমাজ এবং আমাদের সন্তানাদিদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কৃষ্টি-কালচার ও মূল্যবোধ ইত্যাদিতে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কৃষ্টি-কালচার ও মূল্যবোধ ইত্যাদিতে নানা ধরনের কুসংস্কার কল্পকাহিনী, মিথ্যা ও ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। যার কারণে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সন্তানদের অন্তরে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে নানা ধরনের ভীতির সঞ্চার ও ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। তাই আমাদেরকে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ভিতরে আবার ঈমানী স্পৃহা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে

www.pathagar.com

হলে এবং মুসলমানদের সন্তানদের সকল ধরনের যুলুম নির্যাতন, নিপীড়ন, অন্যায়, ব্যভিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যোগ্যতা ও সাহসিকতা তৈরি করতে হলে, আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদিকে সকল ধরনের অপসংস্কৃতি, কল্পকাহিনী, মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি থেকে মুক্ত করতে হবে। তাহলেই সকল ধরনের স্বৈরাচার, জবরদস্তি, যুলুম নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আমাদের যুবকরা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠানের শিষ্টাচার

শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল আদব-শিষ্টাচার কেন্দ্রিক সাহিত্য-গবেষণাসহ অন্যান্য বিষয়াবলী এবং শিশু বিষয়ক তালিম তারবিয়াত বিষয়ে অবশ্যই শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দিতে হবে। তেমনিভাবে গুরুত্ব দিতে হবে সঠিকভাবে উপযুক্ত সিলেবাস প্রণয়ন ও বই পুস্তক রচনার বিষয়টিকে। কারণ, একজন শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবারের ন্যায় শিশুর সার্বিক কল্যাণের দিক বিবেচনা করে খুব সহজেই তালিম-তারবিয়াতের ব্যবস্থা করে তার আত্মিক-মানসিক ও জৈবিক বিকাশ সাধন করতে পারেন। অর্থাৎ শিশু শিক্ষা ও তার আত্মিক-মানসিক ও জৈবিক বিকাশের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি পরিবারের সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করতে হবে। এজন্যই শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিক-নির্ভর শিশু বিষয়ক শিক্ষার কারিকুলাম, সিলেবাস প্রণয়ন ও বইপুস্তক রচনার বিষয়াবলীকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

উচ্চ শিক্ষার সংস্কার ও পরিশোধন

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, মূল্যবোধের সংস্কার ও পরিশোধন এবং কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য অবশ্যই আমাদেরকে উচ্চ শিক্ষার সংস্কার ও পরিশোধন করতে হবে। বিশেষ করে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও আধাসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি, কারিকুলাম- সিলেবাস ইত্যাদির সংস্কার ও পরিশোধন করতে হবে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক সংস্কারক ও পরিশোধক তৈরির একমাত্র নির্ভরযোগ্য কারখানা। বিশেষ করে আকাঈদ, আইন, ফিকহ, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সংস্কারের ও পরশোধনের বিকল্প নেই।

এজন্য আমাদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌছতে হলে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার সংস্কার করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি, মূল্যবোধের ভিত্তিতে সার্বিক দিক বিবেচনা

www.pathagar.com

করে উচ্চ শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে। যাতে সেখান থেকেই বিষয়ভিত্তিক ব্যক্তিত্ব ও বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়ে সমাজের সর্বস্তরের অপসংস্কৃতি, নোংরামি ও কলুষতা দূর করে ইসলামী চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতি, সভ্যতা আর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বর্তমান ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারতার ফলে, সংস্কারক, গবেষক ও চিন্তাবিদদের সামনে নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে এবং তাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। তারা এ সকল যোগাযোগ ও মিডিয়ার মাধ্যমে যে কোন বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে গবেষণা পর্যালোচনা ও মতবিনিময় করে তার সঠিক সমাধান ও উচ্চ শিক্ষার সংস্কার ও পরিশোধন করতে পারেন। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির শিক্ষা বিষয়ক অভাব পূরণ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দিতে পারেন।

তেমনিভাবে তারা সেই আধুনিক যোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও পাবলিসিটির মাধ্যমে যারা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও তালিম-তারবিয়াত বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের সামনে তথা মুসলিম উম্মাহর সামনে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, আদব, শিষ্টাচার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ খুব সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। মুসলিম যুবকদের সেগুলো দেখা শোনা, অনুধাবন করা ও বাস্তবায়ন করার প্রতি উৎসাহিত করতে পারে।

যদিও উপরিউক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগের স্বীকার করতে হবে। তবুও ইসলামী চিন্তাবিদ, সাংস্কৃতিবিদ, সংস্কারক ও গবেষকদেরকে সে কাজ করে যেতে হবে। কারণ, বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আধুনিক মিডিয়া এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিণত হয়েছে।

ইসলামিক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিতকরণ এবং জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের উন্মুক্ত চিন্তাধারা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিশোধনের মাধ্যমে জাতিকে আবারও সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান সঠিক অনুধাবন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, অবস্থা ও রূপরেখা সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও অনুধাবন না করা যাবে। যে জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের জন্য বিগত কয়েকদশক থেকে আজ পর্যন্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাতে সকল প্রকার অপসংস্কৃতি, ভ্রান্তি, নোংরামি ও কল্পকাহিনীর থেকে ইসলামী সভ্যতা- সংস্কৃতি, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাকে সংস্কার ও পরিশোধন করা যায়। সুতরাং আমরা যদি শিক্ষার ইসলামীকরণের রূপ রেখাকে সঠিকভাবে

www.pathagar.com

অনুধাবন ও আত্মস্থ করতে পারি, তাহলে আমাদের সংস্কার ও পরিশোধনের কাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাব এবং সহজেই আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারব।

আমরা এখানে জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে যাব না। বরং সংক্ষিপ্তভাবে এখানে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বিষয়ে সামান্য মৌলিক ধারণা প্রদান করা।

প্রতিষ্ঠা ও অগ্রযাত্রা

জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেছিল এমন কয়েকজন যুবক। যারা ইসলামিক জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ ও প্রায়োগিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিল। তাদের এ চিন্তাধারার প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তাদের কর্মতৎপরতা, লেখনি এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধে। তাদের চিন্তা-ধারায় লিখিত প্রথম প্রকাশ হচ্ছে "অর্থনীতিতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি' (نظرية الإسلام الاقتصادية) এবং সমকালীন মিডিয়া ও দর্শন (الفلسفة والوسائل المعاصرة) যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে কায়রোর 'দারুল খালিজী' নামক প্রকাশনী কর্তৃক। তাদের বইগুলো ইসলামী চিন্তাধারা পুনরুজ্জীবিত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ ইসলামী মূলনীতির উপর ভিত্তি করে লিখিত হয়েছিল। অথচ তখনও তারা সরাসরি জাতির জাগরণের জন্য কাজ করতে শুরু করে নি।

তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সভা, সমিতি, প্রোগ্রাম ও কনফারেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে। অর্থাৎ ছয়ের দশকের দিকে, নবগঠিত বিভিন্ন দেশ ও মুসলিম বিশ্ব থেকে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আগত মুসলিম ছাত্রদের সাথে ওদের পরিচয় হয়। তখন তারা তাদেরকে এবং তাদের প্রতিনিধিকে একটি প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ করে। যে প্রোগ্রামের লক্ষ্য ছিল এমন একটি মুসলিম ছাত্র সংস্কৃতি পরিষদ গঠন করা যার মাধ্যমে প্রবাসী মুসলিম যুবক ছাত্রদের ঈমান-আকিদার হেফাজত ও ইসলামী বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ করা, এবং এরই ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির জাগরণ সৃষ্টি করা।

এ প্রোগ্রামের পর তাদের চিন্তা ও কাজের পরিধি প্রসার লাভ করে। তখন তারা মুসলিম উম্মাহ্‌র শিক্ষা, সংস্কৃতি-সভ্যতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধে অধঃপতন ও পাশ্চাৎপদতার কারণ সম্পর্কে অবহিত হয়। তখন তারা চিন্তা জগতের দিকে ধাবিত হয় এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র সভ্যতা সংস্কৃতির পরিশোধন ও তালিম তারবিয়াতের সিলেবাস ও কারিকুলাম আধুনিকীকরণের মাধ্যমে জাতির পুনর্গঠনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। তখন তারা

www.pathagar.com

জাতির জাগরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে নেমে আসে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করে জাতিকে আত্মিক ও মানসিকভাবে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে শুরু করে দেয়।

জাতির পরিবর্তন ও পুনর্গঠনে সেই আশা ও দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সেই যুবকেরা ১৯৬৩ সালে আমেরিকাতে এবং কানাডাতে 'মুসলিম ছাত্র ঐক্য পরিষদ' বা MSA of the US and Canada নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে, যে সংগঠনটি মাত্র একদশক কাল অতিবাহিত হতে না হতেই আমেরিকা ও কানাডার বুকে সর্ববৃহৎ সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাতে যোগ দেয় হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষা-অর্জনে আগত প্রবাসী ছাত্রবৃন্দ। এ সময়ের মধ্যে সে সংগঠনটি ব্যবস্থা করেছিল নানা ধরনের ইসলমিক প্রোগ্রাম, সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম। প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন ধরনের পরিষদ ও সংগঠন। তাদের অন্যতম একটি হচ্ছে 'মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানী পরিষদ" যে সংগঠনটি আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল ১৯৭২ সালে এবং যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল মানবিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের মুসলিম ছাত্রদেরকে একত্র করে তাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ইসলামিক মূল্যবোধ ও মূলনীতিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। যাতে ইসলামী মূল্যবোধ ও মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞানের কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন এবং বই পুস্তক রচনা করা যায়। আর উভয় বিষয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে শিক্ষার একটি পরিভাষা তৈরি করা যায়।

কিন্তু মুসলিম গবেষক ও লেখকদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান গভীরতা ও যোগ্যতার অভাবে তাদের এ চিন্তা-চেতনায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রতিরক্ষামূলক মানসিকতা প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে। যার কারণে ইসলামিক চিন্তাবিদ গবেষক ও সংস্কারক এবং সমকালীন সমাজ বিজ্ঞানী ছাত্রদের মাঝে একটা দূরত্ব তৈরি হয়। অপরদিকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সংস্কারক ও উন্নয়নকামী ব্যক্তিত্বের মাঝেও চিন্তাগত ও দায়িত্বগত দিক থেকে দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। পরবর্তী দশকে আমেরিকাতে প্রবাসী মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। এমনকি অনেক নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয়ের ফলে মুসলিম মেধাবী ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকাতে ভিড় জমায়। যার ফলে মুসলিম ছাত্র ঐক্য পরিষদ আরো প্রসার লাভ করে। তখন ১৯৮০ সালে উত্তর আমেরিকাতে 'ইসলামী পরিষদ' বা Islamic Society of North America সংক্ষেপে ISNA নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল উত্তর আমেরিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ পৌঁছে দেয়া।

www.pathagar.com

১৫০০ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিকে 'ইসলামী চিন্তাধারার সংরক্ষণে, (১৪০১ হিঃ/১৯৮১ইং) সম্পূর্ণভাবে ইসলামিক সভ্যতা, সংস্কৃতি-বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট' নামক প্রতিষ্ঠান। যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী সভ্যতা- সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে সকল ধরনের অপসংস্কৃতি, বিকৃতি, নোংরামি, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি থেকে পরিশোধন করে ইসলামী মূল্যবোধ, চিন্তাধারা ও মূলনীতির ভিত্তিতে জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের কারিকুলাম প্রণয়ন করা এবং মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে আত্মিক-মানসিক জৈবিক ও সামাজিকভাবে পুনর্গঠন করে তাদের মাঝে প্রতিনিধিত্বমূলক উদ্ভাবনী শক্তির স্পৃহা জাগিয়ে তোলা। উপরিক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানী পরিষদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। একটি অন্যটির পরিপূরক ও সহায়ক।

এজন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের বাধা-বিপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত এড়িয়ে অনেক দূর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। তারা জ্ঞান ও শিক্ষাকে শুধুমাত্র বাহ্যিক আকারে প্রতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামীকরণ করে নি। বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনেরও প্রচুর পরিশ্রমের মাধ্যমে ইসলামীকরণের অনেক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির অঙ্গনেও মানুষের জীবন চলার জন্য ইলমে ওহির পথ প্রদর্শন করেছে।

তেমনিভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠান ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় সাড়ে তিনশতের চেয়ে বেশি বইপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা করেছে। আজও তাদের এ রচনা ও প্রকাশনার কাজ অব্যাহত। তাদের রচনা ও প্রকাশনাতে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী ঐতিহ্যকে কীভাবে ব্যবহার করতে ও কাজে লাগাতে হবে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার ও কাজে লাগাতে হবে– সব কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী মূলনীতির আলোকে প্রদান করা হয়েছে। যাতে সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, মানবিক বিজ্ঞানসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে ইসলামীকরণ সম্ভব হয়।

তারা তাদের জ্ঞান ও শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা সংস্থা ও সংগঠনের সহায়তায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও শহরে প্রচুর পরিমাণ জনসংখ্যার উপস্থিতিতে শতশত আলোচনা সভা, সেমিনার সেম্পোজিয়াম করেছে। যাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সকল শাখায় শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের সামনে

www.pathagar.com

সঠিকভাবে পরিশোধিত ও পরিমার্জিত ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উপস্থাপন করা যায়।

এমনকি উক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান, পরিষদ, সমিতি ও ইনষ্টিটিউট গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন ধরনের পত্র- পত্রিকা, বই-পুস্তক, সাময়িকী, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি প্রকাশ করে এবং জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণ ও ইসলামী চিন্তা-ধারার কলম সৈনিক তৈরিকরণ ও কাজে লাগানোর জন্য বিশেষ ধরনের দু'টি সাময়িকী প্রকাশ করে। একটি হচ্ছে আরবী ভাষায় আর আরেকটি হচ্ছে ইংরেজী ভাষায়। আরবী ভাষার সাময়িকীটি হচ্ছে 'জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণ সাময়িকী বা (مجلة إسلامية المعرفة) আর ইংরেজী ভাষার সাময়িকী হচ্ছে American Journal of Islamic Social Sciences. : (المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية) সংক্ষেপে Ajiss নামে পরিচিত।

শিশু-শিক্ষা ও শিশু-পরিচর্যা বিষয়ক বিশেষ প্রতিষ্ঠান

মুসলিম সংস্কৃতি, সভ্যতা ও চিন্তাধারার পরিশোধন ও প্রশস্তকরণের মাধ্যমে জাতিকে কিছু উপহার দিতে হলে যেমনিভাবে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-শিক্ষার ইসলামীকরণের ভীত মজবুত করতে হবে। তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহকে শিশু শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের প্রতি সক্রিয় করতে হবে এবং শিক্ষক, অভিভাবক, নেতা, দায়িত্বশীল চিন্তাবিদ ও গবেষকগণকে তাদের লেখনি, গবেষণা ও সাহিত্য, কর্মে নতুন কিছু তৈরি করার মাধ্যমে জাতিকে অগ্রগতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

মুসলিম উম্মাহ্র পরিশোধন ও সংস্কার সাধনের সফলতা অর্জনের জন্য শিশু-শিক্ষা, তালিম-তারবিয়াত এবং শিক্ষা-বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক গবেষণার একান্ত প্রয়োজন। কারণ, তালিম-তারবিয়াত এবং শিক্ষার উপকরণ সিলেবাস ও মাধ্যম ইত্যাদির উন্নয়ন ব্যতীত যোগ্যতাসম্পন্ন ভারসাম্য জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

আজ শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াত ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্র দুর্বলতা, হীনমন্যতা, পশ্চাদপদতা, বিভ্রান্তি ইত্যাদি ইসলামী চিন্তাধারার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার বাস্তব চিত্র আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার পরিশোধনের কাজে দেখতে পাই। অতীতে অনেক মনীষী, চিন্তাবিদ, গবেষক ও সংস্কারকগণ সে বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারেন নি বরং অক্ষমতা ও অপারগতা স্বীকার করেছেন। তার কারণ হচ্ছে,

www.pathagar.com

তাদের চিন্তাধারায় ও সংস্কার কাজে শিশু-শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াত, নারীর উন্নয়ন-অগ্রগতি এবং শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য উপকরণ মাধ্যম, সিলেবাস ও কারিকুলাম ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় নি। অথচ সে সব বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করাটাই ছিল অধিক যুক্তিযুক্ত ও দূরদর্শী পদক্ষেপ।

মুসলিম উম্মাহ্ এবং জাতির সেবা ও অগ্রগতিতে সংস্কার ও পরিশোধনের ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষা ও তার পরিচর্যা এবং তালিম-তারবিয়াত বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে 'ইসলামী চিন্তাধারামূলক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, (المعهد العالمي للفكر الإسلامي) যে প্রতিষ্ঠানটি তার নিজ তত্ত্বাবধানে, মালয়েশিয়া ইন্টান্যাশনাল ইসলমিক ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞতার আলোকে সুদূর আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠা করেছিল 'শিশু উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' বা (مؤسسة تنمية الطفولة) এবং শিশুদের জন্য উপযুক্ত যুগ-উপযোগী সাহিত্য, বইপুস্তক ইত্যাদি প্রণয়ন করেছিল। যাতে শিশু-শিক্ষা, তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে মুসলিম উম্মাহর উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন করা যায়।

শিশু উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

'ইসলামিক চিন্তাধারামূলক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং 'শিশু উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' সংক্ষেপে (CDF) নামক প্রতিষ্ঠান দুটি তাদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত শিশু-শিক্ষা, তালিম-তারবিয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমে মুসলিম ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে অপসংস্কৃতি, বিকৃতি, ভোজবাজি ও অমার্জিত কল্পকাহিনী থেকে মুক্ত করে মুসলিম উম্মাহকে ঈমান আখলাক, খেলাফত, একত্ববাদ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে আবার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে মুসলিম উম্মাহর বিবেক, চিন্তা-চেতনা এবং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐতিহ্যকে ও শরিয়তের অপব্যাখ্যা, বিকৃতি ও ভুল থেকে হেফাজত করা যায়।

এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হলে এবং মুসলিম উম্মাহ্র বিবেক– বুদ্ধি, চিন্ত াধারা, ঐতিহ্য ও ইসলামী শরিয়তের ভুল ব্যাখ্যা ও ধোঁকাবাজি থেকে হেফাজত করতে হলে শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস যথাযথ সংস্কার করে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আল-কুরআনের মূলনীতি, মূল্যবোধ ও দিক নির্দেশনাকে গ্রহণ করে নিতে হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা আল-কুরআনের মাহাত্ম, ভাবার্থ ও বাস্তব শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে এবং সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের বাস্তব অর্জন ও রহস্য উদঘাটন না করে শুধুমাত্র বাহ্যিক রূপ নিয়ে সংস্কার ও পরিশোধনের কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। যার কারণে তারা সফলতার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারে নি।

www.pathagar.com

কিন্তু বর্তমানে কাজের ধারাবাহিকতা পূর্বের তুলনায় ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বর্তমান প্রজন্ম তাদের পূর্বপুরুষের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলিম উম্মাহ্‌র পশ্চাদ্‌পদতা ও দুর্বলতার কারণ উদঘাটন করে আল-কুরআনের বাস্তব শিক্ষাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রকৃতির সাথে সমন্বয় সাধন করে সঠিক পদ্ধতিতে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে তারা দীর্ঘদিনের স্থবিরতা ও শূন্যতার পরেও নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐতিহ্য রক্ষা ও জাতির জাগরণে সফলতা অর্জন করতে অনেকটা সক্ষম হচ্ছে।

তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রবীণ গবেষক ও চিন্তাবিদগণ, সমাজ বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞানসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা এবং গ্রিক দর্শন ও সভ্যতা এবং তৎকালীন চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফলতায় পৌঁছতে পারে নি। বরং বাস্তব জীবনের অপারগতা আর অশান্তির গ্লানি নিয়ে ফিরে এসেছে। কারণ, তাদের এ প্রচেষ্টায় কোন ধরনের কারিকুলাম ও সঠিক নীতিমালা ও পদ্ধতি ছিল না।

তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোনো শাখা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং মানব সভ্যতার যেকোনো জাতি গোষ্ঠী থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ কারিকুলাম ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। যার মাধ্যমে কোন্ বিজ্ঞানের সাথে কী ধরনের পদ্ধতি এবং কোন্ জাতির জন্য কী ধরনের ব্যবহার ও পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও হেফাজত করা যাবে, তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে।

তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহকে সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে সার্বিক দিক বিবেচনায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে ব্যক্তি গঠন ও সমাজ গঠনের জন্য সেই কারিকুলাম ও নীতিমালার ভিত মজবুতকরণ ও জ্ঞান শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনার ইসলামীকরণ একান্ত প্রয়োজন।

এজন্য মুসলিম চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, গবেষকদেরকে অবশ্যই ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অবিচলতার গুণে গুণান্বিত হয়ে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

তাহলেই মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পুনর্গঠনের জন্য অদূর ভবিষ্যতে, সার্বিক দিক দিয়ে যোগ্য এমন একটি দল বেরিয়ে আসবে, যারা নিজেদেরকে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে, রেসালতের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যাবে। তারাই জাতির নেতৃত্ব দেবে এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলবে। যারা জাতির ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখবে।

www.pathagar.com

বিকল্প ব্যবস্থায় জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা

জ্ঞান ও শিক্ষা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামীকরণের সর্বপ্রথম চেষ্টা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। তারা প্রমাণও করেছিল যে তাদের এ পরিকল্পনানুযায়ী জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণ এবং সভ্যতা সংস্কৃতির পরিশোধন সম্ভব। যার কারণে তাদের এ পরিকল্পনাকে জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি তাদের এ পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করেছেন ইসলামী চিন্তাধারামূলক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

শিশু উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (CDF) হচ্ছে শুধুমাত্র শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা, তালিম-তারবিয়াত বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এখানে শিশু বলতে একটি মানব সন্তান জন্মের পর থেকে নিয়ে তার শারীরিক, আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক পরিপূর্ণতার মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে সার্বিকভাবে তার নিজ দায়িত্ব এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত হওয়ার সময়টাকেই বুঝায়। এজন্য সাধারণত একটি মানব সন্তানের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা অথবা কর্মস্থলে চলে যাওয়া পর্যন্ত সময়টাকে শিশু বয়স হিসেবে গণ্য করা হয়। যাতে একটি মানব সন্তান সার্বিকভাবে যোগ্য হয়ে পরিবার ও পরনির্ভরশীলতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে তার নিজের দায়িত্ব নিজেই বহন করতে সক্ষম হতে পারে।

এখানে আরেকটি বিষয় আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখায় 'ইসলামী চিন্তাধারামূলক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং শিশু উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' দু'টির কার্যক্রম এক ও অভিন্ন। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরিশোধন এবং শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের সংস্কারে উভয় প্রতিষ্ঠানই নিয়োজিত। এজন্য একটি আরেকটির পরিপূরক ও সহায়ক।

তবে ইনষ্টিটিউটের প্রধান কাজ হচ্ছে সাংস্কৃতিক চিন্তাভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ন, মূলনীতির সংস্কার ও পরিশোধন ইত্যাদি। আর শিশু উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রধান কাজ হচ্ছে একটি মানব সন্তানকে বাল্য বয়সেই তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে সংস্কার ও পরিশোধনের কাজ আঞ্জাম দেয়ার উপযোগী করে ইনষ্টিটিউটের কার্যক্রম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পরিবর্তন ও পরিশোধনের জন্য যদিও পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল যাবৎ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তবুও তার তাত্ত্বিক ও কার্যকরী সঠিক পদক্ষেপ হচ্ছে শিক্ষা ও তালিম- তারবিয়াতের পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে জাতির সঠিক পরিবর্তন ও পরিশোধন সম্ভব। একমাত্র শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও তালিম-তারবিয়াতই সঠিক সমাজ গঠনের সফলতা বয়ে আনতে পারে। জাতির হৃদয়ে সঠিক ইসলামী মূলনীতি ও মূল্যবোধের বীজ বপন করে দিতে পারে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে ইসলামিক ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে পারে। শিশুদেরকে বাল্য বয়সেই পরিশোধন-পরিমার্জন করে শিষ্টাচারী, শক্তিশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে। তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি-উদ্যোগ গ্রহণের স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে পারে। কারণ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্‌র আকিদা, বিশ্বাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সঠিক সংস্কার ও পরিশোধন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি মানব শিশুর অন্তরে বাল্য বয়সেই সে বীজ বপন করা না হবে। আর সে বীজ বপন করতে পারে একমাত্র শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াত। এ ধরনের তালিম তারবিয়াতের মাধ্যমে যে বীজ বপন করে সংস্কার ও পরিশোধন করা হবে, তা হবে শীলালিপির ন্যায় স্থায়ী। তাই বলা ভাল, মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিবর্তন, পরিশোধন ও সংস্কার সাধন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং তালিম- তারবিয়াতের পদ্ধতিতেই সম্ভব।

সুতরাং শিশু শিক্ষা ও তার পরিচর্যা, তালিম-তারবিয়াত ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব না দিয়ে, বাল্যবয়সেই শিশুর অন্তরে সঠিক বীজ বপন না করে যদি শুধুমাত্র বয়স্কদেরকে চিৎকার করে জাতির পরিবর্তনের আহ্বান করা হয় এবং তাদের সামনে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা ও চ্যালেঞ্জগুলো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা সহকারে বুঝিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তা জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে কোনো কাজে আসবে না। কারণ, এ পদ্ধতি হচ্ছে পানিতে দাগ কাটা আর চিত্র অংকন করার মতো অবাস্তব পদক্ষেপ। পানিতে দাগ কাটায় বা চিত্র অঙ্কনে যেমন নিমিষেই বিলীন হয়ে যায়। তেমনিভাবে বাল্য বয়সে বীজ বপন না করে প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা নিমিষেই বিলীন হয়ে যাবে। মসজিদ, মাদ্রাসা ও জাগরণমূলক সভা সেমিনার থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে তাদের চেতনা শেষ হয়ে যাবে। তারা ফিরে যাবে তাদের মূলের দিকে অর্থাৎ শিশুকালে যে বীজ বপন করা হয়েছিল তার দিকে।

অতএব জাতির পরিবর্তন করতে হলে এবং সংস্কার ও পরিশোধনের কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে, শিশু বয়সেই সে বীজ তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে শিশুদের হৃদয়ে ভালভাবে বপন করতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিতকরণ এবং জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র

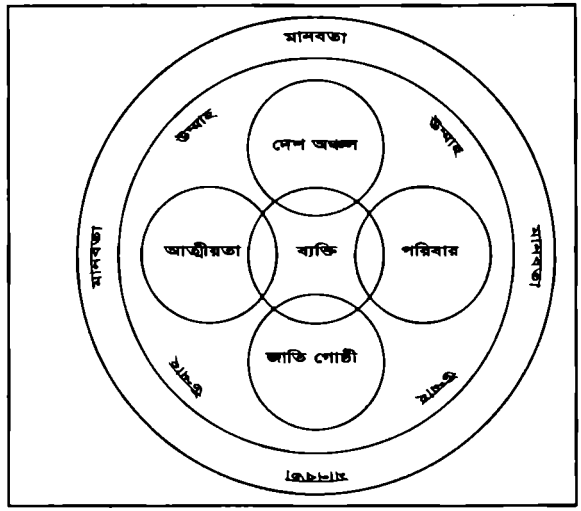

ইসলামী মানবতার সম্পর্কের তাৎপর্যের মানচিত্র
সভ্যতা, মানবতা, সহানুভূতি ও সংমিশ্রণ,
মিশ্রিত পরিমণ্ডল।
(সারণী নং-১০)

ইসলামী মানবতার সম্পর্কের তাৎপর্যের মানচিত্র, সভ্যতা, মানবতা, সহানুভূতি ও সংমিশ্রণ মিশ্রিত পরিমণ্ডল

অতএব মুসলিম উম্মাহ্‌র চিন্তাজগতের সংস্কার এবং সংস্কৃতি জগতের পরিশোধনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামায়ন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও বাবা-মায়ের মধ্যে, দয়া- অনুগ্রহ, ভালবাসা, নিরাপত্তা, সহমর্মিতা ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, সঠিকভাবে পরিবার গঠন করা এবং শিশুকে সঠিভাবে সার্বিক দিক দিয়ে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যথাযথ তালিম-তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা ও তালিম তারবিয়াত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা, যাতে একটি পরিবার ইতিবাচক ও কার্যকর তালিম তারবিয়াতের ভিত্তিতে শান্তি, নিরাপত্তা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে শিশুকে গড়ে তোলার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করতে পারে এবং শিশুকে আত্মিক, মানসিক, জৈবিক ও সামাজিকভাবে গঠন ও তার মেধা-যোগ্যতার বিকাশের জন্য হাতে- নাতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

চতুর্থ পদক্ষেপ হচ্ছে শিক্ষকদের জন্য তালিম-তারবিয়াত ও শিশু বিষয়ক সব ধরনের উপকরণ কারিকুলাম ও সিলেবাসের এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির যথাযথ ব্যবস্থা করা। যাতে একজন শিক্ষক সঠিকভাবে তার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষকদের জন্য অত্যাধুনিক নতুন আবিস্কৃত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ- বিষয়ক যুগ উপযোগী উপকরণের ব্যবস্থা করা। তাদের জ্ঞানের প্রসারতার জন্য বিষয়ভিত্তিক বই-পুস্তক ও সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করা। যাতে একজন শিক্ষক ছাত্রদের স্তর, মেধা ও যোগ্যতা ইত্যাদি সার্বিক দিক বিবেচনা করে সঠিক পদ্ধতিতে পাঠদান ও শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে ঈমান আকিদা, আখলাক, চরিত্র ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে তাদের আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

অতএব জাতির পরিবর্তন ও মুসলিম উম্মাহ্‌র চিন্তাজগতের পরিশোধন এবং সভ্য ও সংস্কৃতি জগতের সংস্কার সাধন করতে হলে এবং শিশুকে নবীর শিক্ষা ও রাসূলের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো একযোগে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই জাতির পরিবর্তন ও মুসলিম উম্মাহ্‌র সংস্কার সাধন সম্ভব হবে।

শিশু উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (CDF) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদসহ সাধারণ জনগণকে শিশু বিষয়ক তালিম-তারবিয়াত, পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি আদর্শ নমুনা উপস্থাপন করা। তেমনিভাবে শিশু বিষয়ক বই-পুস্তক ও সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করা এবং অন্যদেরকে রচনা করতে উৎসাহিত করা। একই ভাবে সভা, সেমিনার, সেম্পোজিয়াম ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং অন্যদেরকে বাস্তবায়ন করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মাহর সেবা করা।

ইসলামী চিন্তাধারামূলক ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট এবং শিশু শিক্ষা ফাউন্ডেশন উভয়ই তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে, তার বিশেষ একটি হচ্ছে আল-কুরআনের দিক-নির্দেশনার সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তির সমন্বয় সাধন এবং ঈমান আক্বিদা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, তালিম- তারবিয়াত ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা আলাদা বইপুস্তক রচনাসহ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন।

www.pathagar.com

তাদের লক্ষ্য যথাসময়ে বাস্তবায়ন ও পরিপূর্ণতার জন্য এমন একটি ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন ফাউন্ডেশন স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে, যে প্রতিষ্ঠান ইসলামিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দর্শন, কারিকুলাম, সিলেবাস ও পাঠদান-পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পরিবার, অভিভাবক, বাবা-মা তারবিয়াতী এ সকল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবে। অর্থাৎ এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুধুমাত্র ক্লাস টাইমে শিশুদের জন্য চার দেয়ালের ভেতরে সীমিত থাকবে না। বরং তার কার্যক্রম বাবা-মা ও পরিবার থেকে নিয়ে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। বাবা-মা, পরিবার ও অভিভাবকদের সামনে শিশু বিষয়ক, তালিম-তারবিয়াত, আদব-শিষ্টাচার ইত্যাদি উপস্থাপন করার মাধ্যমে শিশুকে গঠন করার আগেই বাবা-মা, পরিবার ও অভিভাবকদেরকে গঠন করবে। কারণ, সফলতা শুধুমাত্র শিশুদের তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে বয়ে আনা সম্ভব নয়। সঠিক সফলতা নির্ভর করে পরিবার, বাবা-মা ও অভিভাবকদের গঠনের উপর। অথচ সে বিষয়টি তারবিয়াতী প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থান পায় নি। এজন্য তারা এ বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

কুরআনের দিক নির্দেশনার সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রকৃতি ও যুক্তির সমন্বয় সাধন, ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতির পরিশোধন, নবী শিক্ষার আদর্শে মুসলিম উম্মাহর আত্মিক, মানসিক ও বৈষয়িক পুনগঠন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও চিন্তা জগতের কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদির মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল ধরনের ভ্রান্তি, বিকৃতি, দুর্বলতা, অপারগতা, হীনমন্যতা ও বিপর্যয়ের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে মুসলিম উম্মাহ্র ঈমান আকিদা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ঐতিহ্য ও চিন্তা-চেতনাকে হেফাজত করা। আর এরই ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহকে একটি বলিষ্ঠ, শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করা।

আন্তর্জাতিক ইসলামিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইসলামী চিন্তাধারামূলক ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট। অর্থাৎ এ ইনষ্টিটিউট, সর্বপ্রথম মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা- প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উপর গবেষণা চালায়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অনুষদের তারবিয়াত বিভাগের বিশেষ বিশেষ শিক্ষকদের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের সিলেবাস ও কারিকুলাম খসড়া তৈরি করণের জন্য সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে আলাদা একটি কেন্দ্র স্থাপন করে। সেই কারিকুলাম ও সিলেবাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাস্তবায়নের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানেই আলাদা একটি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। পর্যায়ক্রমে তাদের কারিকুলাম ও

www.pathagar.com

সিলেবাসের সংস্কার ও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে নানা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের বই পুস্তক রচনা ও মুদ্রণে সফলতা অর্জন করে। এভাবেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহ্‌র জাগরণ, সভ্যতা সংস্কৃতির ও চিন্তাধারায় পরিশোধন এবং জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামিকরণের কার্যক্রমকে পরিপূর্ণ করতে ও সফলতা অর্জন করতে হলে, ইসলামী চিন্তাধারামূলক ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট, শিশু উন্নয়ন ফাউন্ডেশনসহ সকল ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক সাথে একই ধারায় কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ লক্ষ্যে আরো যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করছে তাদেরও সহযোগিতা করতে হবে।

সেই সাথে তাদের আরো একটি কাজ করতে হবে, সেটি হচ্ছে তাদের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে একটি কার্যকর নীতিমালা ও পদ্ধতির ভেতরে নিয়ে আসতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাসহ অর্থনীতি, প্রকৌশল ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাতে হবে এবং ইসলামী পদ্ধতিতে পাঠ দানের জন্য বই পুস্তক রচনা করতে হবে। মানব ও মানবতার সেবায় তথা মানবজাতিকে এ সুন্দর পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার জন্য সর্বক্ষেত্রে ন্যায়, ইনসাফ, আদালত এ ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মানবিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় অধিকারসহ সকল মৌলিক অধিকারকে যথাযথভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইসলামিকরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ উপরিউক্ত সকল বিষয়ে ও সর্বক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাতে হলে পৃথিবীর সকল মুসলমানদের অবশ্যই রেসালতী দায়িত্বের উপর দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রেখে কঠোর পরিশ্রম সহকারে এক যুগে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই পৃথিবীর সকল মানুষের ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনাসহ সর্ব বিষয়ের পরিশোধিত রূপ উপস্থাপন করা যাবে। আবারো ফিরিয়ে আনা যাবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে সঠিক পথে।

আমাদের এ গ্রন্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যথাযথ সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাতে এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে যাতে হয়তো কারো দ্বিমত বা মতানৈক্য রয়েছে, আবার এমনও কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোর ভলিয়ম ভলিয়ম বই ও ইতিহাস আলাদা আলাদাভাবে লিখার অবকাশ রয়েছে। সেগুলোর র বিস্তারিত ব্যাখ্যা এমনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যাতে মূল বিষয়বস্তুটি পাঠকের সামনে পরিস্কারভাবে উপস্থাপিত হয় এবং জাতির সমস্যা ও সংকট নিরসনে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা না হয়।

এজন্য আমরা এ গ্রন্থের শেষের দিকে বর্ণনামূলক কিছু চিত্র তুলে ধরেছি, যাতে একজন পাঠক সমস্ত বই বিস্তারিত না পড়েও মূল বিষয়বস্তুটি সহজে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারে এবং সঠিক ফলাফল জাতির সমস্যা ও সংকট নিরসনের উপায় একজন পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। আল্লাহর সমীপে যথার্থ সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক সারণীসমূহ

চিন্তাজগত ও রাজনৈতিক জগতের নেতৃত্বের বিভাজন।

↓

চিন্তাজগত ও রাজনৈতিক জগতের নেতৃত্বের দুর্বলতা এবং উম্মাহর সার্বিক দিক পরিবর্তনে অপারগতা।

↓

রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও স্বৈরাচার। ধর্মীয় আতঙ্ক ও তাকলিদ এবং জ্ঞানের অবক্ষয়।

↓

প্রকৃতি জগতের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি।

মানুষের হৃদয় থেকে তার পেশা ও সঠিক মূল্যবোধের বিচ্ছেদ এবং শিক্ষার কারিকুলাম বিকৃতি।

↓

সাংস্কৃতিক দূষণ ও পশ্চাদপদতা : তাকলিদ, কল্পকাহিনী ও ভোজবাজি। আশা ও আবেগহীন জ্ঞান ও শিক্ষা।

↓

ইজতেহাদের দরজা বন্ধ করণ : (তাকলিদ ও পেশামূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ)

আত্মিক এবং মানসিক আতঙ্ক।

↓

শিক্ষা ও তারবিয়াতী কারিকুলামের বিকৃতি, জ্ঞানের স্থবিরতা এবং শিক্ষার অবক্ষয়, শিক্ষা ও তারবিয়াত পদ্ধতির আতঙ্কগ্রস্ততা, জ্ঞান এবং আবেগের মধ্যে সম্পর্কহীন শিক্ষার পদ্ধতি।

↓

নেতিবাচক ও পরাধীনতামূলক মনোভাবসম্পন্ন ভীত জাতি। সভ্যতা ও সংস্কৃতি জগতের পশ্চাদপদতা, জাতির হৃদয়ে আশা ও আবেগের অনুপস্থিতি।

↓

তারবিয়াত ও কারিকুলামগত বিকৃতির নিদর্শন।

(সারণী নং-১১)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক সারণীসমূহ

কারিকুলামগত সংস্কার : সামগ্রিকভাবে ধর্মবিজ্ঞান, মানবিক বিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

↓

সংস্কৃতি বিষয়ক পরিশোধন, একত্ববাদ ও প্রতিনিধিত্বমূলক সার্বিক ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠাকরণ,

ঈমান, যিকির ও জেহাদ।

ধোঁকাবাজি ও কল্পকাহিনী থেকে সংস্কৃতির পরিশোধন।

চিন্তা-জগতে সন্ত্রাসীমূলক বক্তব্য দূরীকরণ।

↓

শিক্ষা ও তারবিয়াত বিষয়ের পরিশোধন

- শিশু বয়সেই মানসিক ও আত্মিক পরিবর্তন সাধনের ব্যবস্থাকরণ।

- শিশু শিক্ষা বিষয়ে আত্মিক ও মানসিক বিকাশের বিষয়াবলীর সমন্বয় সাধন।

- উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভালবাসার ভিত্তিতে ঈমান, ইসলাম, ইহসান, দায়িত্বশীলতা প্রতিনিধিত্ব, শৃঙ্খলা মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিতকরণের নবী। শিক্ষা ও রাসূলের আদর্শের পুনপ্রতিষ্ঠাকরণ।

- পরিশোধন ও সংস্কার সাধনের চাবিকাঠি হিসেবে বাবা-মা অভিভাবক এবং পরিবারকে অধিক গুরুত্ব প্রদান।

- তালিম তারবিয়াতের সংস্কার সাধন এবং তালিম ও তারবিয়াতে আত্মিক ও মানসিক বিষয়ের সমন্বয় সাধন।

↓

মুসলিম উম্মাহকে নিম্নবর্ণিত গুণে গুণান্বিত করণ,

- ইতিবাচক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণে গুণান্বিতকরণ এবং বীরত্ব ও ইসলামী মূল্যবোধে ভূষিতকরণ।

- প্রতিনিধিত্বমূলক সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালনে দক্ষতা অর্জন এবং যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শক্তি ও সামর্থ অর্জন।

- ব্যক্তিগত ও পরাধীনতামূলক মনোভাব পরিহার এবং মুক্ত ও স্বাধীনতামূলক মনোভাব তৈরিকরণ।

↓

- দায়িত্ব পালনে শক্তিশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রজন্ম তৈরিকরণ।

- আল্লাহ প্রদত্ত আমানত ও রেসালতের দায়িত্ব পালনকারী জাতি গঠন।

↓

উম্মাহর পরিশোধনে সফলতার ভিত্তি, শক্তিশালী, যোগ্যতাসম্পন্ন, স্বাধীনচেতা, ভারসাম্যপূর্ণ দূরদর্শী, তীক্ষ্ণ মেধাবী, মুসলিম, মুমিন শিশু।

(সারণী নং-১২)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক সারণীসমূহ

চিন্তাজগতের সংস্কার সাধন

↓

জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামিকরণ।

↓

কারিকুলামের সংস্কার সাধন : ইসলামিক, তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক।

↓

ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের সংস্কার সাধন। বর্ণবাদী, ধোকাবাজী এবং কল্পকাহিনীমূলক চিন্তাধারা থেকে যুক্তকরণ।

↓

শিক্ষা ও তারবিয়াতের সংস্কার সাধন। আশা, আবেগ এবং জ্ঞানের একত্রিকরণ।

↓

ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও উৎসাহ প্রদান।

↓

পরাধীনতামূলক চিন্তাধারার পরিহার।

↓

ঈমান, উদ্যোগ, দক্ষতা, সাহসিকতা ও ঐক্যবদ্ধতা।

↓

চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতার প্রতিরোধ।

↓

শিক্ষা ও চিন্তাজগতের পরিশোধনের ইতিবাচক নিদর্শনসমূহ।

সারণী নং-১৩

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রকৃত অবস্থা

মানুষের ব্যক্তিত্ব, নিকৃষ্ট সামাজিক অবস্থা, মানবিক বন্ধন।

ইসলাম, মর্মস্পর্শী আকাঈদ ও মৌলিক বিষয়াবলী, সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও উপদেশাবলী

সংস্কারের চেষ্টা প্রচেষ্টা ও আন্দোলন, অক্ষম চিন্তা পদ্ধতি, জটিল চিন্তাসূত্র, লুণ্ঠন, চিন্তার উপর রাজনীতির প্রধান্য, নকল ও অনুকরণ, পরিশোধনে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অগ্রাধিকার, শুধুমাত্র বয়স্কদের জন্য ওয়াজ ও নসিহত এবং বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদি।

↓

জাতির জাগরণে অপারগতা, লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও পরিবর্তন সাধনে অক্ষমতা এবং বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলার ব্যর্থতা।

↓

সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সামরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং তথ্য-প্রযুক্তির পরাজয়।

↓

পশ্চাদপদতা, বিচ্ছিন্নতা, স্বৈরাচার, লুণ্ঠন, উপনিবেশ, মূর্খতা, দরিদ্রতা ও অসুস্থতা।

সীমিত সংস্কার আন্দোলন লক্ষ বাস্তবায়নে অক্ষম

(সারণী নং-১৪)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক চিত্রসমূহ

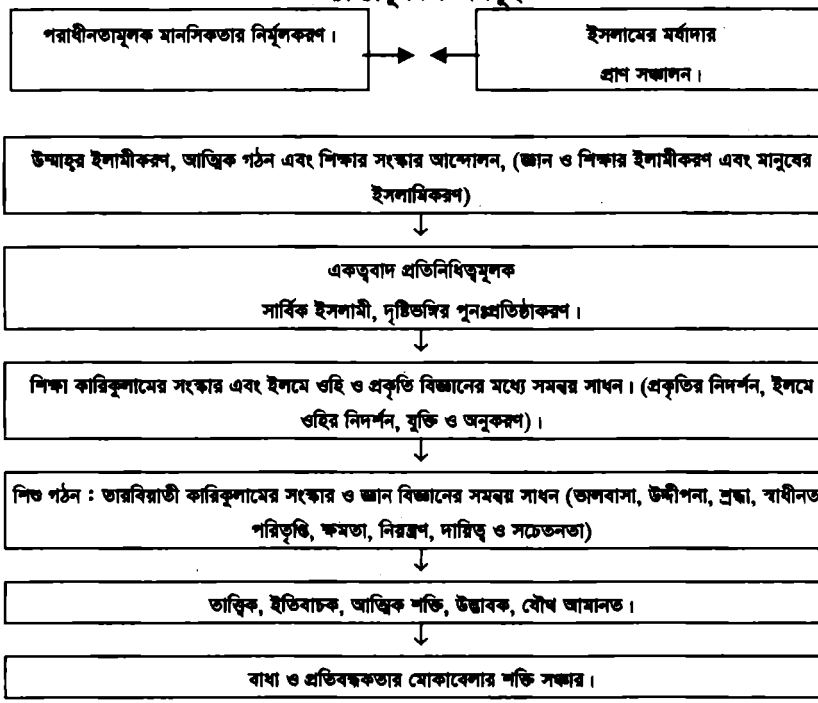

উম্মাহ্‌র সংস্কার

কার্যকরী মৌলিক সংস্কার আন্দোলন

(সারণী নং-১৫)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক সারণীসমূহ

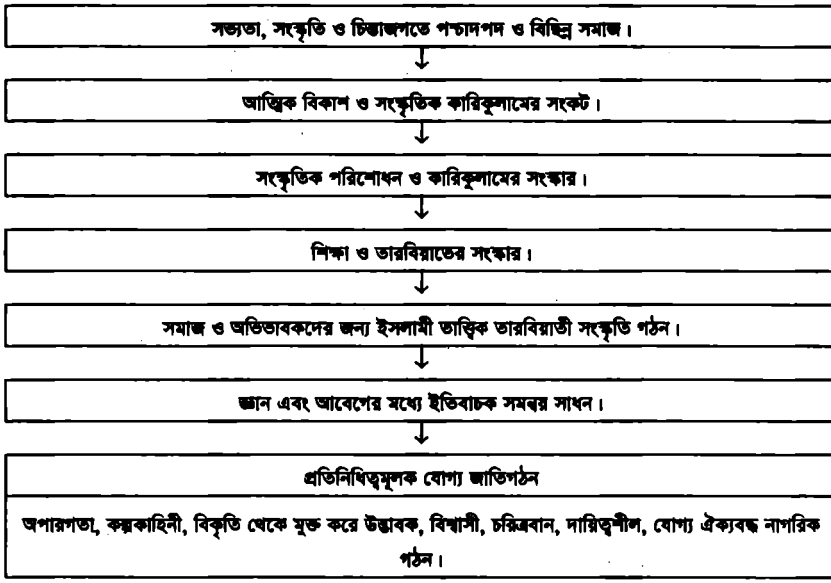

শিশু

জাতির সংস্কার সাধনে এবং পুনর্গঠনে শিশুই দূরদর্শী প্রত্যাশা।

(সারণী নং-১৬)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক সারণীসমূহ

শিক্ষা সংস্কৃতি ও কারিকুলামের সংস্কার

↓

কার্যকরী তাত্ত্বিক দায়িত্বপালন, চিন্তাবিদ, গবেষক এবং শিক্ষাবিদদের ইসলামী যোগ্যতা ও সচেতনতার সাথে দায়িত্ব পালন

↓

তাত্ত্বিক ইসলামী তারবিয়াতী আদব ও শিষ্টাচার

↓

ব্যবস্থাপনা

বাবা-মা ও অভিভাবকদের প্রতি স্বভাবগতভাবে উৎসাহ প্রদান, বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে ইসলামী তারবিয়াত ও সংস্কৃতি বিষয়ে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন।

(তাত্ত্বিক তারবিয়াত ও সাংস্কৃতিক শিষ্টাচার, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচী, স্বাধীন, উন্মুক্ত ইসলামী সেমিনার, ইসলামী আন্দোলন ও জাগরণ, ইসলামী ইন্টারনেট ও মহাকাশ)

↓

–সঠিক শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের মৌলিক বিষয়াবলীর মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংস্কার সাধনের জন্য বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে জাগ্রত করণ। শিশুর আত্মিক-মানসিক ও জৈবিক বিকাশ-সহ শিশুকে কল্যাণকর ও সার্বিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য বাবা-মা ও অভিভাবকদের সচেতনতার বিকল্প নেই।

↓

কারণ বাবা-মা ও অভিভাবকদের অজ্ঞতা, মূর্খতা ও যথাযথ ইসলামী জ্ঞান, আদব-শিষ্টাচার ইত্যাদির অভাবের কারণে শিশুদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ইতিবাচক যোগ্যতা ও স্পৃহা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না।

- সমাজে সর্বস্তরের মানুষকে সঠিকভাবে সহজ উপায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইসলামিক তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার পাঠ্যসূচী, উপকরণ, সিলেবাস ইত্যাদি প্রণয়নসহ এগুলোর বাস্তবায়নের ব্যবস্থাকরণ।

- ইসলামী চিন্তা-চেতনার উন্নয়ন এবং মুসলিম উম্মাহর সভ্যতা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিশোধন ও পুনর্গঠনের জন্য ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট ও গবেষণাগার স্থাপন।

বাবা-মা ও অভিভাবকগণই সমাজের যথার্থ ও সঠিক পরিবর্তন ও পরিশোধনের চাবিকাঠি।

(সারণী নং ১৭)

www.pathagar.com

চিন্তাগত এবং কারিকুলামগত মূলনীতির ঘোষণা সময়ের দাবি

বর্তমানে ইসলামী চিন্তাধারা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং মুসলিম উম্মাহ, জাতি, গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে স্তরে উপনীত হয়েছে, তাতে আমি মনে করি যে এখনই ইসলামী চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতি তথা মুসলিম উম্মাহর সামনে এমন একটি নীতিমালা উপস্থাপন করা প্রয়োজন, তাদের সামনে ইসলামিক, মূল্যবোধ ও ইসলামী শরিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, নীতিমালা, মৌলিক স্থায়ী এবং অস্থায়ী বিধিমালা, ঐতিহ্য এবং ইসলামী চ্যালেঞ্জগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেয়া প্রয়োজন যেন তাদের এ নীতিমালা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জাতির চলার পথে একটি দলিল হয়ে থাকে। এবং মুসলিম উম্মাহ একে মাইলফলক হিসেবে গ্রহণ করে। তার উপর ভিত্তি করে মুসলিম উম্মাহ ও জাতি তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, তালিম-তারবিয়াত ইত্যাদি সকল বিষয়ের সংস্কার ও পরিশোধনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে এবং নিজেদেরকে সকল প্রকার অপসংস্কৃতি, বিকৃতি, বিভ্রান্তি, কল্পকাহিনী, অপব্যাখ্যা ও চিন্তাজগতের ভুল অনুভূতি থেকে হেফাজত ও সংরক্ষ করতে পারে।

তেমনিভাবে এ নীতিমালা ও ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে পথ হারাবে না কোনো সত্যের সন্ধানী, স্থান পাবে না কোন ধরনের অপসংস্কৃতি, প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না কোন ধরনের কল্পকাহিনী, বাকি থাকবে না কোন ধরনের দ্বন্দ্ব, সংঘাত আর ভুল বোঝাবুঝি, প্রাধান্য দেয়া হবে না নকলকে আসলের উপর এবং শাখা তার মূলের উপর, ইসলামী মৌলিক প্রমাণাদীর মধ্যে থাকবে না কোন ধরনের বিক্ষিপ্ততা আর বৈপরিত্য, যার সংশোধন ও সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং সমাধান হয়ে যাবে সকল সমস্যার, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে মুসলিম উম্মাহ-জাতি পুরানো ঐতিহ্য।

আর যদি মুসলিম উম্মাহর এ ক্রান্তিলগ্নে এ ধরনের কোন নীতিমালার ঘোষণা করা না হয় অথবা ঘোষণা করতে দেরি করা হয়, তাহলে তা হবে বড় ধরনের অন্যায়, অমার্জনীয় অপরাধ ও অপূরণীয় ক্ষতি।

আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, আল্লাহ যেন জাতির বিবেক, পরিচালক এবং নেতৃবৃন্দকে এ সকল শূন্যতা ও ক্ষতি সঠিকভাবে পূরণ করার জন্য সঠিক বোধ শক্তি দান করেন। তারা যেন মান ও মানবতা এবং মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সেবায় আল্লাহ প্রদত্ত রেসালতী দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি অর্জন করতে পারেন। 'আমীন'। "নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান"

www.pathagar.com

শেষ কথা

আমাদের জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য : এতক্ষণে আমরা আমাদের কিতাবের শেষপ্রান্তে চলে এসেছি এবং আমাদের বিষয়ের বিভিন্ন দিকগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছি যে, তাতে কারো কারো মতানৈক্য থাকতে পারে। কোনো কোনো বিষয়ে গভীর মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হতে পারে। সেজন্য আমরা আমাদের কিতাবের পরিশিষ্টাংশে পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে কিতাব খানার মূল বিষয়ের সারসংক্ষেপ এবং জাতির সংকট ও তার সমাধানের প্রচেষ্টার মৌলিক ও সাধারণ চিত্র তুলে ধরেছি। তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পরিবর্তন, পরিশোধন ও জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে যারা একনিষ্ঠ ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে, তাদের জন্য কাম্য ইসলামিক সংস্কার সাধনের হারানো উপাদানগুলো তুলে ধরছি।

মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে এমন একজাতি, যারা সকল মানব সন্তানের হেদায়াত ও পথ প্রদর্শক তথা রেসালতের দায়িত্ব বহন করে। মানবতার মুক্তির জন্য সেই অতীত থেকে আজ পর্যন্ত যে দায়িত্ব পালন করে আসছে তারা। পৌঁছে দিয়েছে পৃথিবীর সকল প্রান্তে সেই হেদায়াতের আলো। কিন্তু আজ সমকালীন মানব সভ্যতার সামনে স্থবির হয়ে গেছে রেসালতের সেই দায়িত্ব। এমনকি মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ 'ইসলাম' মানুষের মধ্যে তথা মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে যে ইসলামী শক্তির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তা আজ নির্বাপিত হতে চলেছে। কারণ, গোত্রীয় ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শন অনুকরণের ফলে আজ ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা সংশয়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কলুষিত হচ্ছে ইসলামিক সভ্যতা সংস্কৃতি আর মূল্যবোধ। ভেঙ্গে যাচ্ছে ইসলামিক জ্ঞান বিজ্ঞান আর চিন্তাধারার মূল ভিত্তি। প্রভাব বিস্তার করছে অপসংস্কৃতি, আর কল্পকাহিনী। দুর্বল ও অপারগ করে দিচ্ছে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির নেতৃবৃন্দকে। যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিপর্যয়। মুসলিম উম্মাহ তাদের শক্তি, সামর্থ, বীরত্ব, ঐক্য, সংহতি-স্বাধীনতা ও উদ্ভাবনী শক্তি হারিয়ে নিষ্প্রাণ পরনির্ভরশীল ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে শত্রুদের ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছে।

www.pathagar.com

জাতির জাগরণ ও মুসলিম উম্মাহকে এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার জন্য যদিও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে যথেষ্ট চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু জাতির আত্মিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলোর সমাধানে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও বক্তব্য ছিল রাজনৈতিক এবং শুধুমাত্র বয়স্কদেরকে কেন্দ্র করে। যাতে তারা রাজনৈতিকভাবে শক্তি সঞ্চার করে সমস্যার সমাধান করতে পারে।

অথচ স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তাভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বক্তব্য ও শক্তি সঞ্চয় ব্যতিরেকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বক্তব্য ও শক্তির মাধ্যমে জাতির পরিবর্তন ও মুসলিম উম্মাহ্‌র সংস্কার সাধন ও জাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বরং জাতির পরিশোধন ও জাগরণ সৃষ্টির জন্য ভারসাম্য বজায় রেখে একই সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাতি তার আত্মিক ও মানসিক শক্তি ফিরে পাবে। তখনই জাতির জাগরণ সম্ভব হবে এবং জাতির সংস্কার সাধনে সকল ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার সুফল পাওয়া যাবে। সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও বাধা-বিপত্তির মোকাবেলা করে আবারও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করতে হলে, তাদের মধ্যে আত্মিক ও মানসিক জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে।

আমরা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং মানুষের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ককে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান দু'টি বিপরীত ও সংঘাতমুখী ভাগে ভাগ করে ফেলেছি। একটি হচ্ছে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, আরেকটি হচ্ছে নাগরিক ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান। যার কারণে ধর্মীয় জ্ঞানে নেমে এসেছে নির্জীবতা আর ধর্মীয় দর্শনে অবক্ষয় এবং মানবিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে স্থবিরতা ও বন্ধ্যাত্ব।

তেমনিভাবে আমরা মানুষের আত্মিক ও মানসিক বিকাশের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্কের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারার কারণে মানবিক বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করেছি এবং জাতির সঙ্কট নিরসন ও মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিশোধনের একমাত্র চাবিকাঠি শিশু-শিক্ষা ও তালিম-তারবিয়াতের বিষয়কে অবহেলা করেছি।

সুতরাং মানুষের আত্মিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা ও বাধাবিপত্তির মোকাবেলা করে মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিবর্তন, পরিশোধন করতে হলে এবং ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার মাধ্যমে জাতির জাগরণ সৃষ্টি করতে

www.pathagar.com

হলে, জাতির শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাবিদদেরকে অবশ্যই শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ও তার পুনর্গঠনের বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

তেমনিভাবে একত্ববাদ প্রতিনিধিত্বমূলক ও কল্যাণকর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে, সকল কলুষতা, নোংরামি ও কল্পকাহিনী থেকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মুক্ত করে মানবিক, প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষার কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। একজন মানুষকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে তৈরি করতে হলে তাকে আত্মিক, মানবিক ও বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাতে সে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করে সর্বক্ষণ একজন শক্তিশালী ঈমানদার ও বিশুদ্ধ মুমিন হিসেবে জীবন-যাপন করতে পারে।

এজন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ ও উচ্চ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দকে শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-গবেষণা ও বৌদ্ধিক পরিশোধনের কাজ করে যেতে হবে এবং সাধারণ শিক্ষক ও পরিবারকে আত্মিক ও মানসিক পরিশোধনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তখনই জাতি ও মুসলিম উম্মাহ তাদের শক্তি, সামর্থ, মূল্যবোধ শিলালিপির ন্যায় স্থায়ীভাবে ফিরে পাবে এবং পরনির্ভরশীলতা ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে।

সামাজিক সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে জাতির এ পরিশোধিত ও পরিমার্জিত অবস্থাকে যে কোনো প্রচেষ্টার বিনিময়ে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য কাজ করে যেতে হবে। এতে কোন ধরনের পরিবর্তন বা পরিশোধনের কাজ করতে হলে তা সেই রীতি-পদ্ধতির ভিত্তিতে করতে হবে। এজন্য যারা সংস্কার ও পরিশোধনের কাজ করে, তাদেরকে অবশ্যই সংস্কার ও পরিশোধনের রীতি-পদ্ধতি জানতে হবে। না হয় তাদের কাজ হবে হাতে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি চালানোর মতো, অর্থাৎ তারা কখনোই সংস্কার ও পরিশোধনের কাজ করতে পারবে না।

জাতির সঠিক পরিবর্তন ও পরিশোধনের বীজ প্রতিটি মানব সন্তানের মধ্যে স্বভাবগতভাবে বপন করাই আছে। প্রতিটি বাবা-মা অভিভাবকের হৃদয়ে তাদের সন্তান-সন্ততির কল্যাণ কামনা এবং তাকে আত্মিক-মানসিক ও জৈবিক যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার আগ্রহ স্বয়ং আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে চিরকালের জন্য বপন করে রেখেছেন। এজন্য একটি মানব সন্তানকে বাল্য বয়সেই পরিবর্তন ও সংশোধন করা সম্ভব। মানুষের বাল্যকাল হচ্ছে রঙিন চশমার মতো। চশমার যে ধরনের রং হয় প্রকৃতিও সেই রং ধারণ করে, এখানে প্রকৃতির রঙ্গের চেয়ে চশমার রঙ্গের গুরুত্ব ও প্রভাব বেশি। একটি মানব সন্তান তার বাল্য বয়সে যে কী দেখছে বা কী শুনছে সেটি বড় কথা নয়, বরং বড় কথা হচ্ছে তাকে কী বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ একটি মানব সন্তানকে তার বাল্য বয়সে তাকে

www.pathagar.com

যেভাবে বোঝানো হবে সেভাবেই গড়ে ওঠবে। এ বিষয়টি যখন একজন বাবা-মা, অভিবাবক সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে, তখন খুব সহজেই একটি শিশুকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারবে।

এ জন্য শিক্ষাবিদ সংস্কৃতিবিদ, সংস্কারক, পরিশোধক ও গবেষকদেরকে যৌথভাবে শিশু এবং বাবা-মা, অভিবাবকদের বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দিতে হবে। বাবা-মা, অভিভাবকদের জন্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ, আদব-শিষ্টাচারমূলক সাহিত্য রচনা করতে হবে। শুধু শিক্ষা-প্রশিক্ষণ নয়, বরং কীভাবে কী পদ্ধতিতে তাদের সন্তানদেরকে লালন পালন করবে, সে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি বাবা-মা, অভিভাবককে সচেতন করে তোলতে হবে। যাতে প্রতিটি বাবা-মা তাদের সন্তান- সন্ততিদেরকে যথাযথ তালিম-তারবিয়াত ও লালন-পালনের মাধ্যমে খাঁটি মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। ভবিষ্যতে সেই সন্তান বলিষ্ঠ সাহসিকতা ও যোগ্যতার সাথে সমাজে দায় দায়িত্বগুলো আঞ্জাম দিতে পারে এবং জাতির ধারক বাহক ও সংরক্ষণের ভূমিকা পালন করতে পারে।

এজন্য পারিবারিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। পরিশোধিত পরিমার্জিত ও যোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য পরিবারের উপযুক্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতির বইপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

এ সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। যার অধীনে জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামী করণের জন্য তিনটি বিষয়কে সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে এবং সে বিষয়গুলোতে বিষয়ভিত্তিক যোগ্য শিক্ষক তৈরি করার জন্য ডিপ্লোমা কোর্সেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয় তিনটি হচ্ছে :

(ক) পরিবার ও অভিভাবকত্ব (বা) (الأسرة والأبوة)

(খ) সংকট নিরসন বা সমস্যার সমাধান ও উদ্ভাবনী চিন্তা (الفكر الابداعي وحـــل المشكلات)

(গ) সভ্যতা ও সংস্কৃতির গঠন ও পতন (قيام الحضارات وانهيارها) ।

শিশুর আত্মিক-মানসিক ও জৈবিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা হবে বাবা-মা, অভিভাবক ও পরিবারের ভূমিকার পরিপূরক। অর্থাৎ একটি শিশু প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে যোগ্যতা-সম্পন্ন হয়ে তার জীবনের সফলতায় পৌছার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিম- তারবিয়াত বাবা-মা অভিভাবক ও পরিবারের ভূমিকাকে ফলপ্রসূ করতে সহায়তা করবে মাত্র।

www.pathagar.com

এখানে পাঠকের সামনে মুসলিম উম্মাহর সংস্কার পরিশোধন ও সংকট নিরসনের মাধ্যমে জাতির জাগরণ সৃষ্টি করতে সফলতায় পৌছতে না পারার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম কারণ হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ্র যে আত্মিক ক্ষতিসাধন হয়েছে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারা। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, জাতির শিক্ষার সিলেবাস ও কারিকুলামের যে বিপর্য ঘটেছে তা সঠিকভাবে বোঝতে না পারা। তৃতীয় কারণ হচ্ছে, শিশুর আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক বিকাশের মধ্যে যে জাতির জাগরণের পথ সুগম করা যায়, সে বিষয়টিকে সঠিকভাবে গুরুত্ব না দেয়া। এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অচিরেই পাঠকের সামনে 'জাতির স্বাধীনতার সংকট' শিরোনামে উপস্থাপিত হবে ইনশাল্লাহ এবং জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খ থেকে মুক্ত করা হবে, যেমনিভাবে মুক্ত করেছিলেন হজরত মূসা (আ.) মিসরের মাটিতে বনী ইসরাঈলদেরকে।

ইতোপূর্বে আমরা মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পরিবর্তন, পরিশোধন ও সংস্কার সাধনে, বাবা-মা অভিবাবক, শিক্ষক, সংস্কারক, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। তাদের দায়িত্ব একজন গাড়ি চালকের দায়িত্বের ন্যায়। একজন গাড়ি চালক যেমন স্টিয়ারিং হুইলের মাধ্যমে তার ইচ্ছানুযায়ী গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পারে। তেমনিভাবে একজন সংস্কারক, শিক্ষক, গবেষক ও চিন্তাবিদ তাদের ইচ্ছানুযায়ী শিশুদেরকে পরিবর্তন ও পরিশোধনের মাধ্যমে জাতিকে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ একটি শিশুকে সঠিকভাবে তালিম-তারবিয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-শিষ্টাচার ইত্যাদির মাধ্যমে, তার আত্মিক, মানসিক, জৈবিক প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে জাতির গন্তব্যস্থলে পৌছানো সম্ভব। এজন্য বাবা-মা, অভিবাবক ও পরিবারকে সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে তারাও সঠিকভাবে তাদের সন্তানদের আত্মিক মানসিক, জৈবিক প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। এ সকল পরিশোধিত সন্তানেরাই সকল বাধা-বিপত্তি আর প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করে জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে। আঞ্জাম দেবে হেদায়াত ও রেসালতের দায়িত্বের। ন্যায়-নিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্ব, কল্যাণ আর ইসলামী শরিয়তের ভিত্তিতে গড়ে তুলবে সারা পৃথিবীকে। শান্তির সুবাতাস বয়ে যাবে সারা দুনিয়াতে। এজন্য এখনই সময় এসেছে :

* সংস্কৃতি ও শিক্ষার পরিশোধনের গুরুত্ব অনুধাবন করার।
* তালিম-তারবিয়াতের মাহাত্ম অনুধাবন করার।
* আত্মিক ও মানসিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার।
* মাতৃত্ব-পিতৃত্ব ও অভিভাবকত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করার।
* শিশু সুলভ বিষয়াবলীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার।

www.pathagar.com

* শাখা-প্রশাখা আর অতিরিক্ত বিষয়ের অগ্রাধিকার না দিয়ে ধীর-স্থিরভাবে মৌলিক ও আসল বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করার।
* এগুলোই হচ্ছে সৃষ্টিজগতে স্রষ্টার অনুসৃত পদ্ধতি এবং জাতি, গোষ্ঠী ও মুসলিম উম্মাহ্‌র জাগরণের মাধ্যম।
* সুতরাং প্রতিটি মুসলমানেরই তার নিজ দায়িত্বে গন্তব্য স্থলে পৌছার সময় এখনই এসেছে।
* সময় এসেছে সকল প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করে পরিশোধিত ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, বাবা-মা অভিভাবক ও পরিবারকে সতর্ক ও সচেতন করা, জাতি ও মুসলিম উম্মাহকে জাগরণ ও সঠিক পথ প্রদর্শন করার মাধ্যমে মুসলিম, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, নেতৃবৃন্দ, গবেষক ও চিন্তাবিদদের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার।

বাবা-মা ও অভিভাবকদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তারাই হচ্ছেন জাতির নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার একমাত্র চাবিকাঠি। তাদের সঠিক ভূমিকা ছাড়া এ জাতির মুক্তি সম্ভব নয় এবং অতীতে ফিরে যেতে পারবে না।

শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, গবেষক ও চিন্তাবিদদের প্রতি সর্বশেষ উপদেশ হচ্ছে যে, জাতির সংস্কার কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই জাতির সামনে পরিশোধিত ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হবে এবং জাতির সমস্যা ও সংকটের কারণ চিহ্নিত করে এর সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

তেমনিভাবে তাদের এ কঠিন দায়িত্ব পালনে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। নিরাশ ও তড়িঘড়ি না করে ধীরস্থিরভাবে পর্যায়ক্রমে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। যাতে সংস্কার ও পরিশোধনের ভিত শক্ত ও মজবুত করে গড়ে তোলা যায়। কারণ, যে কোন কাজ বা যে কোন বিষয় যখন ধীর-স্থিরভাবে পর্যায়ক্রমে এগুতে থাকে, তখন এক পর্যায়ে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে সফলতার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। যেমন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে নদী ও সাগরের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ভূমি থেকে ধীরস্থির গতিতে শুরু করেও পর্যায়ক্রমে উর্ধ্ব আকাশে বিমান উড্ডয়ন হতে পারে।

রাসূল ﷺ এর জীবনীতে রয়েছে এর জ্বলন্ত উদাহরণ। রাসূল ﷺ ও তার সাহাবীগণ (রা.) মাক্কী জীবনের দীর্ঘ তেরটি বছর অত্যন্ত কষ্ট ও ধৈর্যের সাথে একটি আদর্শ জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও দাওয়াতী কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলাফল পেয়েছিলেন মাত্র ১০ বছরের মাদানী জীবনে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর মাত্র ১০ বছরের মাদানী জীবনে সকল বাধা-বিপত্তি ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মোকাবেলা করে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক জাতি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায়নি, যাবেও না।

সংস্কৃতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে অবশ্যই বুঝাতে হবে, যে তাদের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে, জাতির পরিবর্তন, পরিশোধন ও পুনর্গঠনের আন্দোলনকে যতাযথভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং পরনির্ভরশীলতা, পরাধীনতা ও সকল প্রকার ক্ষতিকারী বিষয়াবলী থেকে তাদের সংগ্রাম ও আন্দোলনকে মুক্ত রাখা। কারণ, কোন জাতি, গোষ্ঠীই পরনির্ভরশীলতা আর পরাধীনতামূলক মনোভাব নিয়ে হাজারো চেষ্টার পরও সফলতা অর্জন করতে পারে না।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহ ও জাতির পরিশোধন, পরিবর্তন, পুনর্গঠন ও সংস্কার সাধনের ভিত মজবুতকরণের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্যের সাথে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে। যাতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে জাতির পুনর্গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যথাযথভাবে তার ফল উপভোগ করতে পারি।

তেমিনভাবে আমাদের পরাধীনতা আর পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। কারণ, পরাধীন ও পরনির্ভরশীল হয়ে তড়িঘড়ি আর এলোমেলোভাবে কাজের মাধ্যমে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। যার নজির আমরা জাতির ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে দেখে আসছি। তারা তাদের সংকট নিরসনে, সমস্যার সমাধানে এবং জাতির পরিবর্তন সাধনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করেছে, আজও সে প্রচেষ্টা অব্যাহত এবং আমরাও সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার পরও সফলতা আসে নি। জাতির ইতিহাসে নেমে এসেছে অপরাগতা, ব্যর্থতা, অপমান আর পরাধীনতা- পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি। কারণ হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে সংশোধন না করে তড়িগড়ি করে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করেছিল, যার কারণে ব্যর্থতা ডেকে নিয়ে এসেছে।

সুতরাং আমাদেরকে সফলতা অর্জন করতে হলে, আত্মিক, মানসিক ও জৈবিকভাবে যোগ্য, সঠিক ও খাঁটি মুমিন তৈরির মাধ্যমে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই আমাদের নিজেদেরকে সংশোধন করতে হবে। সংস্কারক, পরিশোধক, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদেরকে প্রথমে নিজেরা সংশোধিত হয়ে জাতির সংশোধনের কাজ করতে হবে। কারণ, আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরা সে পরিস্থিতি তৈরি না করে।

www.pathagar.com

এজন্য আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন :

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾

"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে" (সূরা আর-রাদ : ১৩/১১)

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

"কসম যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে, এবং পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের এবং তাগিদ করে সবরের।" (সূরা আল-আসর : ১০৩/১- ৩)

সমাপ্ত

(تـــمت بالـــخيـــر)

www.pathagar.com

বি আই আই টি'র বাংলা প্রকাশনা

১ আত-তাওহীদ ঃ চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য
মূল : ইসমাইল রাজী আল ফারুকী, অনুবাদ : অধ্যাপক শাহে আলী ১৭৫/-

২ ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ
মূলঃ ড. আব্দুল হামীদ আহমাদ আবু সুলায়মান, অনুবাদ : মাওঃ আকরম ফারুক ৬০/-

৩ ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ : মূল এম উমর চাপরা
অনুবাদ ড. মিয়া মোহাম্মদ আইয়ুব ৩০০/-

৪ ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মূলঃ এম উপর চাপরা, অনুবাদ : ড. মাহমুদ আহমদ ২০০/-

৫ রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খণ্ড)
মূল : ড. আকরাম জিয়া আল আমরী, অনুবাদ : মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম ১৫০/-

৬ রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খণ্ড)
মূল : ড. আকরাম জিয়া আল আমরী, অনুবাদ : মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম ১৭০/-

৭ কোরআন ও সুন্নাহ ঃ স্থান-কাল প্রেক্ষিত
মূলঃ তাহা জাবির আল আলওয়ানী ও ইমাদ আল দীন খলিল,
অনুবাদঃ শেখ এনামুল হক ৫০/-

৮. ইসলামের দৃষ্টিতে নারী, মূলঃ বি.আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন
অনুবাদ : ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ৫০/-

৯. আমাদের সংস্কৃতি, সম্পাদনা : অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার ৬০/-

১০. রাসূলের (সঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড)
মুল : আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব ৩০০/-

১১. রাসূলের (সঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খণ্ড)
মুল : আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব ৩০০/-

১২. ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মূলঃ ড. আব্দুল হামীদ আহমাদ আবু সুলায়মান
অনুবাদ : অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার ২৫০/-

১৩. ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা- সামাজিক প্রেক্ষাপট,
অনুবাদ : এম রুহুল আমিন ১৩০/-

১৪. ইসলামে উসূলে ফিকাহ, মূলঃ তাহা জাবির আল আলওয়ানী
অনুবাদ : মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার ৭০/-

১৫. মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক, মূলঃ জামাল আল বাদাবি, অনুবাদ মোঃ শামীম আহসান ২০/-

১৬. ইসলামের দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট, ড. আবদুর রহমান আনোয়ারী ২০০/-

১৭. তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক মূল : প্রফেসর, ড. রশীদ আহমদ কালঙ্করী,
অনুবাদ : ড. আব্দুল ওয়াহীদ ১০০/-

১৮ ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ
মূলঃ এম আকরাম খান, এম রকিবুজ জামান অনুবাদ : এম রুহুল আমিন ৭০/-

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ড. আবদুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান ১৯৩৬ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে ফিলাডেলফিয়ার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৬৩ থেকে ৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি সৌদি Supreme Planning Board-এ প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Commerce এবং Administrative Science বিভাগেও শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. আবদুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের জন্য বিরাহমহীনভাবে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত Association of Muslim Social Scientist (AMSS)- এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। তিনি এর প্রথম নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন এবং পরবর্তীতে এই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি World Assembly of Muslim Youth (WAMY) (১৯৭৩-১৯৭৯) এর প্রথম মহাসচিব ছিলেন। তিনি International Institute of Islamic Thought (IIIT) এর প্রতিষ্ঠতা সদস্যদের একজন এবং প্রথম President (সভাপতি)। ডঃ আব্দুল হামীদ আব্দু সুলায়মান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে এবং বাহিরে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেন। বর্তমানে তিনি সৌদীআরবের রিয়াদে অবস্থিত Dar Manar Al-Ra'id for Educational Consultations-এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

অনুবাদক পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর ১৯৬২ সালে ফেনীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মোহাম্মদ বিন সউদ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯০ সালে আরবীতে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৯৩ সালে **International Islamic University Malaysia** থেকে গঅ, অঋখ ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৮ সালে টকগ গধযধুংরধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে Centers for Foreign Language Training Project এর জন্য Communicative Arabic Language Training Manual রচনা করেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। এ পর্যন্ত তার ৮ টি মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ এবং ১৫ টি প্রবন্ধ (আরবী) বিভিন্ন একাডেমিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর আর্ন্তজাতিক সেমিনার ও ওয়ার্কশপ-এ যোগদান করেন।

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কুমিলা জেলার মুরাদনগর থানাধীন শ্রীকাইল গ্রামে ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগে ৩য় বর্ষে অধ্যয়নকালে মিশর-এর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ১৯৯৯ সালে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যারাবিক এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০১ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা থেকে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যয়ন শেষে উভয় বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করে। বর্তমানে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি কোর্সে গবেষনা কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তামীরুল মিলাত কামিল মাদ্রাসা টঙ্গী শাখার একজন মুহাদ্দিস (সহকারী অধ্যাপক- হাদীস বিভাগ)। এ পর্যন্ত তার ৫টি মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মাসিক আরবি পত্রিকা 'আলহুদা' এর একজন নিয়মিত লেখক। ইতোমধ্যে তার কয়েকটি প্রবন্ধ আরবি ভাষা-ভাষীদের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

ISBN
984-70103-0014-6